কল্প বিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার

boiRboi.blogspot.com

কল্প বিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার

শৈব্যা • প্রকাশন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক : রবীন বল
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট ১৯৮২
প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি : দেবাশিস দেব

দাম : পনের টাকা

মুদ্রাকর : অসিত সরকার
৩৪ শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলকাতা-৪

উৎসর্গ

এসব ঘটনা আজ পর্যন্ত কোথাও ঘটেছে বলে শুনিনি। তাই বলে না ঘটবার কারণও দেখিনা। সেই আসল সত্য, যে আজকের দোড়গোড়ায় থেমে থাকে না। যে দিগন্তের পরপারে আরও শতশত সম্ভাব্য দিগন্তের সন্ধান করে। যে সব সত্যকামীরা এ-কথা বিশ্বাস করে আমার বই তাদের দিলাম।

লীলা মজুমদার

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

সেই সব ঘটনার পৃষ্ঠাঙ্ক

১.	আকাশ ঘাঁটি	...	১
২.	লে	...	২১
৩.	একটি আষাঢ়ে গল্প	...	২৭
৪.	বরাহের দাঁতের মালা	...	৪৬
৫.	পেটেণ্ট	...	৫১
৬.	সিলিকন	...	৫৮
৭.	সিঁড়ি	...	৭৭
৮.	চাকর	...	৮৩
৯.	শূন্য	...	৯৫
১০.	অতিকায়	...	১০৫
১১.	হরিপণ্ডিত	...	১১০
১২.	তদন্ত	...	১১৫
১৩.	শব্দ	...	১২৩
১৪.	লিম্বো সায়েবের পেশা	...	১২৯

১. আকাশ-ঘাঁটি

... ...

বড়কাকা বিলেতে অ্যামেরিকায় অনেক বছর ছিলেন। কি করতেন কেউ সঠিক জানত না, তবে মাঝে মধ্যে দেশে ফিরে যে-ভাবে দু-হাতে টাকা খরচ করতেন, তাতে মনে হত কোনো বেজায় লাভজনক ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। বেশি দিন থাকতেন না, ভারত সরকারের নানান্ সেরেস্তায়, পরীক্ষাগারে, পারমাণবিক কেন্দ্র ইত্যাদিতে যে-ভাবে অবাধে যাতায়াত করতেন তাতেই বোঝা যেত তাঁর কাজে সরকারী সমর্থন আছে। সকলকে বলতেন সাংবাদিকের কাজ করেন। সরকারী সংবাদ সরবরাহের কোনো গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিভাগের সদস্য। আত্মীয়স্বজনেরা এ-কথা বিশ্বাস করত না। ছোটবেলা থেকে যে এমন কৃতী-বিজ্ঞানের ছাত্র এবং উপরন্তু পাঁচটা বানান ভুল না করে যে কি ইংরিজিতে, কি বাংলাতে এক পাতা চিঠি লিখতে পারে না, সে হবে সাংবাদিক, এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হলো? প্রসঙ্গটা বড়কাকার কানে যেতে উনি বললেন, "কে বলেছে সাংবাদিকরা বানান করতে জানে? বানান ঠিক করে দেয় যারা ছাপার কলে কালি লাগানোর কাজ করে, তারা। আর কারো ওপর নির্ভর করা যায় না।" শুনে সবাই থ।

গত বছর অনেকদিন দেশে থেকে গেলেন, চোখে-মুখে কেমন একটা উদ্বিগ্ন-ভাবও দেখা গেল। যারা ওঁর কাছ থেকে সব চাইতে বেশি টাকা ধার করেছিল, তারা বলাবলি করতে লাগল, "টাকা বেচে, গাঁজা চালায়, বেনামায় বড় বড় ব্যবসা করছে, এখন মিসার ভয়ে চোখে-মুখে পথ দেখতে পাচ্ছে না।" যারা সাফল্যলাভ করে তাদের সম্বন্ধে লোকে যেমন বলে থাকে।

শেষটা হলো, ঘোতন একদিন চেপে ধরল। বড়কাকা তাদের কখনো কানাকড়িও দেন নি। দুজনে দুটি মাস্তান। স্কুল ফাইনেল-ও পাশ করেনি। বাড়ির লোকে ওদের দেখলে নাক সিঁটকায়, সদাই এর বাড়ি ওর বাড়ি খাবার তালে থাকে, তারা পঞ্চাশ-ষাটটা করে পয়সা দিয়ে বিদায় করে দেয়। বলে, 'এ বেলা হাঁড়ি চড়েনি, বড় খারাপ দিন যাচ্ছে।' তবু এই তাগড়াই চেহারা

দু'জনার, কালীঘাটের আখড়ায় কুস্তি করে। বুক-ডন দেয় একনাগাড়ে পঞ্চাশটা, পিটানো শরীরে নুড়ির মতো শক্ত গোল মাংসপেশী। বড়কাকা তাদের সঙ্গে কথাটথা কইতেন না, ওরাও ওঁকে এড়িয়ে চলত। তবে মনে ভয়-ডর ছিল না, কলেরার সেবা করত, বে-ওয়ারিশ মড়া পোড়াত, শ্মশান ঘাটের সিঁড়িতে বসে ভাঁড়ে করে চা খেত। গাল গল্প করত।

বড়কাকার শুকনো মুখ দেখে একদিন কাছে গিয়ে হুলো বলে বসল, "অমন শুকনো মুখ দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। যার পকেট ভরা পয়সা তার মুখ শুকনো কেন? কিছু কাজ থাকে তো বলুন।"

বড়কাকা ভুরু কুঁচকে ওদের অখাদ্য চেহারার দিকে তাকালেন। আধময়লা নস্যির রঙের আঁটো পেন্টেলুন আর লাল নীল চকড়া-বকড়া শার্ট, পায়ে নোংরা কোলাপুরি চটি। ঘাড় অবধি লম্বা ঝাঁকড়া চুল। অনেকদিন চান-টান করেনি।

আশ্চর্যের বিষয়, বড়কাকা আগে কথা বললেন, "তোমরা বড়-বাড়ির ছোট-মামার নাতি না?" "আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়কাকা।" বড়কাকা বললেন, "স্নান কর না কেন? নোংরা লোককে কাজ দিলে আমার অখ্যাতি হবে।" ওরা বলল, "আর কাপড়-চোপড়ও নেই, স্যার, তাই স্নান করার অসুবিধা আছে।"

বড়কাকা ওদের বিষয়ে নানান কথা শুনেছিলেন। বেশির ভাগই নিন্দা। বললেন, "ভয়টয় পাওনা তো?" হুলো উৎসাহের সঙ্গে বলল, "না স্যার, অব্যর্থ গুলতি যার, তার আবার ভয় কিসের?" "এই ধর পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মের বাইরের জিনিসকে ভয় কর না তো?" এবার ওরা একটু ঘাবড়ে গেল। এ-ওর মুখের দিকে চাইল। ঘোতন বলল, "ভ-ভূতের কথা বলছেন? তাহলে কিন্তু ওর মধ্যে আমরা নেই, এই পষ্টকথা বলে দিলাম।" বড়কাকা আকাশ থেকে পড়লেন, "বল কি! তোমাদের মতো আধুনিক ছোকরা, যারা মা-বাপকে পর্যন্ত স্বীকার কর না, তোমরা ও-সব মান?" ঘোতন একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, "কালীবাড়ির উত্তরে বড় বাঁশঝাড়ে একা রাত কাটাতে আপনি রাজি আছেন?" কাষ্ঠ হেসে বড়কাকা বললেন, "না রাজি নই। তবে সে অন্য কারণে, আত্মহত্যা আমার উদ্দেশ্য নয়। সে থাকগে, আমি যেখানকার কথা বলছি, সেখানে ও-সব ভয় নেই। ছিলই না কিছু কোথাও কোনোকালে, তা ভূতে ভর করবে কিসে? বিশ্বাস কর, বুধ-গ্রহের কাছাকাছি গিয়ে দেখেছি কোথাও ভূতের পায়ের কড়ে আঙুল রাখার জায়গা নেই। সব শূন্য খাঁ-খাঁ করছে।"

ওরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাল, গলা খাঁকরাল, মুখে কিছু বলল না, চলেও গেল না। বড়কাকা ইদিক-উদিক চেয়ে, গলা খাটো করে বললেন, "আসলে আমার বেশ কিছুদিনের মতো গা-ঢাকা দেওয়া দরকার। কোথায় পালাব ভেবে পাচ্ছি না।" আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন ওদের চারটে কানই খাড়া। "ইয়ে একটা জায়গা আছে বটে, তবে সেখানে একা যাওয়া যায় না।" ওরা চুলবুল করে উঠল, "আবুধাবি বড়কাকা? নৌকা আনতে হবে? এতক্ষণ বলেন নি কেন?"

কথা হচ্ছিল আদি-গঙ্গার ধার, ইঁটের গাদার পাশে। বড়কাকা ফোঁশ করে নিশ্বাস ছেড়ে, ইঁটের ওপর বসে পড়লেন। সেগুলো যে বিশ্রীভাবে নড়বড় করতে লাগল, তাও খেয়াল করলেন না। হুলো, ঘোতন দুজন দুটি ইঁট পেতে ওঁর পায়ের কাছে, গঙ্গার দিকে পিঠ করে বসে পড়ল। বড়কাকা সোজা ওদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কারো কাছে প্রকাশ করিস্‌নে, কিন্তু শুনে রাখ্‌, আমি সাংবাদিক টাংবাদিক নই, আমি মহাকাশচারী!" শুনে ওরা এমনি চমকে গেল যে শূন্যে দু'হাত লাফিয়ে উঠে, নামবার সময় হুলোর ইঁটে ঘোতন, ঘোতনের ইঁটে হুলো পড়ল, অথচ কেউ টের পেলনা, বড়কাকাও না। তিনজনেরই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

হুলো রোজ আধপো করে কাঁচা ছাগলের দুধ খেত,—কিনে নয়, তার পয়সা পাবে কোথায়? ঠাকুরবাড়ির পুরুত মশায়ের ছাগলটাকে লুকিয়ে দুইত,—তাই ওর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল সব চাইতে বেশি। সে-ই আগে কথা বলল, "ক্‌—ক্‌—ক্‌—ইয়ে—ব্‌—ব্‌—ব্‌—?" বড়কাকা বললেন, "ঠিক তাই বিস্ময়কর বটে। অবিশ্বাস্যও বলতে পার। একেবারে লোমহর্ষক ব্যাপার। সব কথা বলছি মন দিয়ে শোন। মধ্য-ইউরোপের একটা রাজ্যে আমার কর্মস্থল। সেখানে পাহাড়ের অগম্য উঁচু চূড়োয় আমরা সাফল্যের সঙ্গে—" ঘোতন আর নিজেকে চাপতে না পেরে বলল, "রকেট বানান বুঝি?"

বড়কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, "রকেট? রকেটকে আমরা খেলনা বলি। আমাদের বিশেষত্ব হচ্ছে আকাশ-ঘাঁটি! আকাশ-ঘাঁটি কি বুঝলি তো? যাকে বলে স্পেস্‌ স্টেশন। সাধারণ স্পেস-স্টেশন নয়, সে তো অ্যামেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়া, যে-যা খুশি বানাতে পারে। আমাদেরগুলো একেবারে স্বয়ংক্রিয়।"

বলতে বলতে উত্তেজনার চোটে উঠে দাঁড়ালেন বড়কাকা, "সে তোরা ভাবতে পারিস না। সব আপনা থেকে হয়, জল তৈরি হয়। কেন, তাতে অবিশ্বাসের

কি আছে ? এই পৃথিবীটাতে তো আর অন্য জায়গা থেকে জল আসে না, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মেঘ উঠছে, বিষ্টি হচ্ছে, মাটিতে জল শুষে নিচ্ছে, আবার ঝরণা হয়ে বেরুচ্ছে, নদী হয়ে ছুটছে—কই তোরা তো কেউ আশ্চর্য হচ্ছিস্ না ? আকাশ-ঘাঁটিতেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ সব হয়। গাছপালা গজায়, বাড়ে, ফুল ফল ধরে, শুকোয়, মরে, পাখি ওড়ে, হরিণ চরে, গোবরটোবর রি-সাইকেল হয়। আকাশ-ঘাঁটির জন্তু জানোয়ার যেমন বাড়তে থাকে, আকাশ-ঘাঁটিও মাপে বড় হতে থাকে।"

হুলো বলল, "ধ্যে !"

বড়কাকা বললেন, "বিশ্বাস না করলে আর কি করতে পারি ? শূন্যটাকে কি তোরা একেবারে শূন্য ভাবিস্ ? মোটেই তা নয়। কোটি কোটি বছর ধরে ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রহ-নক্ষত্রের অতি মিহি গুঁড়ো ধুলোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। মহাকাশ থেকে সেগুলোকে সংগ্রহ করে আকাশ-ঘাঁটি ক্রমে মাপে বড় হতে থাকে। আমি পাঁচ বছর আগে শেষ যা দেখেছিলাম, তারপর নিশ্চয়ই এত বেড়ে গেছে যে চেনা দায় হবে। আর সব চাইতে ভালো কথা, গা-ঢাকা দেবার এমন ভাল জায়গা আর নেই। পাখিরা, হরিণরা সত্যি হলেও, মানুষরা সবাই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত এবং খুব ট্যাকসই ফোম-রবারে তৈরি। সব কথা বোঝে কিন্তু কোনো কথা নিজের থেকে বলে না, প্রশ্ন করলে ইঙ্গিতে উত্তর দেয়। সেখানে আমরা একেবারে নিরাপদ। আমার নিজস্ব একটা ছোট বাড়িও আছে, একটা স্বয়ংক্রিয় চাকর রাখা যাবে— ।"

হুলো, ঘোতন অবিশ্যি এ সমস্তর একটি কথাও বিশ্বাস করেনি। খালি জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমাদের কি দেবেন ?"

"কি দেব ? চিরকালের মতো তোদের সব অভাব ঘুচিয়ে দেব। আবার যখন ফিরে আসবি—।"

ওরা বাধা দিয়ে বলল, "ফিরে এলে আমাদের চলবে না। আজ রাতে পুরুত ঠাকুরকে পেটাবার পর এ জায়গাটা আমাদের পক্ষে বড় বেশি গরম হয়ে উঠবে।— কিন্তু ঘাঁটিটা কাদের, আমাদের থানার কারো নয় আশা করি। শেষটা আমাদের ধরিয়ে দেবেন না তো ?"

বড়কাকা হতাশ হলেন। "বলছি মধ্য ইয়োরোপের অগম্য এক পাহাড়ে তৈরি হয়েছে।" "আপনি করেছেন ? কে টাকা দিল ?"

"আহা, তোদের তো বড় বেশি সন্দেহ বাতিক দেখছি !" ওরা বলল,

"যারা প্রাণ হাতে নিয়ে ঘোরে, তাদের সন্দেহবাতিক থাকবে না তো কি থাকবে?" "বেশ। শোন তবে। করিগা আর বিনো নামে দুই সায়েব ওটাকে বানায়।"

"কে টাকা দিল?" "কি জ্বালা! কেউ দেয়নি। ওদের ছিল। ওরা ওটাকে বানিয়ে মহাকাশে ছেড়ে দিয়েছিল পাঁচ বছর আগে। সেই ইস্তক ঘুরছেতো ঘুরছেই আর যতই ঘুরছে ততই শক্তি জমছে, স্বয়ংক্রিয়ের উন্নতি হচ্ছে। বলছি কি তোদের, অমন আরামের গা-ঢাকা দেবার জায়গা কোথায় পাবি?"

হুলো বলল, "মালিকরা যদি গিয়ে হাজির হয়?" হাসলেন বড়কাকা, "আরে কাগজে পড়িস নি, বড় বেশি বিজ্ঞান করতে গিয়ে তারা আইফেল টাওয়ারের চূড়ো থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছিল।" আর একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিল হুলো, "তাহলে আপনি কি করতেন?" বড়কাকা অবাক্, "কেন, স্ক্রুপ আঁটতে হত না? একটা স্ক্রুপ ঢিলা থাকলেই তো হয়ে গেল! আমার কাজ বৈজ্ঞানিকদের কাজের চাইতে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাছাড়া ওঁরা দুজনে সমান ভুলো—এই ফরমুলাটা তৈরি করছেন তো এই ভুলছেন, এই জটিল সমস্যার উত্তর খুঁজে বের করছেন তো এই সেটাকে ভুলে যাচ্ছেন। আমাকে সব মনে করে রাখতে হত। লিখে রাখবার হুকুম ছিল না, পাছে শত্রুদের হাতে পড়ে। জানিস্ তো সব বিজ্ঞানীদের শত্রু হল বাকি সব বিজ্ঞানীরা। ওঁরা কাউকে বিশ্বাস করতেন না, পাহাড়ের চূড়োয় আমরা তিনটি প্রাণী আর আমাদের তৈরি গুটি পনেরো স্বয়ংক্রিয় ফোমরবারের রোবো ছাড়া জন মনিষ্যি ছিল না। তারি মধ্যে দুই সন্দেহবাতিক পণ্ডিত আইফেল টাওয়ারে চড়ে কি বাহাদুরি করতে গিয়ে নিখোঁজ নিপাত্তা হয়ে গেলেন! আমাকে পর্যন্ত কিছু বলে গেলেন না আর নিজেরাও নিশ্চয় ভুল মেরে বসে আছেন। তাই পাহাড়ের চূড়োর আস্তানায় ফিরতে পারছেন না। সে দিক দিয়ে বলতে গেলে আমিই ওদের একমাত্র ওয়ারিশ বলতে পারিস্।"

হুলো, ঘোতন বলল, "এ্যাঁ, একেবারে একা একা পাহাড়ের মাথায়!" "হ্যাঁ, তাই, মানে প্রায় তাই। যাক্ সে আর জানতে চাস্নি, এখন যাবি কিনা বল?"

"কিসে করে যাওয়া হবে তাহলে?"

"কেন, এ দেশেই একটা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তারা সরকারী

সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় রকেট বানাবার চেষ্টা করছে। আমিও তাদের পার্ট-টাইম গবেষক। একটা নতুন ধরনের রকেট দিয়ে স্পেস-স্টেশনের সার্ভিসিং করা চলবে কি না পরখ করতে হবে। তা কেউ যেতে চায় না। শেষটা আমি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যাব বলেছি। যন্ত্রপাতি খরচপত্র ওরা দেবে, আমার নিজের দু'জন সহকর্মী নিয়ে যাব, তাদের মাইনে বাবদ তিন হাজার টাকা দেবে—কি বলছিস্?" হুলো বলল, "আগাম দিলে ভাল হয়, এখানে কিছু দেনাটেনা করে ফেলেছি।" বড়কাকা ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে, তারপর মুচকি হেসে বললেন, "তাই দেব। তবে সবটা দেব না। একেক জনকে পাঁচশো দিলে চলবে না? ধর যদি পরে ফিরেই এলি, শেষটা তখন—" ওরা দুজন বড়কাকার মঙ্ক-শুর নাকে কপাল ঠেকিয়ে গড় করে বলল, "থু-ব থু-ব চলবে। অত টাকা চোখেও দেখিনি কখনো!"

বড়কাকা মনিব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বের করে ওদের হাতে দিয়ে বললেন, "বুড়োকে আস্তে পেটাস্, মরে টরে গেলে ফ্যাসাদে পড়বি। যাবার আগে অশুভ কাজ করিস নি। এই দিয়ে দুটো করে প্যাণ্ট শার্ট, ১ জোড়া ক্যাম্বিশের জুতো, মোজা, গেঞ্জি কিনিস্ আর রাতে ভাল করে খাস্।"

বড়কাকা সকলকে বলে কয়ে যাকে যা টাকাকড়ি দেবার দিয়ে, মাঝারি সুটকেসটি হাতে করে শনিবার সন্ধ্যার দিকে রওনা হয়ে গেছিলেন। হুলো, ঘোতনের অন্তর্ধানের ব্যাপারে কেউ লক্ষ্যই করে নি। কোথায় কোন্ বদমাইসি করতে গেছে দুই বাউণ্ডুলে তাই নিয়ে কারই বা মাথা-ব্যথা। হুলোর বাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বরং বললেন, "হয় চাকরি নয় ফাটক। যাই হোক্ অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।" তাঁর বড়দিদি ঘোতনের মা শুধু বললেন, "ওনার মনি ব্যাগটা ফাঁকা করে দিয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি।" পরে অবিশ্যি পুরুত ঠাকুরকে ঠেঙানোর কথা রাষ্ট্র হলে সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। আসল কারণ কেউ সন্দেহও করল না।

সত্যি কথা বলতে কি নতুন কাপড়-চোপড় পরে, চুল ছেঁটে. স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, হাতে নতুন পিজবোর্ডের সুটকেস নিয়ে ওদের চেনে কার সাধ্য। একটু গোলমাল বেধেছিল। ওরা কিছুতেই ওদের পোষা একজোড়া শিং-ওয়ালা গুবরে পোকাকে রেখে যেতে রাজি হল না। "ও বাবা! ওরা হল গিয়ে আমাদের ম্যাস্কট। ভোমরার পেটে যেমন দৈত্যিদের প্রাণ থাকত, অনেকটা তাই। ওদের ফেলে গেলে ওদের কেউ মাড়িয়ে দেবে, কিংবা শিং ভাঙবে, কিংবা সাংঘাতিক কিছু হবে! ওরা না গেলে, এই আমরাও রইলাম। ওঠ, ঘোতন।"

বড়কাকা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "কি জ্বালা, নেব না বলেছি নাকি? তবে পকেট থেকে যেন বের টের করিস্‌নে। এক দিক দিয়ে ভালোই হল, ওখানে একটা নতুন জীব দেখা যাবে।"

কিভাবে গোপন ঘাঁটিতে পৌঁছল, সেখানে একটু যেন আলগোছে ওদের ব্যাগ-ট্যাগ দেখিয়ে, ছোট্ট একটা পল্‌কা রকেটে চেপে, তিনজনে কিভাবে রওনা হয়ে গেল, নিরাপত্তার প্রয়োজনে সে-বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কত ছোট একটা থলির মধ্যে স্বয়ংক্রিয় রকেটটাকে ভাঁজ করে ভরে ফেলা যায়, দেখে ওরা একেবারে হাঁ। স্বয়ংক্রিয় চালকটি একটা টেলি-ফোনের মতো ছোট। একটা সুইচ টিপলে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ওরা একটা ছোট সরকারী স্পেস-স্টেশনে নেমে তার সার্ভিসিং করবে। পৃথিবী থেকে সমস্ত যাত্রাপথ কন্‌ট্রোল করা হবে। সেখানকার কাজ শেষ হলে, সুইচ্‌ টিপে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে। কন্‌ট্রোল সেন্টারের লোকেরা ভাববে যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে, "বাগ্‌চি ঠিক করে নেবে'খন, স্পেস্‌-স্টেশনে প্রাণ ধারণের ব্যবস্থা আছে। ওদের জন্য কেউ মাথা ঘামাবে না। ওরা সেই সুযোগে আকাশ-ঘাঁটিতে পৌঁছে যাবে। সেখানে কি আরাম, কি নিরাপদ, কোনো শা—।" এই অবধি বলে বড়কাকা থেমে গেছিলেন। তবে বাকিটা ওরা বুঝে নিয়েছিল। এবং সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিল। সাত বছরের অবিরাম মাস্তানির ফল থেকে এমন সহজ উপায়ে যে ওরা নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, এ ওদের স্বপ্নের বাইরে ছিল। তথাকথিত স্যাঙাৎরাও খোঁজ করবে না। তারা জানে পুরুৎ ঠেঙিয়ে বাছাধনরা হিমালয়ের বুকে নিখোঁজ হয়েছে। ওদের নামে থানায় খাতা খোলা হয়েছিল, কিছুদিন বাদে সে খাতাও নিশ্চয় বন্ধ করা হবে। ভেবেও এত আনন্দ হচ্ছিল যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে গুবরের গায়ে হাত না বুলিয়ে পারল না। গুবরেরাও তখুনি কুটকুট করে মোক্ষম কামড় দিল। রকেটের নাম ভোজালি। ভালো নাম না? হুলোর দেওয়া নাম। বড়কাকা বলতেন আর-এস-থ্রি। তবে জিনিসটা বড়ই পলকা, ওটা যে মহাকাশ পেরিয়ে তিনজনকে নিরাপদে যথাস্থানে নিয়ে যাবে সহজে বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবে নাকি পোড়েও না, টোলও খায় না, বেজায় শক্ত, অথচ কাগজের চাইতে হাল্‌কা, আকাশে উড়লে দূরবীন লাগিয়েও কারো ঠাওর হওয়া শক্ত। সরকারী স্টেশনে ছোট একটা যন্ত্র লাগিয়ে নিয়ে আকাশ-ঘাঁটি পর্যন্ত বড়কাকাই রকেট চালিয়ে নিতে পারবেন। ওঁর কারখানায়, একরকম ওঁর হাতেই তৈরি।

তাজা বাতাসের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকলেও শুধু বড়ি খেতে খেতে যাওয়া। বড়িগুলোর একেক রকম স্বাদ, পেটও ভরে, কিন্তু ওকে কি কেউ খাওয়া বলে? দাঁতের ফাঁকে পর্যন্ত কিছু লেগে থাকে না। আর বাইরে কি অন্ধকার! তবে পরদা টেনে টেলিভিশনে আশ্চর্য কি ছবি দেখাতে দেখাতে নিয়ে চললেন বড়কাকা। তা ছাড়া বুধ শুক্রের মতো দূরে তো আর নয়, দেখতে দেখতে পৌঁছেও গেল ওরা। নামল যখন ওরা তখন ঘুমিয়েছিল, এতটুকু ঝাঁকি দিল না, কিছু না। জেগে দেখে মনে হল বুঝি বিশাল একটা কিছুর ছাদে চেপে রয়েছে ওরা। আর রকেটের নিচে চোরা দরজা খুলে, সিঁড়ি দিয়ে সুটকেস হাতে বড়কাকা নেমে যাচ্ছেন। ওরাও নিজেদের বাক্স নিয়ে নেমে পড়ল। এই স্পেস্-স্টেশনও নাকি বড়কাকাদের তৈরি।

ছাদের ওপর উকুনের মতো আটকে রইল রকেট, ওরা নেমে গেল। বড়কাকা বললেন, "এখানে কোনো লোকজন থাকে না। যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, প্রচুর খাবারদাবার, জল তৈরির বন্দোবস্ত মজুত থাকে, ওষুধপত্র থাকে। মহাকাশে কেউ বিপদে পড়লে, এখানে এসে সাহায্য পেতে পারে, ক্লান্ত নভোচারীরা বিশ্রাম পেতে পারে। আমরাও এখানে আটদিন থাকব, সমস্ত যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করব, রাঁধব-বাড়ব, খাব-শোব, একটু হাঁটাচলা করব"—হুলো খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ, গত দুদিন উকি-বুকির যে কি অমানুষিক কষ্টে কেটেছে, সে আর কি বল্‌ব। বেচারিরা একটু চলে ফিরে বেড়াতে পারবে!" এই বলে পকেট থেকে পেয়ারের গুবরে দুটোকে ওরা বের করল। দেখে বড়কাকার চক্ষুস্থির!

"ওরে ছাড়িস্‌নে, ছাড়িস্‌নে, সর্বনাশ করবে। হাঁটাতে হলে পায়ে দড়ি বেঁধে হাঁটা। দাঁড়া, আমি দিচ্ছি।" বড়কাকা নাইলনের সুতো আর কাঁচি দিলেন, স্বচ্ছ দেয়ালের একটা খোপ থেকে বের করে। ওদের বিস্ময় দেখে একটু খুশি না হয়েও পারলেন না। বললেন, "দেখছিস্ তো, সাধারণ জীবন-যাত্রার সব ব্যবস্থাই এখানে আছে, মায় গা-বমির ওষুধ পর্যন্ত, কারণ সবাই এসে প্রথমেই বেজায় সাঁটায়।"

চ্যাপটা গোল মতো জিনিসটা, হাল্কা পাৎলা কোনো জিনিসের তৈরী। মস্ত একটা গোল হল-ঘরের মতো কি সব, কোথাও বড় বড় ড্রাম, কোথাও ছোট ছোট শিশি বোতল, সব যথাস্থানে বসানো, নড়বার চড়বার জো নেই। হল ঘরের মধ্যিখানে মোটা একটা লম্বা মতো ছাদ অবধি উঠে গেছে। তারি ভিতর সিঁড়ি,

তার দুদিকে দুটো লক্ গেট। মুখ্যু ছেলে ওরা, এর বেশি কিছু বুঝল না। বড়কাকা বললেন নাকি সারাক্ষণ স্পেস্ স্টেশন লাট্টুর মতো পাক খায় আর শক্তি সঞ্চয় করে, পাক না খেলে উল্টেও যেতে পারত। ভিতরে একরকম মাধ্যাকর্ষণ আপনা থেকে তৈরি হচ্ছে। তাই ওরা সাধারণ পোশাকে চলছে ফিরছে। সূর্যশক্তিতে সব কাজ হচ্ছে। তাজা বাতাস তৈরির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে।

দেখে দেখে ওরা তাজ্জব বনে গেল। ওদের যথেষ্ট কাজ দিলেন বড়কাকা, সাফসুফ, তেল লাগানো, আর সবচাইতে বড় কাজ রাঁধা-বাড়া, তাতে ওদের কোনোই আপত্তি ছিল না, ছোট ছোট টিনে করে মাল মশলা এনেছিলেন বড়কাকা, তারি এটা ওটা মিলিয়ে সে কি ভোজ! শুধু ভাতটাই মামুলী নিয়মে রান্না হত। গুবরেরা মনের সুখে দাপাদাপি করে বেড়াত, পায়ে সুতো বেঁধে। বড়কাকা থেকে থেকে বলতেন, "খবরদার, এক কণা গুবরের গোবর দেখি তো ওদের ঠ্যাং ধরে বাইরে ফেলে দেব। সব জড়ো করে ঐ টিনে রাখবি। মেশিন দিয়ে ঐ থেকে দুধটুধ তৈরি হবে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে।"

দুই

পরে হুলো ঘোতন বুঝেছিল যে এতদিন থাকার একমাত্র কারণ ওদের একটু তালিম দিয়ে নেওয়া নইলে ওখানকার কাজ দুদিনেই হয়ে যেত। এই কদিন পৃথিবীর সঙ্গে যোগ ছিল, কথাবার্তা চলত, রিপোর্ট দেয়া হত, টি-ভি দেখা যেত। আট দিনের দিন বড়কাকা সুইচ্ তুলে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন, ওদের দুজনার যা ভয়। "সত্যি বলছি, বড়কাকা, যে দিন পাকুর দল এক-নলা নিয়ে আমাদের নৌকার পাছু ধরেছিল, সেদিনে এত ভয় পাইনি।" "ভয়টা কিসের শুনি?" "বাঃ, ভয় পাব না? ওরা তিন পুরুষ ধরে নৌকা নিয়ে আবুধাবির ওদিকে কার সঙ্গে কারবার করে এসেছে, ওদের পূর্বপুরুষরা ওয়ারেন হেস্টিংসের রসদ যোগাতো। এখন যখন কেউ বলে যে তখন নাকি বিলেত থেকে এখানে আসতে এক বছর সময় লাগত, পাকুরা হাসে।

বড়কাকা গলা খাঁকরে বললেন, "তোদের সঙ্গে খুব ভাব বুঝি?" ওরা শুনে হাঁ। "ভাব! তা একদিক থেকে বলতে পারেন ভাব। তিনশো বছর ধরে বদলা নিয়ে নিয়ে, কেমন একটা নিজের লোকের মতো হয়ে গেছে ওরা।"

ফোম রবারের যন্ত্র-মানুষের সঙ্গে হুলো-ঘোতনের সাক্ষাৎকার

বড়কাকা চটে গেলেন "কি যে বলিস বদলা নিয়ে নিয়ে! আমাদের গুষ্ঠীর ক'জনকে—মানে-বদলা নিয়েছে?" "তা, আপনাদের নেবে কেন? দলের ব্যাপার এটা।" "হুঁ, এখন বুঝতে পারছি, কেন তোদের আকাশ-ঘাঁটিতে যাওয়ায় এত তাড়া। ভালোই হল, দুটো পারমানেণ্ট লোক পাওয়া গেল। এই বড়ি দুটো খেয়ে ফেল, মাথা ঘুরবে না।'

ততক্ষণে স্পেস-স্টেশনে তালাচাবি দিয়ে ওরা রকেটে চড়ে রওনা দিয়েছিল। চারদিক থেকে অন্ধকার যেন পাক খেয়ে ওদের গিলে ফেলতে এল, রকেটের আলো-ও কি রকম ঘুরতে লাগল, ব্যস্, আর কিছু মনে নেই। ঘুম যখন ভাঙ্গল, 'ভোজালি' কখন আকাশ ঘাঁটির পেটের তলার ফটক দিয়ে ঢুকে আস্তাবলই হক, কি গ্যারাজই হক, কি গোয়াল ঘরই হক, সেইখানে নিরাপদে আশ্রয় পেয়েছে। আট জন স্বয়ংক্রিয় কর্মী, তার সার্ভিসিং-এ লেগে। বড়কাকা নেমে গেছেন।

টপ করে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। তবে কি ওরা মরে গিয়ে স্বর্গে চলে এসেছে? স্বর্গেই বা আসবে কেন? এই নাকি আকাশ ঘাঁটি? কই এর তো কোনো ঘেরা টোপ দেওয়া নেই? সময়টা বোধ হয় সকাল, মাথার ওপর ডোমের মত কৃত্রিম ছাদের বদলে কোমল নীল আকাশ, পূবদিকে সূর্য উঠেছে, চারদিকে গাছপালা, ঘাসজমি, বাড়ি ঘর, হরিণ চরছে, কুকুর ডাকছে, ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ লাল নীল তোতা পাখি উড়ছে। ওরা ভোজালি থেকে বেরিয়ে এসে, আস্তাবলের বাইরে দাঁড়াল।

দলে দলে ফোম রবারের যন্ত্র মানুষ কাজে ব্যস্ত, কারো মুখে কথা নেই, ওদের তো কথা বলবার জন্য তৈরি করা হয় নি। তবে কাজের কথা নাকি সব বোঝে। একজন যন্ত্র-মানুষের বুকে পিঠে দশ নং, লেখা, ওদের বোধ হয় নামাটাম নেই। হুলো তার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "স্যার কোথায়?" সে আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে দিয়ে, আবার ঘাসজমি থেকে আগাছা তুলে একটা টুকরিতে রাখতে লাগল। আশ্চর্য বটে, চেহারা দেখে কে বলবে মানুষ নয়। অবিশ্যি মানুষরা এত কাজও করে না, এত চুপ করে থাকে না।

সেদিকে তাকাতেই মনে হল একটা ফিল্মের শহরে এসেছে। কি সুন্দর ছোট বড় সব বাড়ি তকতকে পথ-ঘাট তাতে এক কণা ধুলো নেই, এই দেশটার কোথাও ধুলো নেই। দেশই তো, ছোটবেলায় স্বপ্নে দেখা একটা দেশের মতো। এখানে ধুলো উড়লেই যন্ত্র মানুষরা নিশ্চয় সেগুলো সংগ্রহ করে কাজে লাগায়। যন্ত্ররা কথা না বললেও, নানা রকম ভালো শব্দ কানে এল। জল ঝরার শব্দ, গাছের

পাতায় বাতাস বওয়ার শব্দ, ঘাস-ছাঁটার কলের শব্দ, জন্তু জানোয়ারের ডাক আর মনে হল কোথাও রেডিও চলছে। রেডিও? ওরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। সামনের একটা ছোট বাড়ি থেকে বড়কাকা বেরিয়ে এলেন, মুখে তাঁর দুশ্চিন্তার ছাপ।

"কি হল বড়কাকা? যন্ত্ররা বুঝি জিনিস পত্রের যত্ন করে নি?" "না:— বরং বড্ড বেশি যত্ন করেছে। যে-সব কাজ শেখানো হয়নি, তাও করে রেখেছে। ভাঁড়ার ঘরের তাক দেখছি জ্যাম, জেলি, আচার, বিস্কুটে ঠাসা। আর—আর লোকজনও যেন একটু বেশি বেশি মনে হচ্ছে।"

হুলো বলল, "ভালোই তো। আরো ভালো কাজ হবে। আকাশ-ঘাঁটি মাপে বড় হয় বললেন, আর তার বাসিন্দারা সংখ্যায় বাড়তে পারে না? ফল পাকুড় খাবার লোক নেই, তাই জ্যাম জেলি করে রেখেছে, ভালোই করেছে।"

"কিন্তু শিখল কোথায়?"

"নিজেরাই বের করে করেছে। মানুষরা প্রথম যেমন করে শিখেছিল। এখন গুবরেদের ছাতি?"

যতই দিন যেতে লাগল ওদের ওপর উল্টো রকম ফল হতে লাগল। হুলো ঘোতনকে পায় কে! এ যদি স্বর্গ না হয় তো স্বর্গ কাকে বলে ওরা ভেবে পেত না। অবিশ্যি ওদের কতটুকুই বা বিদ্যেবুদ্ধি, তাই দিয়ে বুঝত-ই বা কি? তবে বড়-কাকার কথা আলাদা এবং তাঁর ওপরেই উল্টো ফল দেখা দিতে লাগল। ক্রমে আরো বেশি গম্ভীর নার্ভাস আর খিটখিটে হয়ে যেতে লাগলেন। ওদের সঙ্গে না নিয়ে বেরোতেন না। তাতে ওদের কোনো-ই আপত্তি ছিল না। মুখ্যু মানুষ, একজন কেউ এখানকার তাজ্জব ব্যাপার বুঝিয়ে না দিলে তো অর্ধেকের বেশি অজানাই থেকে যাবে।

বড়কাকা বললেন, "এখানকার সব কিছু প্রাকৃতিক জগতের মতো করে তৈরি করা হয়েছে, তবে বলা বাহুল্য তার চাইতে ঢের ভালো করে। আসল জিনিস কি আর কখনো নকলের মতো ভালো হয়! এখানে ঝড়, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড কিচ্ছুর স্কোপ রাখা হয়নি, বুঝলি। অথচ নিয়মিত ছয়টা ঋতু আসে যায়, আগুন লাগার জন্য দাহ্য পদার্থ চাই, সে-সব কিছু নেই। কাপড়-চোপড়, পরদা, বিছানা, ফোম-রবারের নকল মানুষ সব, অগ্নি নিবারক জিনিস দিয়ে তৈরি। পোড়াতে হলে শুধু এক ঐ রান্না বান্না পোড়ানো যায়। তাও দেখছিস্ তো, স্টোভের মধ্যে বিশেষ নিরাপদ গ্যাস, আর স্টোভের পাশে যে নীল রঙের নল আছে, সেটা খুলে

দিলেই কিছুতে আগুন ধরে গেলেও তখুনি নিবে যাবে। আর সব চাইতে ভালো কথা হল যে এখানে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। হিংস্র জানোয়ার নেই, মানুষগুলো ফোম রবারে তৈরি, কলে চলে, কথা বলে না—তা অশান্তির সৃষ্টি করবেটা কে? কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি নেই, দলাদলি নেই, কড়া কথা নেই—ওকি?"

ওরা দুজনও কান খাড়া করল, দূরে একটা হল্লা মতো শোনা গেল কি? নাঃ, ও নিশ্চয় মনের ভুল। বড়কাকা আশ্বস্ত হয়ে বলে চললেন, "চোর—ছ্যাঁচড় নেই, বদমাইস-বাটপাড় নেই, ঠ্যাঙাড়ে, গুণ্ডা, চোরাকারবারি নেই—" ওরা উৎসাহিত হয়ে বলল, "পুলিস জেলখানা নেই, সব কলে হয়, আইন আদালতের দরকার নেই। কিন্তু কল বিগড়ে গেলে কি হয়, স্যার?"

বড়কাকা বিরক্ত হয়ে বললেন, "কি আবার হবে? স্বয়ংক্রিয় ভাবে ভুল শুধরে নেওয়া হয়, একি মানুষ পেয়েছিস্ যে ভাঙবে চুরবে, বিকল হয়ে পড়ে থাকবে? বলিনি তোদের এক কণা জিনিস এখানে পড়ে থাকার উপায় নেই, সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ হয়ে, ভোল বদলে কাজে লাগানো হয়। একটা আলপিন কোথাও পড়ে থাকতে দেখবি না।"

বলতে বলতে ওরা দু সারি ছবির মতো সুন্দর বাড়ির মধ্যিখানের তকতকে বাঁধানো পথ দিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের কাছে পৌঁছল। পাহাড় না বলে তাকে একটা বড় ঢিপিও বলা চলে। তার গা বেয়ে এঁকে বেঁকে লালচে রঙের একটা রাস্তা উঠে গেছে, তার দুই পাশে গাছে গাছে ফুল ফুটেছে।

বড়কাকা বললেন, "গাছপালা সব সত্যিকার, এমনভাবে পরিকল্পনা করে লাগান হয়েছে যে বারো মাস কোনো না কোনো গাছে ফুল দেখা যাবে। নাতি-শীতোষ্ণ আবহাওয়া করা হয়েছে, বেশি গরমও পড়ে না, আবার বেশি শীতও হয় না।" ওদের মনের মধ্যে বহুদিন আগে পড়া ভূগোলের বইয়ের পাঠগুলো নাড়া দিতে লাগল।

বড়কাকার পাহাড় চড়তে গিয়ে হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। ওরা ফুর্তির চোটে এক দৌড়ে একেবারে চূড়োয় পৌঁছে থ'! চারদিক থেকে কেমন যেন হাসি-গল্প থেমে গেল, গাছপালা সর-সর করে উঠল, কারা যেন সরে পড়ল, কি যেন চলে গেল। ওরা জানত সব মনের ভুল, কেউ কোথাও নেই, চারদিক খাঁ-খাঁ করছে, এখানে কেউ হাসে না, কাঁদে না; ভুল করে না, করলে আপনা থেকে শুধরে নেয়, কিছু পড়ে থাকে না, কোনো জিনিস নষ্ট হয় না।—কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে

পাহাড়ের চুড়োতে মেয়েদের চুলের ক্লিপ পড়ে আছে কেন ? অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকাওয়ালা চোঙামতো যন্ত্র নিয়ে ডি ২০ আর ডি ২১ নম্বরের দুটি কলের মানুষ এসে হস্ করে শুকনো ফুল, খসা পাতার সঙ্গে স্লিপটাকে উড়িয়ে সাফ করে তুলে নিয়ে, মেশিনটাকে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে গেল। এমন সময় বড়কাকা হাঁপাতে হাঁপাতে দেখা দিলেন। পাহাড় চুড়োয় সবুজ বেঞ্চি পাতা ছিল, তাতে বসে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেত। বড়কাকা ধপাস্ করে তারি একটাতে বসে পড়লেন। ওঁর দম ফিরে এলে ওরা জিজ্ঞেস করেছিল, "কার জন্য এমন এলাহি ব্যবস্থা করেছেন বলুন ? আমাদের কালীঘাটের গলিতে একফালি জায়গা পেলে লোকে বর্তে যায় আর এখানে এত জায়গা, কিন্তু কলের মানুষ ছাড়া জনমনিষ্যি নেই ! এসব তবে কার জন্য করেছেন আপনারা ?"

হুলো বড়কাকার পাশে বসে ঢোক গিলে বলল, "অ্যামার ছোট বোন ফুলিটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, একটু রোদে পা মেলে বসতে পায় না।" এই প্রথম বাড়ির কথা বলল ওদের মধ্যে কেউ। বড়কাকা একটু ঘাবড়ে গেলেন। যেন বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, "আরে সেইজন্যই তো আকাশ-ঘাঁটি তৈরি করা। পৃথিবীতে আর লোক ধরছে না, মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। এইরকম কয়েক লাখ আকাশ-ঘাঁটি করে আকাশে ছেড়ে দিলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।" তারপর কাষ্ঠ হেসে বললেন, "তাহলে অবিশ্যি আকাশঘাঁটি আর আকাশঘাঁটি থাকবে না, হয়ে যাবে কালীঘাট রোড।"

এই বলে কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে চারিদিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, "এখানেও একটু বেশি বেশি লোক দেখছি যেন। জায়গাটা পশ্চিমবাংলার অর্ধেকও হবে না, এখানে মাত্র এক হাজার কর্মী-পুতুল রেখে যাওয়া হয়েছিল। মেশিন দিয়ে কাজ করার পক্ষে সেই যথেষ্ট। অথচ দেখ, সারি সারি বাড়িতে লোক কত ! এত বাড়িও তো মনে পড়ছে না।"

বাস্তবিকই চারদিকে চেয়ে ওদের মন ভালো হয়ে গেল, কত লোক তার হিসাব নেই। হতে পারে কলের মানুষ, কিন্তু দেখতে তো ঠিক মানুষেরি মতো। কথা বলে না, কিন্তু একেকটার মুখ একেক রকমের, আর—আর যাবার সময় কে ডি ২১ নম্বর হুলোর দিকে চোখ মটকেছিল।

বড়কাকা দিনে দিনে আরো বেশি থুম্ মেরে যেতে লাগলেন। বয়সটা এতকাল বাদে যেন বোঝা যেতে লাগল। আকাশঘাঁটির কতকগুলো শক্তিকেন্দ্র ছিল সেগুলো পরিদর্শন করলেন। খুদে বাড়ির পিছনে খুদে গ্যারেজ, স্কুটার, সূর্যশক্তিতে

চলে। কলের মানুষরা তার দেখাশুনো করে, তাদের যত্নে যন্ত্রদুটিকে মনে হচ্ছিল নতুন। নইলে পাঁচ বছরে স্কুটার অকেজো হয়ে যাবার কথা। প্রথমদিনই সন্ধ্যার সময় দুজন কলের মানুষ এইচ ৭ আর এইচ ৮, স্কুটার চালিয়ে এনে গ্যারাজে তুলে দিয়ে গেছিল। তাতে করে দুজনকে উঠতে বললেন। তাই কখনো হয়? ছোট স্কুটার, কিন্তু কালীঘাটের মাস্তানদের শরীর তো আর ছোট নয়। কলের মানুষরা কেমন করে কি বুঝল বোঝা গেল না, একজন ছুটে গিয়ে পাশের বাড়ির গ্যারাজ থেকে আরেকটা স্কুটার এনে দিল। কলের পুতুলের দক্ষতা দেখে, হুলো ঘোতন প্রশংসা না করে পারল না। বড়কাকা কাষ্ঠ হেসে বললন, "ওদের কোনো বাহাদুরি নেই, যেটুকু ক্ষমতা ওদের মধ্যে ভরে দেওয়া হয়েছে তার বেশি কিছু করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। তবু আমি নিজেও আশ্চর্য না হয়ে পারছি না।"

শক্তিকেন্দ্রগুলো চমৎকার কাজ করছিল, দেখে কে বলবে পাঁচ বছর মানুষের হাত পড়েনি, কলের পুতুলের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব চলেছে। যতই দেখে, হুলো ঘোতন ততই খুশি হয় আর বড়কাকার মুখ ততই গম্ভীর হয়। মনে হচ্ছিল খুঁত পেলেই যেন খুশি হতেন।

আশ্চর্যভাবে তৈরি ঐ আকাশঘাঁটি, যেন ছোটখাটো একটা পৃথিবীর মডেল, তেমনি আকৃতি, সেই একই নিয়মে চলে। ব্যাপারটা বুঝিয়েও বললেন বড়কাকা, 'পৃথিবীর কোটি কোটি বছর ধরে পরীক্ষিত নিয়মগুলোকেই ঝেড়েঝুড়ে কাজে লাগানো হয়েছে। বাজে জিনিস সব বাদ। অতরকম গাছ-গাছড়া, জন্তু জানোয়ার, পোকামাকড় দিয়ে কার কি উপকার হবে বল? একটাও পোকা আনা হয়নি—বাদে তোদের গুবরে ওয়ান, গুবরে টু। মোটকথা যেসব জিনিস কাজেও লাগে না, দেখতেও ভালো না, সে-সব কিছু পাবি না এখানে। ট্যাপারি তৈরি না হলে কার কি ক্ষতি হত বল? ট্যাপারি নেই এখানে।" বাড়ি ফিরে এসে হুলো এক বোতল ট্যাপারির জ্যাম টেবিলে এনে রাখল। তাই দেখে বড়কাকার মুখ এমনি সাদা হয়ে গেল যে ওরা না হেসে পারল না। বড়কাকা দীর্ঘনিশ্বাস ফলে বললেন, "আকাট মুখ্যু তোরা তাই হাস্‌ছিস্। ট্যাপারির বিচি যদি ভুলক্রমে চলে এসেও থাকে, কলের মানুষরা জ্যামের প্রণালী জানল কি করে? আমরা যা নিজেরাই জানি না, তা ওদের শেখাব কি করে?"

হুলো বলল, "হয়তো একটা রান্নার বইয়ের ছেঁড়া পাতা কলের পুতুলের মধ্যে ঢুকে গেছিল।" বড়কাকা ধমক দিয়ে উঠলেন, "যা বুঝিস না, তাই নিয়ে কথা বলিস না। এখানে কোনো শত্রুপক্ষ ঢুকেছে। খবরদার ঐ জ্যাম মুখে দিবি না।"

ঘোতন অবাক হয়ে বলল, "ওমা! আমরা তো টিপিন খেয়ে খেয়ে একটা বোতল ফুরিয়েই ফেলেছি। খাসা জিনিস।" বড়কাকার শরীর খারাপ লাগতে লাগল, উনি শয্যা নিলেন, রাতে খেলেন না।

পরদিন আলমারি খুলে গোছা গোছা বই নামিয়ে, পেনসিল নিয়ে বসে পড়ে ওদের বললেন, "আমি আজ খিদের বড়ি খেয়ে থাকব। তোদের যা ইচ্ছা খাস্, আর কিছু সঙ্গে নিয়ে ঐ পূব দিকটা পরিদর্শন করে আয়, ওটা দেখা বাকি রয়ে গেছে। আমি পায়ে জোর পাচ্ছি না।"

শুনে ওরা মহা খুশি, "স্কুটার নেব, বড়কাকা? তাহলে অনেকটা ঘুরে আসতে পারব।" বড়কাকা মুখ তুলে বললেন, "যা খুশি নিস্, তবে সন্ধ্যার আগে আমার কিরকম—ইয়ে—নার্ভাস লাগছে।"

ওরা তাঁকে সাহস দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পৃথিবীর ছোট মডেল। টপ করে একবার পাক খেয়ে আসে, যেমন ছোট দিন, তেমনি ছোট রাত। তবু নাকি যন্ত্রের সাহায্যে পাকের গতি কমিয়ে রাখা হয়েছে। ওরা মনের আনন্দে গান জুড়ে সোজা পূবদিকে চলল। মনে হল সমস্ত গাছপালা, ফুলের ঝোপ, পাখি, হরিণ স্ফূর্তির চোটে লাফাতে শুরু করেছে। কোথা থেকে দলে দলে প্রজাপতি উড়ে এল। তাহলে শুয়োপোকাও নিশ্চয় আছে। তারাই হয়তো গাছের পাতা খেয়ে শেষ করে দেয় বলে পাঁচ বছরেও আকাশ-ঘাঁটি জঙ্গলে ভরে যায়নি। বেজায় হাসি পেল দুজনার, প্রাণ খুলে হা-হা হো-হো করে খানিকটা হেসেও নিল। অবাক হয়ে চেয়ে দেখল দূরের গাছতলায় কলের মানুষের দল কাজ ফেলে, হেসে গড়াচ্ছে। এবার ওরা এমনি চমকে গেল যে সঙ্গে সঙ্গে হাসিও থেমে গেল। অমনি কলের মানুষরাও যে-যার উঠে পড়ে কাজে নেমে গেল, যেন কিছুই হয়নি। নাকি সবটাই চোখের ভুল। কাজের মানুষ দেখে দেখে চোখ ক্লান্ত হয়ে গেছে, এখন কুঁড়ে মানুষ, আমুদে মানুষ দেখবার স্বাদ হয়েছে। কালীঘাটের বুড়ো ঠাকুরদার আমলের এঁদো পুকুরে মাছ কত। সেখানে একটা কামরাঙা গাছের তলায় ভাঙ্গা ঘাটের সিঁড়ি আছে। তাতে বসে ছিপ হাতে ওরা কত দুপুরই না কাটিয়েছে। ভারি মিষ্টি কামরাঙা, খেলে নাকি জ্বর আসে। কই হুলো ঘোতনের তো কখনো জ্বর আসেনি। মুদির দোকান থেকে একপলা তেল চেয়ে এনে, রোগা বোনটাকে দিয়ে কাঠের জ্বালে ভাজিয়ে খেয়েছে। যেন অমৃত।

অন্যমনস্ক হয়ে ওরা আরো কতদূরে চলে এসেছিল নিজেদেরই খেয়াল নেই। সামনে একটা মস্ত পাঁচতলা বাড়ি, নিচের দিকে নিরেট দেয়াল। হয়তো কোনো

গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি আছে। ওপরে ঘুলঘুলির মতো ছোট দেখতে জানালা। হয়তো ততটা ছোট নয়, নিচে থেকে দেখতে ঐ রকম লাগছে। চারদিকে খাঁ খাঁ করছে ঘাসজমি। এখানে কোনো যন্ত্র-মানুষও দেখা যাচ্ছিল না। ওরা স্কুটার থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ঘুরতে ঘুরতে খিলান দেওয়া বন্ধ ফটকের সামনে পৌঁছাল। অমনি ঠক্ করে কি একটা ছোট জিনিস ওদের পায়ের কাছে পড়ল। তুলে দেখে চামড়ার স্পষ্ট ছাপ লাগানো একটা টিসো কোম্পানির হাতঘড়ি। অতখানি নিচে পড়েও ভাঙেনি।

তাই দেখে হুলোর হাত-পা ঠাণ্ডা। দু'পা পিছু হটে ওপরে তাকিয়ে মনে হল অনেক উঁচুতে, খুদে ঘুলঘুলিতে খুদে রুমাল উড়ছে। তখন হুলো ঘোতনকে পায় কে। বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়া ওদের অভ্যাস, বুকে ওদের ভয়-ডর ছিল না, এক ভূতের ভয় ছাড়া। এখানে মানুষই নেই। তাহলে ভূত আসবে কোত্থেকে? মানুষ মলে তবে না ভূত তৈরি হবে! মানুষ যাতে না মরে, সেইটেই আগে দেখা দরকার।

ফটকে বাইরে থেকে খিল দেওয়া। খিল তুলে ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল চারদিকে গুন্ গুন্ করে মেশিন চলতে শুরু করল। হুলো প্রথমটা চমকে উঠেছিল, তারপর বুঝল দরজা খোলার সঙ্গে এর কিছু যোগ আছে। সামনে মস্ত হল-ঘরের এক পাশে পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, অন্যদিকে নিঃশব্দে একটা স্বয়ংক্রিয় লিফট নেমে এল।

ওরা তাতে না উঠে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। চেনা বামুনই ভালো। উঠছে তো উঠছেই। থেকে থেকে একটা করে দরজা। ওরা সোজা পাঁচ তলায় উঠে থামল। বুকে হাতুড়ি পিটছিল, হাঁপে না ভয়ে তা টের পাওয়া যাচ্ছিল না। হাঁপেই হবে, কালীঘাটের মাস্তানের আবার ভয় কিসের। দরজা ঠেলে দেখে ছোট হল-ঘর, মাথার ওপর আলো জ্বলছে, চারদিকে চারটি দরজা। সব দরজায় বাইরে থেকে খিল দেওয়া। সব খুলে ফেলে দিল ওরা; ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুই সায়েব, দুই মেম আর গোটা পাঁচ-ছয় ছেলেপুলে। যেমন যেমন ঘটেছিল এ গল্পে তার তেমনি বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে। মেম দুটো ওদের গলা জড়িয়ে গালে চুমো টুমো খেয়ে একাকার! কিন্তু কিচির মিচির করে কি বলছিল বোঝে কার সাধ্যি।

সায়েবরাও কত জিজ্ঞাসা করল, তার মধ্যে শুধু 'বাগ্‌চি' কথাটাই বোঝা গেল? বড়কাকার নাম বাগ্‌চি। হুলো ঘোতন যে একেবারে ইংরিজি জানত না

তাতো নয়, তবে এরা বোধহয় ফরাসী ভাষায় বলছিল, খুব চন্দ্রবিন্দু লাগাচ্ছিল। কিন্তু ওদের সারা গায়ে ভারি চমৎকার একটা মানুষ মানুষ ঘেমো গন্ধ। শুঁকলে প্রাণ জুড়োয়। শেষটা হুলো সাহস করে বলল, "বাগচি কাম।" শুনে ওরা আহ্লাদে আটখানা।

দেখতে দেখতে সবাই মিলে হুড়-মুড় করে নিচে এল। কোথা থেকে কয়েকটা স্কুটার বেরুল। কেউ কারো কথা বোঝে না, কাজেই সময় নষ্ট করে কি লাভ? দল বেঁধে ওরা বড়কাকার বাড়িতে ফিরে এল। পাঁচতলা বাড়ি যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল, শুধু সদরের ফটক বন্ধ করতেই আলো নিবে গেল, মেশিন বন্ধ হল। ওদের সাড়া পেয়ে পাড়িমরি করে বড়কাকা ছুটে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে সায়েব দুটোতো—যার খুশি অবিশ্বাস করতে পারে—ছুটে গিয়ে দুই গালে চুমো খেয়ে ফেলল। হুলো এমনি চমকে গেল যে মুখ থেকে ইংরিজিতে বেরিয়ে গেল, "মাই গড" তার পরের ব্যাপার আরো আশ্চর্যের। দলে দলে দঙ্গলে দঙ্গলে কলের মানুষরা ওদের ঘিরে দাঁড়াল, তাদের নানা রঙের সাজ দেখে ঝাঁক রঙ্গীন প্রজাপতির কথা মনে হল। মাথার ওপর থেকে একটা গুন্‌গুন্ শব্দ শোনা গেল; প্রায় সেই স্পেস্-স্টেশনের মতো চেহারার, কিন্তু অনেক ছোট কতকগুলো রূপোলী চ্যাপটা আকাশযান কে জানে কোথা থেকে দেখা দিল আর কলের মানুষরা হো-হো করে হাসতে হাসতে, হাত নেড়ে গুড-বাই জানিয়ে প্রজাপতির মতো ডানা মেলে উড়ে গেল। নীল আকাশ রঙের কুচিতে ছেয়ে গেল, আকাশ-ঘাঁটির যেখানে যত কলের মানুষ ছিল সবাই বোধহয় বিদায় নিল। আকাশযানের নিচে দরজা খুলল, ওরা ঢুকে যেতেই, আকাশযানও উড়ে গেল।

বিনো আর করিগা মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ওদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা মহানন্দে চারদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল, যেন কিছুই হয়নি। বড়কাকা হাত-পা এলিয়ে পড়ে যাবার যোগাড় করছেন দেখে হুলো ঘোতন একসঙ্গে বলে উঠল, "কি এমন হয়েছে যে মুচ্ছো যাবার চেষ্টা করছেন?" বড়কাকা এমনি রেগে গেলেন যে মুচ্ছোটুচ্ছো একেবারে সেরে গেল। তেরিয়া হয়ে বললেন, "এত বড় জায়গাটার কাজকর্ম কে করবে শুনি? রোবোগুলো তো সব জ্যান্ত হয়ে উড়ে গেল।" ব'লে কেমন হিস্টিরিয়া রোগীর মতো ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লাগলেন। তাই শুনে বিনো করিগাও হাঁটু চাপড়ে মাটিতে বসে পড়ে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

হুলো ঘোতন কোনো কথা না বলে কলের মানুষেরা ঘাস জমিতে যে নাইলনের নল দিয়ে জল দিত, সেটি তুলে নিল। তাই দেখেই বড়কাকার হিস্টিরিয়াও সেরে গেল। হুলো বললো, "আমাদের বাড়ির লোকদের যদি এখানে এনে দেন, আপনাদের কলের পুতুল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি।" বড়কাকা বললেন, "এক্ষুনি, এক্ষুনি! আরে এখানে বাছাই করা লোক বসিয়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানোই তো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে বিশ্বাসী লোক বারোমাস এখানে থাকতে চায় না। তাই তোদের ভুলিয়ে ভালিয়ে আনতে হল। তোদের মতো সাহসী লোক কোথায় পাবো বল? তাছাড়া শুনেছি মাস্তানদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে তাদের মতো বিশ্বাসী বন্ধু এবং কর্মী আর পাওয়া যায় না।"

হুলো ঘোতন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, "এখানে একটা ছোট নদী দেখেছি, তাতে চিংড়ি মাছ ইত্যাদি ছাড়া যাবে না?" বড়কাকা বললেন, "খুব যাবে। চারাটারা সব এনে দেব। এবার বল কলের মানুষরা কোথায়?"

ঘোতন হেসে বলল, "প্রত্যেক রাস্তার দশ নম্বর বাড়িতে গোটা কুড়িক এলিয়ে পড়ে আছে, ওরা বোধহয় তাদের চাবি খুলে নিয়েছে।" বড়কাকা "বলিস্ কি?" বলে তিনহাত লাফিয়ে উঠলেন। সায়েব দুটোও হোয়াট? হোয়াট? করতে করতে ছুটি এল।

দেখা গেল বাস্তবিকই তাই। হুলো ঘোতনের অভ্যাস চারদিকে নজর রাখা, এখানে ওখানে উঁকি মেরে ঐ ব্যাপারটি তারা আবিষ্কার করেছিল। তবে ওরা ভেবেছিল পুতুলগুলো হয়তো সম্পূর্ণ নয়, আরো কিছু করলে তবে চালু হবে। বড়কাকা আর দুই সায়েবের সঙ্গে এবং পরের কদিন কলের মানুষদের আবার চলৎশক্তি ফিরিয়ে আনতেই কেটে গেল। জনা পঞ্চাশ চালু হলে, তাদের সাহায্যে কাজ আরো সহজ হল।

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিনোর বাড়ির বাগানে বসে কথা হচ্ছিল, বড়কাকা দোভাষীর কাজ করছিলেন। মেমরা থেকে থেকে কফি আর ভালো ভালো খাবার জিনিস এনে দিচ্ছিল। হুলো বলল, "সব বুঝেছি, কিন্তু ঐ যারা উড়ে চলে গেল, তারা কে?"

করিগাকে একথা অনুবাদ করে বলতে হাত-পা নেড়ে সে যা বলল, তার বাংলা করলে সংক্ষেপে দাঁড়ায়, এই ধরনের কিছু ;আমাদের সৌরমণ্ডল আছে, আকাশের দিকে খালি চোখে দেখলেও সেটা বোঝা যায়। যত তারা দপ্ দপ্ করে জ্বলে,

প্রত্যেকের চারদিকে অনেকগুলি করে গ্রহ ঘোরে। তাদের মধ্যে অন্তত: দুটি একটির প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের পৃথিবীর মতোই। সেখানেও নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান জীব আছে. হয়তো মানুষের চাইতেও তারা বেশি জ্ঞানী। আমাদের মনে হয় তাদেরি একদল এখানে এসে গত পাঁচ বছরে একাধিকবার ছুটি কাটিয়ে গেছে। এখানকার হালচাল শিখে নেবার পর আমাদের রোবোদের উপস্থিতিতে ওদের হয়তো অসুবিধা হত। রোবোদের মাথায় সব কিছু রেকর্ড হয়ে যায়, ওদের সব কথা জানাবার ইচ্ছা নাও থাকতে পারে, তাই খুব দক্ষভাবে রোবোদের অচল করে, নিজেরা রোবো সেজে ছিল। যখন কেউ থাকত না, তখন হয়তো রোবো সাজ পরত না। যেমন বাগচির সঙ্গে কথা ছিল, মাস দুই হল আমরা এসেছি। প্রথমটা খেয়াল করিনি, গুছিয়ে বসতেই ব্যস্ত ছিলাম। তারপর ছেলেমেয়েরা কেবলি বলতে শুরু করল একই নম্বরের একাধিক রোবো আছে। তাতো থাকবার কথা নয়। তারা কাজও করে ঢের বেশি। যে বিদ্যা পুরে দিয়েছিলাম, তার বেশি তো জানবার কথা না। আমাদের গিন্নিরা জ্যাম জেলি বানিয়েছিল, কিন্তু বাগচির বাড়িতে সেসব এল কোত্থেকে? যেই না মনে সন্দেহ হওয়া সঙ্গে সঙ্গে ওরাও টের পেয়ে গেল। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি ঐ বাড়ির পাঁচতলায় আমরা বন্দী। কিন্তু কি ভালো খাবার দিয়ে যেত একটা সত্যিকার রোবো সে আর কি বলব! আজ আমরা ছাড়া পেয়েছি দেখে পালিয়েছে সব।"

ঘোতন বলল, "কিম্বা হয়তো ওদের ছুটিও ফুরিয়েছে, তাই আকাশ-যান ওদের নিতে এসেছিল। কোথা থেকে কে জানে!" এসব ঘটনার পর আরো বছর দুই কেটে গেছে। হুলো ঘোতন আকাশ-ঘাঁটির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। রোগা বোনটা আজকাল নেচে বেড়ায়। বড়কাকা ত ওখানেই থাকেন, মাঝে মাঝে পৃথিবী থেকে ঘুরে আসেন, দরকারি জিনিস সওদা করে আনেন। সেই দেখে ওখানে ঐ জিনিস তৈরি হয়। এখন সেখানে অনেক বাসিন্দা। সব নিয়ে হাজার খানিক হবে। তাদের মধ্যে হুলো ঘোতনের মনের মতো দুটি মেয়েও আছে। এ গল্পের শেষটা ভালো।

এইরকম আরো হাজার হাজার পৃথিবী তৈরী করা হবে। তাদের যে কোনটি থেকে পরিষ্কার রাতে আকাশের দিকে তাকালে, স্থির নীল রঙের একটি ছোটগ্রহ দেখা যাবে। সেই আমাদের এই পৃথিবী।

---

২. 'লে'

অম্বিকা যখন শনিবার বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, থানার ও-সি কানু সামন্ত ওর কাছে এলেন। তাতে অম্বিকা যত না আশ্চর্য হল, তার চাইতে বিরূপ হল। এ হেন আচরণের একটা মাত্র মানে হয়। কানু সামন্ত বললেন, "তোমার শনি রবির ছুটিটা বন্ধ করতে হল, অম্বিকা, লাদাখের সেই মোড়লকে তার গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।" শুনে মুহূর্তের জন্য অম্বিকার মনটা মুষড়ে পড়েছিল, তারপরেই একেবারে নেচে উঠল। লাদাখ, হিমারণ্য, বরফের পাহাড়ের মাথায় নিশানের মতো মেঘ উড়তে থাকে, চির-তুষারের ঢিপির তলা দিয়ে গল-গল করে বরফ গলা জল বেরিয়ে আসে। কেউ কেউ হরিণের খুরের দাগের মাঝে মাঝে ভাল্লুকের পায়ের ছাপ দেখেছে। বরফের চাংড়ার মধ্যে ফাটল থাকে, তার ভিতর দিয়ে বাতাস বইলে নাকি অপার্থিব বাঁশী বেজে ওঠে। তাকে নাকি "অলখা" বলে!

কানু সামন্তর মুখের দিকে চেয়ে অম্বিকা সরাসরি বলল, "আমার ডবল বুনটের গরম মোজা, কচ্ছপ-গলার সোয়েটার, লোহার ফলা-দেওয়া লাঠি, এ-সব কিছু নেই, স্যার। আমি কি করে যাব? বটুদাকে বলুন।" কানু সামন্ত অবাক হলেন, "বটু কি করে যাবে? বেড়ালের ডাক শুনলে যার খিঁচ ধরে, সে কি করে হিমারণ্যে যাবে, অম্বিকা? তোমাকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস ও খরচপত্র, এবং তার ওপর বিশেষ ভাতা তিনশো টাকা দেওয়া হবে। আজ রাতের গাড়িতে তোমাদের জন্য সেকেণ্ড ক্লাসে সীট বুক করা হয়েছে। পঞ্চু পেয়াদা সঙ্গে যাবে, সাক্ষাৎ যমদূত, উপরন্তু ওস্তাদ যোগাড়ে, ওদিককার ভাষা জানে, তোমার কোনো রকম অসুবিধা হওয়া অসম্ভব। জানতো ভয় বলে কিছু নেই পঞ্চুর।"

বুকের উল্লাস বুকে চেপে অম্বিকা বলল, "তাহলে আমাদের বাড়িতে যদি এখান থেকে একটু—মেয়েদের জানেন তো স্যার!" কাষ্ঠ হেসে কানু সামন্ত বললেন, "সে আর জানি না! হুঁঃ! বলে নাকি নারীবর্ষ!"

লাদাখি মোড়লের নাম নাকি 'লে'। যতদূর বোঝা গেল ঠিক মোড়ল-ও

নয়, বরং ওদের গ্রামের ধর্মগুরু, নাকি অনেক ক্ষমতা ধরে, অন্ততঃ পঞ্চু পেয়াদা তো তাই বলল, যাদু, গুণ, ভেল্কি, ভোজবাজি, কি না জানে। নতুন জিনিসপত্রগুলো কিট্ ব্যাগে ভরতে ভরতে অম্বিকা পঞ্চুকে বলল, "তাহলে বুড়ো পনেরো দিন হাজতে পচেছে কেন? সবাইকে গুণ করে বেরিয়ে পড়ল না কেন? তুমিও যেমন!" "না, স্যার, ওর থলিটা যে বড়সাহেব জমা করে রেখেছিলেন, ঐ যে লাল পুটলি এক্ষুনি ভরলেন, ঐতে সব দরকারী জিনিসপত্র থাকে। ওটি না পেলে তুক্‌তাক্ হয় কখনো? জানেন, জিনিস পেলেই লোককে অদর্শন করে দিতে পারে। সাবধানে নিয়ে যেতে হবে স্যার, চষলে-টষলে কোথায় বিপদে ফেলে দেবে কে জানে। ওকে যারা ধরেছিল, তাদের একজন বুঝি ওকে লাঠির গুঁতো মেরেছিল, সে লোকটাকে তো আর দেখা যাচ্ছে না। নাকি বাড়িতেও যায়নি।"

অম্বিকা বলল, "কে, ঐ জগুকে? ও ব্যাটা তো নিখোঁজ হতে ওস্তাদ। রাখ তোমার যাদুবিদ্যা, তাই যদি জানত তো আর ছেঁড়া খোঁড়া পোশাক পরে কলকাতায় গাঁজার ব্যবসা করতে আসত না! আরেকটা পি. সি. সরকার বনে যেত।" পঞ্চু কিছু বলার আগে কানু সামন্ত কখন ঘরে ঢুকেছিলেন, তিনি হেসে বললেন, "সে আর বলতে! বুড়োকে খাইয়ে-দাইয়ে,—হ্যাঁ, ভালো কথা গাঁজার ব্যবসা করত তাই বা কে বলেছে? কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বে-কসুর খালাস পেয়েছে। ওর বিরুদ্ধে আসল চার্জ ছিল নাকি ধুলো-পড়া করে শত্তুরদের 'নেই' করে দেয়। জিজ্ঞাসা কর না পঞ্চুকে, লাদাখ অঞ্চলে ও তো অনেকদিন ছিল, ওখানকার বিষয় না জানে এমন জিনিস নেই। নাকি গাঁয়ের প্রধান মানেই 'উইচ-ডক্টর', তার মানেই বুঝলে তো—'ডাকিনীমন্ত্রে' সিদ্ধ-হস্ত। গাঁ সুদ্ধ সব থরহরি কম্পমান, কেউ ঘাঁটাতে চায় না, শেষটা 'নেই' করে দিক আর কি! এই লোকটাকে দেখে কিন্তু একটুও সে রকম মনে হয় না। সবটাই পঞ্চুর বার-ফাটাই কি না কে জানে। ওর যত সব লম্বা চৌড়া কথা! তুমি ওসবে কান দিও না। মোড়লকে ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো, নইলে এই সামান্য ব্যাপার থেকে একটা কুরুক্ষেত্র না গড়ে ওঠে!

কানু সামন্তর দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে শুনতে অম্বিকার ব্যাগটা বাঁধা হয়ে গেছিল। হেসে বলল, "আমার স্যার, 'নেই' মন্ত্র ভয় করলে চলবে কেন? শুনেছি আমার বুড়ো ঠাকুরদার শত্রুদেরো 'নেই' হবার অভ্যাস ছিল। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে তবে ওর লাল থলিটা ওকে দিয়ে দেব তো? পথ-খরচা তো আমাদের দায়িত্ব।

শুনলাম ওর সঙ্গীসাথীরাও ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নি-খোঁজ হয়ে গেছে! তাহলে ঐ পাহাড় পর্বতে আমাদের পথ চেনাবে কে? বুড়োর ভাষা তো এক বর্ণ বোঝা যায় না।"

পঞ্চু পেয়াদা ভরসা দিল, "আর কেউ না বুঝুক আমি তো ওর কথা বুঝব। গোলমাল লাগলে গাঁয়ে জিজ্ঞাসা করে নেব। মধু—কো অঞ্চলটার বেশ খ্যাতি আছে, স্যার, সবাই চেনে। এ ব্যাটা সত্যি সেখানকার লোক কি না তাই বা কে জানে। চোখ দুটো কেমন মিষমিষ করে দেখছেন? সবটাই হয় তো বুজরুগী! গাঁজার ব্যবসা করে না, শত্রু অদৃশ্য হয় অন্য কারণে, তবে ব্যাটা এসেছে কেন এ মুলুকে? দূর তো কম নয়. খরচাও দেদার। আমার কি মনে হয় জানেন, কারো গুপ্তচর—নয় তো? এই পনেরো দিন হাজতে বসে কত খবর সংগ্রহ করেছে কে জানে! কিছু মনে করবেন না, স্যার, আমাদের অফিসারদের মুখ বড় আল্‌গা—"কানু সামন্ত ধমক দিয়ে বললেন, "চোপ! তুমিও কিছু কম যাও না, দেখ দেখ, তোমরা সকলেই বড় বেশি কথা বল, এখন যদি আমাদের নামে মানহানির মামলা করে, সে কি তুমি সামলাবে? করবে না অবশ্য, অন্ততঃ তাই মনে হয়। ক্ষমা টমা চেয়ে, সন্দেশ রসগোল্লা খাইয়ে, সমীরের সঙ্গে চাকলাদারের ম্যাজিক শো দেখতে পাঠালাম। সে এক মজা। লাল রুমাল সাদা হচ্ছে, ঘড়ার জল শেষ হচ্ছে না, খালি টুপি থেকে বোতল বোতল টমেটো সস্ বেরুচ্ছে—এ-সব দেখে তো ওর চক্ষু ছানাবড়া। আর কখনো ভেল্‌কিবাজির কথা মুখেও আনবে না দেখো।"

মোড়লের নাম 'লে', বয়স হয়তো বছর ষাট হবে, একটাও দাঁত নেই, পক্-পক্ করে কি যে বলে তার ঠিক নেই, তবে পঞ্চু নাকি সব বুঝতে পারে। দুজনার মধ্যে ষড় আছে কিনা কে জানে। শেষটা মওকা পেয়ে অম্বিকাকে সুদ্ধ না অ-দর্শন করে দেয়। অবিশ্যি কেনই বা দেবে, অম্বিকা তো আর ওর কোনো ক্ষতি করেনি। সঙ্গে জিনিসপত্র বলতে ঐ মুখ-বাঁধা লাল থলিটি ছাড়া আর কিছু নেই। অমায়িক, ভালো মানুষ বুড়ো। একেই কিনা মিথ্যা সন্দেহে পনেরো দিন আটক করে রাখা হয়েছিল! সে যাই হোক, শেষটা যে কানু সামন্ত খুবই ভদ্রতা করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গাড়িতে বেশ শীত লাগছিল, শীত এসে গেছিল, হু-হু হাওয়া। অম্বিকা ওর কম্বলের অর্ধেকটা বুড়োর পায়ের ওপর দিয়ে জড়িয়ে দিয়ে, ফেরিওয়ালার কাছ থেকে মর্তমান কলা আর ঝাল পান কিনে দিল। তা বুড়ো কিছুতেই নেবে না। পঞ্চু

বলল "উনি বলছেন ওঁদের নিয়ম কিছু নিলে কিছু দিতে হয়।" অম্বিকার মজা লাগল, "কিছু দিক তা হলে!" বলে, হাত পাতল। আনন্দে বুড়োর চোখ চিকচিক করে উঠল, অমনি সে ঝুলি থেকে ম্যাড়মেড়ে কালো একটা পাথর বসানো সীসার আংটি বের করে ওর আঙুলে পরিয়ে দিয়ে, পর পর তিনটে কলাই খেয়ে ফেলল। হয়তো বেচারির খিদে পেয়েছিল। রাতে অম্বিকার গায়ে ঠেস দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুল। গায়ে একটু টকটক গন্ধ থাকা উচিত ছিল, কিন্তু অম্বিকার নাকে আসছিল শুধু রোদে শুকনো ঘাসের আর কাঁচা ধূপের গন্ধ। মনটা কেমন করছিল।

ট্রেন থেকে নেমে হাঁটা পথ ধরে অনেকখানি উপরে উঠতে হয়। সে পথ বড় দুর্গম। পথ তো নয়, পাহাড়ী ছাগল চরার ভূমি। শিকড় বাকড় আঁকড়ে উঠতে হয়। বলা বাহুল্য নিজেদের কিট ব্যাগ নিজেদের বইতে হচ্ছিল। তবে তার ওজন বেশি নয়। হঠাৎ চোখে পড়ল পঞ্চু তার ব্যাগটা বুড়োর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। পঞ্চুর হাবভাব ভালো মনে হল না। চিরকাল গুণ্ডা বলে নাম ওর, টাকাকড়ি সম্বন্ধেও খুব একটা খ্যাতি ছিল না, হাজতের বন্দীরা ওকে যমের মতো ভয় করত। অবিশ্যি ঐরকম জবরদস্ত বলেই কানাই সামন্ত এই বিপদ-সঙ্কুল পথে ওকে সঙ্গে দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে একজন নিরীহ নির্দোষ নির্বাক সরল বুড়োর ওপর কোনো রকম হামলা অম্বিকার অসহ্য মনে হল। পঞ্চুকে হুকুম করল অতিথির কাঁধে না চাপিয়ে, নিজের ব্যাগ যেন নিজে বয়। হাঁড়ি মুখ করে পঞ্চু হুকুম তামিল করল। আসছে বছর পদোন্নতি হবার কথা, এখন খারাপ রিপোর্ট দিলে মুস্কিল। বিড়বিড় করে বুড়োকে পাঁচ কথা শোনাল মনে হল; শুনে 'লে'র গালদুটো আপেলের মতো লাল হয়ে উঠল। একবার মনে হল চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, তবে সেটা অম্বিকার ভুল-ও হতে পারে।

'লে'র চেহারায় একটা তফাৎ দেখা যাচ্ছিল। যতই ওপরে উঠছিল ওরা, হু-হু করে হাড়-কাঁপানো বাতাস দিচ্ছিল, নিশ্বাস নেওয়া কষ্টকর মনে হচ্ছিল, ততই বুড়োর শরীরে যেন তেজ আসছিল, বয়স কমে যাচ্ছিল, ঘাড় গুঁজে না হেঁটে, তীরের মতো সোজা হয়ে হাঁটছিল।

পা যখন আর চলে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে, তখন বুড়ো মৃদু হেসে অম্বিকার কাঁধে একটা হাত রেখে, আঙুল দিয়ে মাথার ওপরে দেখাল। তখন বিকেল হয়ে এসেছে, দূরের পাহাড়ের মাথার বরফে সোনালী রঙ ধরেছে, ওরা থামতেই চারদিকটা নীরব নিস্তব্ধ, ঝিমঝিম করতে লাগল। দুঃখের বিষয় লে'র কথা অম্বিকা

কিট-ব্যাগ নামিয়ে লাল থলি বের করে দিল

বুঝতে পারল না, ঐ ওদের গ্রাম, শুধু এইটুকু বুঝল। অমনি কিট-ব্যাগ নামিয়ে লাল থলি বের করে দিল। হঠাৎ এগিয়ে এসে কর্কশ গলায় কি যে বলে উঠল পঞ্চু, ময়লা হাতে থলির মুখ ধরে টান দিল।

অম্বিকা তো অবাক। "ও কি হল, পঞ্চু? ময়লা হাতে থলি টেনো না।" পঞ্চু বলল, "আপনি এদের চেনেন না, স্যার, থলিতে করে সোনা পাচার করছে হয়তো।" বলে বুড়োকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল পঞ্চু। তারপর কি যে হল অম্বিকা আজ পর্যন্ত বোঝেনি। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে, লে থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো কিসের যেন সোনালী গুঁড়ো বের করতেই, পঞ্চু ওর হাতের ওপর সজোরে এক থাবড়া মারল মনে হল। চারদিকটা কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশায় ভরে গেল, অম্বিকার নাকে এল রোদে শুকনো ঘাসের আর কাঁচা ধুনোর মিষ্টি গন্ধ। চোখ ফিরিয়ে দেখে বুড়ো ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। পঞ্চু কোথাও নেই।

নেই তো নেই। সত্যি সত্যি তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। বুড়োর সঙ্গে ওদের গ্রামে গেছিল অম্বিকা, মাথা ঘুরছিল খুব। লে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গরম ঘন বোধ হয় ইয়াক গোরুর দুধের সঙ্গে, সুগন্ধী মশলা খাইয়ে সুস্থ করে, পর দিন অনেক আদর করে, সঙ্গে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল। যাবার সময় ছোট্ট একটা সোনার মাদুলী দিতে চেয়েছিল, অম্বিকা নেয়নি। গ্রামের একমাত্র হিন্দী জানা ছোকরার সাহায্যে জানিয়েছিল দামী উপহার নেওয়া বে-আইনী। কিন্তু পঞ্চুর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। বুড়োই বা জানবে কোত্থেকে, অম্বিকার চোখের সামনে থেকেই তো সে হাওয়া হয়ে গেছিল। ফিরে এসে রিপোর্ট করলে কানু সামন্ত হেসে বললেন, "আরে, তুমিও যেমন, ঐ জন্তুর মতোই গা ঢাকা দিয়েছে।" খাতায় লিখলেন, অ্যাব্‌স্কণ্ডিং। কিন্তু!

---

৩. একটি আষাঢ়ে গল্প

[এক]

আজকাল নাকি স্থানাভাবে কলকাতা শহরে বারো-চোদ্দতলা বাড়ি উঠছে; একদিন যখন সব হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে তখন ঠেলাখানা বোঝা যাবে। বাস্তবিকই যদি জায়গা-জমির অত অভাব হত, তাহলে নকুড়বাবুদের বাড়ির পাশেই, দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিলে ঘেরা দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়িটাকে, তার চার বিঘে বনজঙ্গলে ভরা বাগান নিয়ে, আজ তিনপুরুষ ধরে লোকচক্ষুর অগোচরে অমন পড়ে থাকতে হত না।

এককালে যে অনেক খরচ করে ওবাড়ি তৈরি হয়েছিল, তার প্রমাণস্বরূপ এতকালের অব্যবহারেও দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ, কোথাও কিছু খসে-ধ্বসে পড়ে নি। সদর রাস্তার ওপরে দশ ফুট উঁচু ফটকের প্রকাণ্ড লোহার কড়ায়, কোন কালের কোন হাকিমের হুকুমে যে বিরাট লোহার তালা লাগানো হয়েছিল, তাতে মরচে ধরলেও, ভাঙেনি।

লোকে বলত ভূতের বাড়ি; ভুলেও কেউ ভেতরে যাবার চেষ্টা করত না। নকুড়বাবু তাঁর এটর্নি শ্বশুরের কাছে শুনেছিলেন, তিনপুরুষ ধরে বাড়ি নিয়ে মামলা চলে, অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে থেমে আছে, আসল ওয়ারিশরা নিখোঁজ। সন্ধ্যামণির মামাবাড়ির সঙ্গে ওদের নিকট সম্পর্ক ছিল, এমন কি সন্ধ্যামণির মা'র দিদিমার বিয়ে হয়েছিল ঐ বাড়িতেই। তখন বর্ষাকাল, গাঁয়ের বাড়ির চারধারে জল, নৌকো চেপে যাওয়া-আসা করতে হত। ঐ বিয়ের পর আর কেউ বড় একটা ও-বাড়িতে বাস করেছে বলে শোনা যায় নি। বাড়ির মালিকানা নিয়ে সেই ইস্তক ঝগড়া-ঝাটি, মামলা-মোকদ্দমা চলেছে। এ বাড়ির তিনতলার এই ঘরটিকে নকুড়বাবুর পড়ার ঘর, কাজের ঘর, গোঁসা ঘর, অস্থায়ী শোবার ঘর ও বিপদের আশ্রয়ও বলা চলে। সন্ধ্যামণি বড় একটা এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে চায় না। চারদিকে জানলা, ফুরফুর করে হাওয়া দেয়, পাখার অভাব বিশেষ টের পাওয়া যায় না। জানলার মাঝে মাঝে প্রায় ছাদ অবধি উঁচু কালো কাঁঠালকাঠের আলমারি, কানায় কানায় নথিপত্র, ফাইল আর আইনের বই ইত্যাদি দিয়ে ঠাসা। তাকালেও দম বন্ধ হয়ে আসে; কিন্তু ঘরটি নিরিবিলি; সোজা একতলার হলঘর

থেকে উঠে আসা যায়, মক্কেলরা তাই আসেও। মুস্কিল হল, দোতলার বড় ঘরে সিঁড়ির দিকে মুখ করে, সন্ধ্যামণির চররা দিনরাত বসে থাকে আর কে উপরে গেল না গেল রিপোর্ট করে। বন্ধুবান্ধবদের এখানে আনা যায় না।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, পাশের বাড়ির দোতলার বন্ধ খড়খড়ির ফাঁকে আলো দেখতে পেয়ে নকুড়বাবু একটু বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। মনে পড়ল ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় মাঝে মাঝে বলত বটে, পাশের বাড়িতে ভূতেরা আলো জ্বালে, তবে ওদের কথায় কেউ বড় একটা কান দিত না; সন্ধ্যামণি ওসব কুসংস্কার পছন্দ করে না। আজ দেখা গেল শুধু আলোই নয়, মাঝে মাঝে একটা ছায়াও যেন নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। আলোটা কমছে, বাড়ছে, কাঁপছে, মোমবাতিই হবে বোধহয়।

ছোট একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে, নকুড়বাবু ভাবলেন, রোমাঞ্চ হয় তো এই-খানেই হাতের গোড়াতেই রয়েছে, অথচ সেখানে তাকে খোঁজা দূরের কথা, হলুদ মলাটের রোমাঞ্চ সিরিজের বইগুলোকে পর্যন্ত নথিপত্রের মধ্যে চাপা দিয়ে লুকিয়ে বাড়িতে এনে, খবরের কাগজের মলাট দিয়ে ঢেকে তিনতলার এই পড়ার ঘরের শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে, গভীর রাতে দুরুদুরু বক্ষে পড়তে হয়। অথচ এ কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই সামান্য ভীতিবিহ্বলতার মধ্যেও যেটুকু রোমাঞ্চের আস্বাদ আছে, নকুড়বাবু তারও শেষ কণাটুকু উপভোগ করেন। অবিশ্যি এর বিন্দুবিসর্গও যদি সন্ধ্যামণি জানতে পারে, তা হলে যে নকুড়বাবুর তিনতলার এই নিঃসঙ্গ স্বর্গবাসটুকু ঘুচে যাবে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। উঠতি এটর্নিদের যে এসব বিলাসব্যাসন থাকতে নেই, সন্ধ্যামণির মুখে সে কথা নকুড়বাবু কম করে লক্ষবার শুনেছেন।

উঠতি এটর্নি হলেও, নকুড় ঢোলের বয়সটা নিতান্ত কম নয়, তবে সন্ধ্যামণি বলে, আটচল্লিশ না কি এটর্নিদের উঠতি বয়স; তার আগে পসার জমলেও, সেটা অস্বাভাবিক এবং অস্থায়ী। এসব বিষয়ে সন্ধ্যামণি খুব ওয়াকিবহাল, কারণ শুধু যে পসারটি আসলে তার বাবার তৈরি এবং নকুড়বাবু বিলম্বিত যৌতুকস্বরূপ পেয়েছেন তাই নয়, উপরন্তু সন্ধ্যামণি প্রাইভেটে বি-এ পাশ করেছে, এ কথা ভোলা যায়ও না, সন্ধ্যামণি ভুলতে দেয়ও না। সুতরাং এ বাড়িতে সব কিছু তার হুকুমে চলে; বলা বাহুল্য বাড়িটিও সন্ধ্যামণির বাবার কাছ থেকেই পাওয়া।

কে যেন ফুঁ দিয়ে পাশের বাড়ির বন্ধ ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিল।

তবু নকুড়বাবু রুদ্ধশ্বাসে সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন এবং তার

পুরস্কারও পেলেন। ক্যাঁচ করে পাশের বাড়ির একতলার পেছন দিককার একটা দরজা দিয়ে ছায়ামূর্তি খুব সাবধানে বেরিয়ে এসে, বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল। তারপর বাগানের বুনো-গাছের ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে, মনে হল যেন বাড়ির সামনের দিকে চলে গেল। নিশ্চয়ই কোনো আইনভঙ্গকারী, হয়তো ওর নামে বডি-ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে; প্রকাশ্যভাবে লোকসমাজে বেরুলেই ওকে ধরে নেবে। দেয়াল-আলমারিতে রাখা সারি সারি আইনের গ্রন্থের, পুরোনো কেসের ফাইলের আর রোমাঞ্চ সিরিজের ছাত্রের কাছে এদের সম্বন্ধে কিছু জানতে বাকি নেই। বিশেষ করে রোমাঞ্চ সিরিজের কাছে নকুড়বাবুর ঋণ অপরিশোধ্য, একথা তিনি একশোবার স্বীকার করবেন।

সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনেই জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নকুড়বাবু টেবিলে স্তূপাকার করা দলিলগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। দলিলের নীচে রোমাঞ্চ সিরিজ নিরাপদে অদৃশ্য হয়ে রইল। সন্ধ্যামণি ঘরে ঢুকে খালি তক্তাপোষে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল আর ঘরময় উগ্র জর্দার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। নকুড়বাবু ভয়ে ভয়ে একবার চোখ তুলতেই সে বললে—'অবিনাশবাবুর দোকান থেকে দুটো নতুন ছিপ এসেছিল, ফিরিয়ে দিয়েছি।'

নকুড়বাবু দলিলে মন দিলেন। কপালের দু'পাশের দুটো শিরা প্রকাশ্যভাবে দপদপ করতে লাগল।

সন্ধ্যামণি আবার বললে—'অন্য ছিপটা কার জন্যে?'

নকুড়বাবু মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন, সন্ধ্যামণির কাছে বিষ্টুদার নাম পর্যন্ত করা যায় না। বলতে হল না কিছুই, সন্ধ্যামণি নিজেই আবার বললে—'কার জন্যে তাও আমার জানা আছে। ঐ নিষ্কর্মার ধাড়ি বিষ্টু বাঁড়ুজ্জে ছাড়া আবার কার জন্যে! তাকেও ভাগিয়েছি। কি যেন শনিবারের বিষয় বলতে এসেছিল, দিইছি হাঁকিয়ে! চুল আঁচড়ায় না, দাড়ি কামায় না, কাপড় কাচে না। ছিঃ!'

নকুড়বাবু এমনি চমকে উঠলেন যে, তিনখানি দলিল একসঙ্গে টেবিল থেকে পিছলে নীচে পড়ে যাওয়াতে, হলদে মলাটের ওপর লাল হরফে লেখা 'রক্তের নিশানা'—রোমাঞ্চ সিরিজ খ (১৬) সন্ধ্যামণির চোখের সামনে অবারিত হল।

নকুলবাবু সেটা লক্ষ্য না করেই বললেন—'ইয়ে মানে তাকে কোনো কটু কথা বলনি তো? ওর মনটা বড্ড নরম কিনা'—আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যামণি বাধা দিয়ে বললে—'কটু কথা বলব কেন? তাকে বলে দিয়েছি শনিবার দুপুরে তোমার অন্য কাজ আছে।'

নকুড়বাবু বললেন—'কি কাজ? ছুটির দিনেও মাছ ধরব না তো ধরব কখন?'

'মাছ ধরতে হবে না। আমার বাবার নাম ভেঙে যে করে খাচ্ছ, তিনি কবে মাছ ধরেছেন শুনি? যারা পয়সাকড়ি রোজগার করে, তারা কখনো মাছ ধরে? টাকা ফেললেই তাদের ঘরে পাঁচ-দশ কিলো কাটা পোনা এসে উপস্থিত হয়!'

নকুড়বাবু তবু বললেন—'কিন্তু তাকে যে কথা দিয়েছিলাম—'

কথা বন্ধ হয়ে গেল, হঠাৎ চোখ পড়ল পায়ের কাছে মাটির ওপরে ছোট্ট একটা সোনালি চাবি চকচক করছে। বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল, পা দিয়ে চাবিটাকে চেপে রাখলেন। এদিকে সন্ধ্যামণি বলেই চলছে—'রাখো তোমার কথা, তাকে এমনি কড়া কড়া কথা শুনিয়েছি যে আমি থাকতে আর সে এমুখো হবে বলে মনে হয় না! কাল তমি কোর্ট ছুটির পর আমাকে বোনের বাড়ি নিয়ে যাবে। তার মেয়ে নাকি কোথাকার এক তিনশো টাকা মাইনের ডাক্তারের সঙ্গে নিজের বিয়ে ঠিক করছে, সে-সব বন্ধ করতে হবে।'

সন্ধ্যামণি দুমদুম করে নীচে চলে গেলে, চোখ বন্ধ করে নকুড়বাবু মনে মনে বলতে লাগলেন—'হে ভগবান, ও যদি সত্যিই না থাকত কি ভালোটাই যে হত!' তারপর নিজের চিন্তাতে নিজেই আঁতকে উঠে, জিভ কেটে বললেন—'তাই বলে ও মরে যাক তা বলছি না, ভগবান, তার আবার মেলা ফ্যাসাদ, কিন্তু যদি না-ই জন্মাত, তাহলে আমি, আমি কি সুখীই না হতাম।'

চোখের সামনে ভেসে উঠল বিষ্টুদার ঠাকুর্দার আমলের পুরানো পুকুরের পাড়ে প্রকাণ্ড কাঁঠালগাছের ছায়াতে, ঘাটের ভাঙা সিঁড়ির পাশাপাশি বসে বিষ্টুদা আর উনি। কেউ কোনো কথা বলছেন না, পাশে বিস্কুটের টিনের মধ্যে কেঁচো কিলবিল করছে, পিঁপড়ের ডিম গাদা হয়ে আছে, মুখ বন্ধ কৌটোতে মাছ ধরার মশলা, তার একটুখানি গন্ধও যেন নকুড়বাবুর নাকে এল। নাঃ, এর একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। অস্থির ভাবে পাইচারি করতে করতে আবার জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির বাগানের দিকে চোখ গেল। ছায়ামূর্তিটা এ-গাছের নীচে, সে-গাছের নীচে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা, সন্ধ্যামণি যদি না-ই জন্মাত কি এমন ক্ষতিটা হত—আচ্ছা, সেই অদ্ভুত চাবিটা কোথায় গেল। মাটি থেকে সেটিকে তুলে অন্যমনস্কভাবে নকুড়বাবু পকেটে ভরলেন।

সে শনিবারটা সত্যিই মাঠে মারা গেল। বোনের বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যামণি মহা হৈ চৈ করে এল, তিনশো টাকা মাইনের ডাক্তারকে ডেকে এনে যা-নয়-তাই বলে অপমান করা হল, মিনু কেঁদে কেঁদে সারা। একবার তাকে একটু একা

পেয়েই নকুড়বাবু বলে বসলেন—'ছাখ, ওদের কথা শুনিস নে, এখন চুপ করে থাক, আমি যা হয় একটা ব্যবস্থা করব, দেখিস্।' কি ব্যবস্থা যে করবেন তা অবিশ্যি নিজেই জানেন না।

এই নিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে সন্ধ্যামণির সঙ্গে একটু রাগমাগ হল, অর্থাৎ সন্ধ্যামণি খুব খানিকটা রাগমাগ করল, নকুড়বাবু বোবা হয়ে রইলেন, তার কোনো প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত দিলেন না। পরদিন সকালে সন্ধ্যামণি সুটকেস গুছিয়ে গোঁসা করে মাসির বাড়ি গেল। বাপের বাড়ি যাবার উপায় নেই, কারণ বাপ-মা বহুদিন গত হয়েছেন, ভাজের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায়।

সন্ধ্যামণি বাড়ি ছাড়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে নকুড়বাবু বিষ্টুদার বাড়ি গিয়ে তাঁকে টেনে বের করে এনে নিউ স্পোর্টস থেকে সেই ছিপ দুটি নগদ টাকা দিয়ে উদ্ধার করে কালীকেবিন থেকে ঝুড়ি বোঝাই পরটা, সামিকাবাব, বিরিয়ানি আর মটন-কোর্মা কিনে মুটের মাথায় চাপিয়ে, নিজে প্রকাণ্ড ওয়াটার বটল কাঁধে ঝুলিয়ে, বিষ্টুদার ঠাকুরদার পুকুরের ধারে সারাদিন কাটিয়ে দিলেন। বাড়ির লোকে জানল চুঁচড়োয় বড় মক্কেলের বাড়ি গেছেন। বাড়ির লোক বলতে সন্ধ্যামণির বুড়ি পিসি, তাঁর বিধবা পুত্রবধূ, সন্ধ্যামণির সই আর তার বেকার স্বামী এবং তিনটি বংশধর। নকুড়বাবুর মেয়ের কোন্‌কালে খুব ভালো বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে খড়্গপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। বলা বাহুল্য ঠাকুর, চাকর, ঝি, মেথর এরাও সন্ধ্যামণির স্পাই।

সন্ধ্যাবেলায় জলের বোতল, খাবারের ঝুড়ি ও মাছ ধরার সরঞ্জাম বিষ্টুদার বাড়িতে জমা দিয়ে মনের খুশিতে তিন-তিনটে রোমাঞ্চ সিরিজ কিনে, দোকানদারকে দিয়ে অভ্যাসমতো খবরের কাগজের মলাট লাগিয়ে, নকুড়বাবু বাড়ির পথ ধরলেন। মোড়ের মাথায় পৌঁছে, নিজের আধা-অন্ধকার গলিতে ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় লক্ষ্য করলেন দশ গজ সামনে আপাদমস্তক কালো কাপড়-চোপড় পরা একটা মূর্তি হনহনিয়ে এগিয়ে চলেছে। কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হলেও প্রথমটা হঠাৎ নকুড়বাবু ঠাওর করতে পারেননি লোকটা কে। কিন্তু যেই সে পাশের বাড়ির বিশাল তালা ঝোলানো দশ ফুট উঁচু ফটকের সামনে কৃষ্ণচূড়ো গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, পকেট থেকে লম্বা একটা চাবি বের করে, ফটকের গায়ের ছোট কাটা দরজাটি খুলে ফেলল, তখন আর তাকে চিনতে বাকি রইল না।

তারপরেই যা ঘটল, সে এমনি অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক যে, নকুড়বাবুর

যেন বুদ্ধি লোপ পেল। হঠাৎ ফোঁস করে ফটকের নীচেকার আগাছার মধ্যে থেকে যেই না একটা সাপ ফণা তুলেছে, একরকম নিজেরি অজান্তে নকুড়বাবু তাঁর লোহা বাঁধানো লাঠির এক বাড়িতে তার মাজা ভেঙে দিয়েছেন। লোকটার হাতে একটা ছোট্ট সস্তা দু'সেলের টর্চ, তারি আলোতে দেখা গেল, মরা সাপটার শরীরের পাকে পাকে তখনো যেন ঢেউ খেলছে! দেখে লোকটা শিউরে উঠল।

তার হাতদুটো থরথর করে কাঁপছে, টর্চের আলোটাও লগবগ করছে, অন্ধকারে তার মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, ঠাণ্ডা একটা হাত দিয়ে নকুড়বাবুর হাত চেপে ধরে ভাঙা খনখনে গলায় সে বললে—'আসুন, ভিতরে আসুন, আজ আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।'

এরকম একটা খেমো চেহারার লোকের মুখে এমন শুদ্ধ ভাষা শুনে নকুড়বাবু বেশি অবাক হলেন না, কারণ রোমাঞ্চ সিরিজে এর চেয়েও অনেক বেশি অপ্রত্যাশিত ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে।

আনন্দে, উত্তেজনায় অধীর হয়ে লোকটার পেছন পেছন কাটা দরজা দিয়ে তিনি ভূতের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। সে খুব সাবধানে দরজাটিকে আবার ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল,—'নিজেই চাবিটি করে নিয়েছি। আমার নাম অর্ধেন্দু পাকড়াশী। আসুন আমার সঙ্গে।

[দুই]

কালের কল

আঃ! কি আনন্দ, কতদিনের কৌতূহল এবার চরিতার্থ হতে চলেছে, তিনপুরুষ বাদে আবার এই প্রথম ভূতের বাড়িতে মানুষের পা পড়ল, অবিশ্যি কালো পোশাক পরা লোকটাকে না ধরলে—বাগান তো নয়, সোঁদর বন; এককালে বাড়ির চারদিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো দশ ফুট চওড়া পথ ছিল, এখন তার ফাটলে ফাটলে ঘাস, আগাছা, বাড়ন্ত অশ্বত্থ গাছ। বাড়ির পিছন দিকের দরজাটি নিঃশব্দে খুলে অর্ধেন্দু বলল—'আমার সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা, এমন কি প্রাণটা পর্যন্ত আপনার হাতে তুলে দিলাম; উপকারীকে আমি নমস্য দেবতা মনে করি!' এই বলে হঠাৎ ঢিপ করে নকুড়বাবুর ময়লা পামসুতে কপাল ঠেকিয়ে, দরজা ঠেলে ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভিতরে ঢুকে গেল।

ক্ষীণ টর্চ জ্বেলে সে বললে,—'নির্ভয়ে চলে আসুন, এ সবই আমার বহুকালের জানা, কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।' আসবাবে বোঝাই ধুলোয় ধূসর হলঘরটিকে সাবধানে পেরিয়ে ওর পিছন পিছন নকুড়বাবু শ্বেত-পাথরের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন। সিঁড়ির মাথায় একটা খালি সিগারেটের টিনে মোমবাতি গোঁজা। পকেট থেকে দেশলাই বের করে সেটি জ্বেলে, পথ দেখিয়ে নকুড়বাবুকে একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে, মহা খাতির করে অর্ধেন্দু খালি তক্তাপোষে বসতে দিল। তারপর নিজেও তাঁর পাশে বসে বলল—'আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?'

নকুড়বাবু এমনি আঁৎকে উঠলেন যে, জিভ কামড়ে গেল। একটু সামলে বললেন—'ন্না—মানে, না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করি না।'

লোকটি হাসল, সে যে কি বিশ্রী শুকনো খটখটে হাসি, না শুনলে কল্পনা করা যায় না। নকুড়বাবু জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। লোকটি তাই দেখে নরম গলায় বললে—'না, না, লজ্জা পাবার কিছু নেই; আমি তিনকাল ঘুরে দেখেছি ভূতফুত কিচ্ছু নেই। হ্যাঁ, তবে সেকালের লোক, যাঁরা কোন্‌কালে পঞ্চত্ব পেয়েছেন, তাঁদের যে মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দেখা যায় না, একথা বলছি না।'

নকুড়বাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, থুতনিটা দেড় ইঞ্চি ঝুলে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে লোকটার কাছ থেকে একটু সরে বসতেই, সেও অমনি কাছে ঘেঁষে এসে বলল—'কোনো ভয় নেই, বলেছি তো ভূতফুত কিচ্ছু নেই। ম'ল তো একেবারে পঞ্চত্ব পেল আর তার দেখা দেবার উপায় থাকে না। যা করবার বেঁচে থাকতেই করতে হয়।'

নকুড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'তবে যে এইমাত্র বললেন, পঞ্চত্ব পাওয়াদেরো মাঝে মাঝে দেখা যায়!'

লোকটা উঠে দাঁড়াল—'কি মুস্কিল, জ্যান্ত অবস্থাতেই অনেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভবিষ্যৎ ঘুরে আসতে পারেন তো, তখন ভবিষ্যতের লোকরা তাঁদের দেখতে পেয়ে ভূত ভাববে না তো কি ভাববে? কিন্তু আসলে তাঁদের সময়ে তাঁরা বেঁচেই আছেন—।'

এই অবধি বলে, নকুড়বাবুকে মাথা চুলকোতে দেখে অর্ধেন্দু বিরক্ত হয়ে বলল—'কি? বিশ্বাস হল না বুঝি! দেখুন, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আমার নমস্য দেবতা-স্বরূপ আপনি, কিন্তু বুদ্ধিটা যে খুব প্রখর তা তো মনে হচ্ছে না।—তবে এই দেখুন।'

এই বলে লোকটা তার কালো গলাবন্ধ কোটের আস্তিন একটু গুটিয়ে নিল। নকুড়বাবু দেখলেন তার কব্জিতে একটা অদ্ভুত হাতঘড়ি, একগোছা সরু সরু তারের ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা। অবাক হয়ে বললেন—'কি এটা?'

'দেখুন না, অত ভয় কিসের, খুলে ভালো করেই দেখুন না। অদ্ভুত বটে ঘড়িটা, মুখটা অনেকটা টেলিফোনের ডায়ালের মতো, ঐ রকম ০ থেকে ৯ সংখ্যা গোল করে সাজানো, ঐ রকম একটা কাঁটালাগানো ডায়ালটাকে ঐ রকম করেই ঘোরানোও যায়।

অর্ধেন্দুর দিকে নকুড়বাবু এবার ভালো করে তাকালেন। ভারী নিরীহ চেহারা, সামনে পিছনে সমান ছোট করে কাঁচা-পাকা চুল ছাঁটা, মুখময় সাতদিনের কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ি, কানটা একটু লম্বা, লতিটা গালের সঙ্গে জোড়া। সেদিকে চোখ পড়তেই লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে—'আমাদের বংশের সব ছেলে-মেয়েদেরই এই রকম কানের লতি জোড়া আর পায়ের আঙুলের ফাঁকে হাঁসের পায়ের মতো পাতলা চামড়া লাগানো।' এই বলে, বকলস্ লাগানো ময়লা জুতোর মধ্যে থেকে একটা পা বের করে, আঙুল ফাঁক করে দেখাল।

নকুড়বাবু ঘড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ডায়ালের ধার দিয়ে বারো মাসের নাম আর ১ থেকে ৩১ সংখ্যাও লেখা রয়েছে লক্ষ্য করলেন। অর্ধেন্দু পাকড়াশী বললে—'নিশ্চয় এতক্ষণে টের পেয়েছেন যে, আমি একজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক? এইচ্-জি ওয়েল্সের টাইম মেশিন নিয়ে আপনারা এত নাচলেন, ছবি করলেন, অথচ সেটা একটা বেধড়কা বড়, অতি আনাড়ি ব্যাপার; কোথাও নিয়ে গেলে, নিরাপদ জায়গায় রাখাই এক মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, অমনি ভিড় দাঁড়িয়ে যায়, প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ঘেমে নেয়ে উঠতে হয়। জটিল সব যন্ত্রপাতির একটা কলকব্জা বিগড়োলেই তো হয়ে গেল, থাকুন পড়ে পঞ্চাশ শো সালে! এই অনেকটা আমার যেমন হয়েছে, যদিও এ ঘড়িটার ব্যাপার অনেক সাদাসিধা। দুঃখের বিষয় চাবিটা কোথায় পড়ে গেছে।'

নিশ্বাস বন্ধ করে নকুড়বাবু ওর কথা শুনছিলেন, দারুণ উত্তেজনায় ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস পড়ছিল। চাপা গলায় বললেন—'চাবির ব্যবস্থা হলে তবে কি এই ঘড়িটার সাহায্যে অতীতে কিম্বা ভবিষ্যতে যেখানে খুশি যাওয়া যাবে?'

অর্ধেন্দু বিরক্ত হয়ে উঠল—'যেখানে খুশি আবার কি? এটা কি একটা বাইসিক্‌ল যে যেখানে খুশি যাবেন। যখন খুশি বলুন। ঐ ১ থেকে ৯ অবধি যতগুলি সংখ্যা আছে আর তার সঙ্গে ০ জুড়লে, কোন রাশিটা না হয় বলুন।

অর্থাৎ কোন্ সময়ে না যাওয়া যায় বলুন ? দেখতে পারেন বৃত্তের ধারে এ-ডি ও বি-সি দুই-ই চিহ্ন করা আছে, ঐ ছোট্ট কাঁটাটা যেখানে দরকার সরিয়ে নেবেন, তারপর ব্যস, মাস তারিখ ঠিক করে নিয়ে, টেলিফোনের মতো ডায়াল ঘোরাবেন ! —এখন ঐ চাবিটা নিয়েই যত ভাবনা। ওটি দিয়ে দম না দিলে, কালের কল এক সেকেণ্ডও চলবে না।'

নকুড়বাবুর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল, কাষ্ঠ হেসে বললেন—'চাবিটা যদি খুঁজে দিই, আমাকে ঘড়িটা একবার একটু পরতে দেবেন ?' তিনহাত লাফিয়ে উঠল অর্ধেন্দু।—'না, না, না, সে কাজ নেই, শেষটা কি হতে কি হয় যাবে। আপনি বরং এবার বাড়ি যান, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ঘড়ির কথা ভুলে যান।'

নকুড়বাবু তখুনি উঠে পড়ে বললেন—'থাক তবে চাবিটা।'

অর্ধেন্দুর চেহারাই বদলে গেল, একগাল হেসে নকুড়বাবুর হাত চেপে ধরে বলল—'না, না, তাই বললাম কি ? মিছিমিছি বিরক্ত হচ্ছেন। এর অনেক বিপদ, অনেক ঝামেলা, তার থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যেই—শেষটা না জেনে-শুনে'—

নকুড়বাবু বাধা দিয়ে বললেন—'না জেনে-শুনে আবার কি ? জানেন আমি ল' পরীক্ষায় জলপানি পেয়েছিলাম—না জেনে-শুনে কেউ পায়। তারপর সাড়ে তিন শোর বেশি রোমাঞ্চ সিরিজ পড়েছি।'

অর্ধেন্দু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—'চাবিটার জন্যে আমি সব দিতে পারি। এই দেখুন আরেকটা ঘড়ির সব তৈরি, কিন্তু ঐ চাবিটার ছাপ না পেলে আরেকটা চাবি হবে না। এই বলে গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে একমুঠো ছোট্ট ছোট্ট কলকব্জা স্ফটিকের টুকরো ইত্যাদি বের করে দেখাল। তারপর আবার বলল—'সব দিতে পারি, বুঝলেন, আমার যা আছে সব। কই চাবিটা ?'

নকুড়বাবু পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করলেন। তার সবচেয়ে ছোট খাপ থেকে চাবিটাকে বের করে অর্ধেন্দুর হাতে দিয়ে বললেন—'নিন্ আপনার চাবি, বড় পয়মন্ত জিনিস। পেতে না পেতে যে সুযোগ কেউ পায় না, তাও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে। এবার বলুন কবে ঘড়ি পরতে দেবেন ? কাল রাতের মধ্যে না হলেই নয়, তারপর আর আমার সে রকম সুবিধা হবে না বোধহয়।'

অর্ধেন্দু অন্যমনস্কভাবে বলল—'বেশ তাই দেব। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনাকে অদেয় আমার কিছু নেই।'

নকুড়বাবু উঠে বললেন—'তাছাড়া চাবিও খুঁজে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, কোথায় পেলেন ওটাকে?'

'পাশের বাড়ির তিনতলায়, আমার পড়ার ঘরে। এইটাই আমার আশ্চর্য লাগছে।'

'আশ্চর্যের কিছুই নেই। কালান্তরে যেতে গেলে ছোট্ট একটা জিনিস একটু ইদিক-উদিক ছিটকে খুবই পড়তে পারে। সে যাক গে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। আমি আজ রাত্রেই নতুন চাবিটা করে ফেলব, কালকেই ঘড়ি পরতে পারবেন। আচ্ছা, নমস্কার। আমার টর্চটা দিয়ে পথ দেখে যাবেন, কাল ফিরিয়ে দিলেই হবে। অনেক কষ্টে এটি যোগাড় করতে হয়েছে।'

অর্ধেন্দু পাকড়াশী যেন তাঁকে বিদেয় করতে পারলেই বাঁচে। নকুড়বাবু সহজে নড়েন না, এতকাল বাদে অন্ধকারের মধ্যে একটু ক্ষীণ আশার আলো দেখছেন, অমনি অমনি চলে গেলেই হল কি না!

অর্ধেন্দু উঠে দরজার দিকে এগিয়ে বলল—'কই, উঠুন।'

নকুড়বাবু বললেন—'মানে ইয়ে ঘড়ির সাহায্যে যে কোনো কালে গিয়ে কি ছায়ার মতো শুধু দেখা দেব, নাকি কথা বলতে, কাজ করতে পারব?'

অর্ধেন্দু হাসল—'বিলক্ষণ পারবেন। কেন পারবেন না, সুস্থ জ্যান্ত মানুষ তো আপনি। খুব আদিম কালে না গেলে ভাষা-টাষারো কোনো অসুবিধা হবে না, তবে একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন, টাইম মেশিনে অন্য কালেই শুধু যাওয়া যায়, অন্য জায়গায় না। যেখানে দাঁড়িয়ে কল ঘোরাবেন, ঠিক সেখানেই থেকে যাবেন, খালি সময়টা পাল্টে যাবে। যদি অন্য জায়গায় যেতে চান, সেকালের যানবাহনের ওপর নির্ভর না করে, ট্রেনে কিম্বা মটরে কিম্বা উড়োজাহাজে সেখানে গিয়ে তবে ডায়াল করাই ভালো।'

নকুড়বাবু অধৈর্য হয়ে বললেন—'না, না, অন্য কোথাও আমি যেতে চাই নে, এতেই আমার হবে।'

অর্ধেন্দু একটু হাসল। 'এখানেও যে বড্ড নিরাপদ, তা ভাববেন না। বাপ্, একদিন অন্যমনস্ক হয়ে বড্ড বেশি আগে চলে গেছলাম, তারপর এক অতিকায় শুঁয়োপোকার তাড়া খেয়ে পালিয়ে পথ পাই নে। এ জায়গাটাও সেকালে খুব নির্ভয় ছিল না।'

নকুড়বাবু শুধু বললেন—'অত আগে যাব না।'

বাড়ি ফেরার পথে কথাটা ভেবে হাসি পেল। অত আগে যাবার দরকারটা

কি? সন্ধ্যামণি যাতে না জন্মায় তার ব্যবস্থা করলেই তো হল। তার বাবা-মার বিয়েটি ঘটতে না দিলেই তো কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে থাকে, বড্ড কানের কাছ ঘেঁষে যাওয়া হচ্ছে নাকি? তা ছাড়া ওঁদের বিয়ে হয়েছিল বোম্বাই শহরে, সেখানে এখন যাবার কোনো সুবিধেই হবে না। অবিশ্যি সন্ধ্যামণির দিদিমার বিয়েতে বাগড়া দিলেও চলে; কিন্তু তাঁদের বিয়ে হয়েছিল নাকি গুরুদেবের আশ্রমে, লছমন ঝোলায়। তার চেয়ে সন্ধ্যামণির মায়ের দিদিমার বিয়েটি পণ্ড করে দিলেই তো ঢের ভাল হয়; কোথাও যেতেও হবে না, ঐ পাশের বাড়িতেই বিয়ে হয়েছিল, কোনো অসুবিধে নেই। তা ছাড়া এতে আরো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, একগাদা হোপলেস্ ইডিয়ট আর স্কাউণ্ড্রেল তা হলে জন্মায় না।

এতকাল ধরে এত কেস্ দেখলেন, শুনলেন, পড়লেন, ঘাঁটলেন নকুড়বাবু আর এই সামান্য কাজটুকু পারবেন না? কেন, গত বছর দু'হাজার টাকা কি নিয়ে, চোখের সামনে অভয় ঘোষ শ্রীরামপুরের অতকালের ঐ পুরোনো বিয়েটা পর্যন্ত ভেঙে দিতে পারল, তার তুলনায় এটা আর এমন কি! কোনো অসুবিধেই নেই। ওঁদের বংশপরিচয় আছে সন্ধ্যামণির দেরাজে, তাতে বুড়োবুড়ির বিয়ের সন তারিখ দেওয়া আছে। রাতে শুয়ে শুয়ে প্ল্যানটাকে আরো পাকিয়ে নেওয়া গেল। একটা বিয়ে ভাঙা কিছু শক্ত কাজ নয়। কেন, ছোটকাকার বিয়ে তো একটা বেড়াল না, কুকুর না কিসে যেন ভেঙে দিয়েছিল। সঠিক জানেন না নকুড়বাবু, কিন্তু জানোয়ারটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বরকর্তাকে তাড়িয়ে স্টেশন পার করে দিয়েছিল। সুযোগ বুঝে বরও চোঁ-চাঁ দৌড়, একেবারে বিলেত পর্যন্ত। মেয়ের বিয়ে হল পাড়ার কোনো ছেলের সঙ্গে। নিন্দুকরা অবিশ্যি বললেন যে, সমস্ত ব্যাপারটাই ঐ ছেলেরই সাজানো। সে যাই হোক গে, বিয়ে ঠিক করার চেয়ে যে বিয়ে ভাঙা অনেক সহজ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বিশেষ করে সেকালের বিয়ে। মেয়ে সম্পর্কে বরপক্ষের কানে মনগড়া একটা কানাঘুষো তুলে দিলেই হল, শুধু ঐ মেয়ে কেন, ওর বোনদের বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত দায় হয়ে উঠবে। কিন্তু মেয়েদের অনিষ্ট নকুড়বাবুর দ্বারা হবে না, ওঁর বিবেকে বাধে। হ্যাঁ, তবে সন্ধ্যামণিকে নাই করে দেওয়াটা তো আর ওর অনিষ্ট করা নয়, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বরং ওর উপকারই করা। কারণ উদয়াস্ত সন্ধ্যামণি বলে যে, নকুড়বাবুর সঙ্গে বিয়ে হওয়াতেই নাকি তার কাল হয়েছে; সে যদি না-ই জন্মায়, তা হলে তো আর নকুড়বাবুর স্ত্রী হয়ে তাকে কষ্ট পেতে

হবে না। অবিশ্যি তাই বলে নকুড়বাবুকেও কিছু আইবুড়ো থাকতে হবে না, ছেলেমেয়ের সম্ভবত আরো ঢের ভালো মা হবে, অন্তত এর চাইতে মন্দ তো আর হবে না, কারণ সেটা অসম্ভব। তা হলে সন্ধ্যামণির জায়গায় যে নকুড়-বাবুর স্ত্রী হবে সে কেমনটি হবে? এই ভেবে নকুড়বাবু ভারি বিস্ময়বোধ করতে লাগলেন যে, যার সঙ্গে কুড়ি বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে, সে কেমন মেয়ে তাই জানেন না। —সে যাই হক গে, সন্ধ্যামণির মায়ের দিদিমার বিয়ের বরটিকে যে কোনো উপায়ে ভাগাতে হবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নকুড়বাবু ভাবলেন, ব্যাপারটাতে যে খুবই রোমাঞ্চ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; তাছাড়া কি এমন ক্ষতিটা হতে পারে? একটা হাতঘড়ির মতো ছোট কালের কল দিয়ে, বিশেষ করে যেটা চাবি দিয়ে চলে, এরকম একটা সেকেলে কল তাই দিয়ে যে ইতিহাসের ধারা বদলে দেওয়া যেতে পারে এটা নকুড়বাবুর আদৌ বিশ্বাস হয় না। তাই যদি হত, তা হলে অর্ধেন্দু ব্যাটা আর ঝোপে ঝাড়ে হারানো চাবি খুঁজে বেড়াত না. নির্ঘাৎ ঐ সব পুরানো তালি দেওয়া কোট আর আঁটো পেণ্টেলুন ছেড়ে একটা বাদশা-ফাদশা হয়ে, হীরেমাণিক বসানো জাব্বাজোব্বা পরে সোনার মসনদে বসত। এই অবধি ভেবে হঠাৎ নকুড়বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

॥ তিন ॥

ঘুম থেকে যখন উঠলেন নকুড়বাবু অবাক হয়ে দেখলেন, ঘুমের মধ্যেই প্ল্যান্ অফ অ্যাকসনটি কেমন মগজের ভেতর তৈরি হয়ে গেছে। একটা নয়, একেবারে দু-দুটো প্ল্যান, তবে প্রথমটাকে তক্ষুনি সেকালে অচল বলে বাতিল করে দিতে হল। হালে টোগো বাঁড়ুজ্জে মনীষাদেবীর সঙ্গে কানাই চৌধুরীর বিয়ে ভেঙে দিয়ে নিজে তাকে বিয়ে করেছিল, খুব সহজ উপায়ে। বিয়ের দিন সকালে মেয়ের বাপের কানে তুলে দিল যে, ছেলে বিবাহিত, এমন কি নিজের ছোট বোনকে ছেলের আগেকার স্ত্রী সাজিয়ে মনীষাদের বাড়ি পাঠাতে পর্যন্ত পেছপাও হল না। কিন্তু সেকালে এই সামান্য কারণে বিয়ে ভাঙত না। কাজে কাজেই দ্বিতীয় প্ল্যানটাকে কাজে লাগাতে হবে। তাতেও মেয়ের নাম জড়িত থাকলেও

তার যে কোনো অনিষ্ট হয় নি, পরবর্তীকালের ঘটনা-প্রবাহ থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

কি করে যে সারা দিনটা কাটল, সে কথা নকুড়বাবু আজও ভেবে পান নি। সোমবার অবিশ্যি এমনি কাজের চাপ থাকে যে, সময় কাটল কি কাটল না, এ বিষয়ে চিন্তা করবারও সময় থাকে না। নকুড়বাবুর সময়কে একটি অদৃশ্য শত্রু বলে মনে হচ্ছে না; বরং সিনেমার ফিল্মের মতো লাগছে, যাকে ইচ্ছেমতো এক রিল থেকে আরেক রিলে গুটোনো যায়। তফাৎ শুধু এই যে, ফিল্মের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

সে যাই হক, এক সময় সত্যি করে সন্ধে হল, নকুড়বাবু নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে পাশের বাড়ির দোতলার সেই ঘরখানিতে অর্ধেন্দুর কাছে উপস্থিত হলেন। অর্ধেন্দু কিন্তু ভারি নার্ভাস।—'দিচ্ছি তো ঘড়িটা আপনাকে বিশ্বাস করে। শেষটা একটা যাচ্ছে তাই ফ্যাসাদ পাকাবেন না তো? আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন সেইজন্যে আমি এবং আমার চৌদ্দপুরুষ আপনার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব সেই কি যথেষ্ট হত না?'

নকুড়বাবু কর্কশ গলায় বললেন—'না, হত না। কথার খেলাপ করতে চান নাকি অর্ধেন্দুবাবু।'

অর্ধেন্দু বললে—'আমার আসল নাম অর্ধেন্দু নয়। এই ধরুন ঘড়ি। আমার সততা সম্পর্কে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবে এ আমার অসহ্য। তবু আপনার ভালোর জন্যেই জিজ্ঞাসা করি, কোন সালে যেতে চান? তার জন্যে ভালোভাবে প্রস্তুত হয়েছেন কি? শেষটা যদি বিপদে পড়েন নিজেকে অপরাধী মনে করব যে, আপনি হলেন প্রাণদাতা!'

কম্পিত হস্তে বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে নকুড়বাবু বললেন—'আমার পরিকল্পনা তৈরি আছে, আমার জন্যে অত ভাবতে হবে না। তাছাড়া বেশি আগেও যাব না, মাত্র একশো বছর আগে, ১৮৬৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি হলেই আমার চলবে। ঐ তারিখে এই বাড়ির একটা বিয়ে পণ্ড করতে হবে। ব্যস্ আর কিছু নয়!'

অর্ধেন্দু, অর্থাৎ যে নিজেকে অর্ধেন্দু বলে চালাচ্ছিল, সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, দাঁতকপাটি লাগতে সুরু করল, নকুড়বাবু ডায়াল করতে যাবেন, তাঁর হাত সে চেপে ধরল। নকুড়বাবু এক ঝাঁকানি দিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলে বললেন—'সরে দাঁড়ান। আপনার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল

ভোগ করবার আমার ন্যায্য অধিকার নেই বলতে চান? চাবি খুঁজে দিই নি?'

অর্ধেন্দু মরীয়া হয়ে বললে—'আছে, আছে, দিয়েছেন, কিন্তু ওসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলেই কি ভালো হত না, তাছাড়া একটু ব্যবস্থা করে না গেলে যে আপনি সেকালে পৌঁছুবেন একেবারে কাপড় চোপড় ছাড়া হয়ে।'

শুনে নকুড়বাবু থ'! তা হলে? তা হলে কি হবে!'

অর্ধেন্দু আবার সেই শুকনো খটখটে হাসি হাসল।—'আমি বৈজ্ঞানিক, সে ব্যবস্থা কি আর করি নি? কেন আমার গায়ে কি কাপড়-চোপড় নেই বলতে চান?' এই বলে পকেট থেকে দুটি চুলের মত সরু পিন বের করে নকুড়বাবুর জুতোর নীচে আটকে দিল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'যান এবার। কি আছে কপালে কে জানে, দুগগা, দুগগা, মধুসূদন—' তার কথার সঙ্গে সঙ্গে নকুড়বাবু ডায়াল ঘোরাচ্ছেন, আগে মাস, তারিখ, ঠিক করে তবে সাল ঠিক করলেন। ডায়াল ঘোরাচ্ছেন আর অর্ধেন্দুর কথাগুলো যেন ক্রমে কিরকম অস্পষ্ট হয়ে আসছে, ঘরের মোমবাতি থেকেও যেন বড় বেশি ধোঁয়া বেরুচ্ছে। শেষ একবার মনে হল যেন অর্ধেন্দু ওঁর জুতো পরা পায়ে মাথা ঠেকাচ্ছে, তারপর চট্ করে একটু চোখে অন্ধকার দেখলেন, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, সেবার পচা চিংড়ি খেয়ে ঠিক যেমন হয়েছিল, কান বোঁ বোঁ করতে লাগল, হাতে-পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরল।

এক মুহূর্তেই আবার নিজেকে সামলেও নিলেন, দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল, হাত-পা স্থির হল, খালি কান বোঁ-বোঁর বদলে কোথায় যেন শানাই বাজতে লাগল। ঘরের কোণে যে মোমবাতির জায়গায় কারবাইড গ্যাস জ্বলছে, সেটা প্রথমে খেয়াল হয় নি। গা হাত পা ঝেড়েঝুড়ে দেখে নিলেন; নাঃ, সব ঠিকই আছে, হাতে ঘড়ি, জুতোর নীচে কাঁটা—'কি হচ্ছেটা কি? তুই কে রে অলপ্পেয়ে? মিষ্টির ঘরে কেন সেঁদিয়েছিস্? মৎলবটা কি তোর?' কানের কাছে কর্কশ গলার স্বর শুনে এমনি চমকে উঠলেন নকুড়বাবু যে, প্রথমটা মুখ দিয়ে কথাই সরল না। তাছাড়া এরকম বিরাট সাইজের মহিলাও তিনি কখনো দেখেন নি। পরনে একখানা চওড়া লালপাড় গরদ, ব্যস, স্রেফ আর কিছু নয়। কিন্তু গলার বিছে, কোমরের চন্দ্রহার, হাতের অনন্ত, তাগা, চুড়ি, বালা নিয়ে সের দুইয়ের কম হবে না।

মাথার কাপড় খসে গেছে, গায়েও খুব বেশি নেই, চওড়া সিঁথিতে মোটা

সিঁদুরের দাগ, কপালে এই বড় সিঁদুরের ফোঁটা, মুখে পান, পায়ে আলতা বয়স বছর পঞ্চান্ন।

হাঁ করে নকুড়বাবু তাকিয়ে রইলেন, কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না। কিন্তু ভদ্রমহিলা ছাড়বার পাত্রী নন, মহা হাঁক-ডাক জুড়ে দিলেন—'কে তুই? কি চাস কি? আমি বলে খেয়ে না খেয়ে দিনভর মিষ্টির ঘরের দোর আগলাচ্ছি; মতিরাণী এসে বললে কিনা জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুর এসেছে, তাই একটু দেখতে গেছি আর অমনি কিনা ঘরে চোর ঢুকেছে? কি নাম তোর?'

ততক্ষণে ভদ্রমহিলার চ্যাঁচামেচিতে সোনার তাগা পরা, গেঞ্জি আর ফিনফিনে ধুতি পরা, টেড়ি কাটা, আতর মাখা দু'তিনজন ফুলবাবু এসে জুটেছেন। সব চাইতে পেছনের বাবুটি আবার কাকে যেন চাপা গলায় বললেন—'এই আমার গুপ্তিটা কোথায় ছাখ দিকিনি।'

বেগতিক দেখে নকুড়বাবু আমতা আমতা করে বললেন—'ইয়ে—দেখুন, আমার নাম নকুড়চন্দ্র ঢোল—আমি চোর নই, কিছু একটা ভুল—'

'কি নাম বললেন—ঢোল? ছি, ছি, ছি, বড়বৌদি কাকে কি বলছ? উনি তা হলে বরের মামাবাড়ির কেউ হবেন। দেখুন জোড়-হাতে মাপ চাইছি আমাদের শত অপরাধ হয়ে গেছে, মেয়েদের যদি কোনো বুদ্ধি থাকে, কিছু মনে করবেন না'—দেখতে দেখতে হাওয়া বদলে গেল; নকুড়বাবুর আদর-যত্নের তখন আর শেষ নেই। কোথা থেকে স্নানের জল, শান্তিপুরের ধুতি আদ্দির পিরাণ, কোঁচানো উড়নি সব এসে গেল, নকুড়বাবু টেরই পেলেন না। একটা রোগা অতিচালাক চাকর আবার কানের পেছনে আতরের পুঁটলি গুঁজে দিয়ে গেল।

এই রকম ঘটা করে তা হলে সন্ধ্যামণির মায়ের দিদিমার বিয়ে হয়েছিল। 'শানাই, মিলিটারি ব্যাণ্ড, বাঈ নাচ, যাত্রা, সখের থিয়েটার, কিচ্ছু বাদ নেই।'

নকুড়বাবুর জুতো পালিশ করতে করতে চাকরটা বলে যেতে লাগল—'এ জুতোটা ফেলে দিন বাবু, এই কি বিয়েবাড়ির জুতো? নতুন একজোড়া নিয়ে আসি ঠিক এই মাপে।'

আ, সর্বনাশ, জুতো ছাড়বেন কি, জুতোর তলাকার কাঁটাটি খুলে পড়ে গেলেই তো হয়ে গেল, বাড়ি ফিরতে হবে উদোম গায়ে। হাতঘড়িটাও এদের কাছ থেকে অনেক কষ্টে ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়েছে। জুতো ছাড়াতে না পেরে ক্ষুণ্ণমনে চাকরটা শেষ পর্যন্ত নকুড়বাবুকে ছেড়ে দিল।

দোরগোড়ায় হাত জোড় করে যে ফর্সা ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই কনের বাবা। এই হেনস্তার কথা যেন বরকর্তার কানে না ওঠে, এই তাঁর মিনতি।

নকুড়বাবু হেসে ফেললেন,—'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, এ আবার একটা কথা হল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে কেউ বিন্দুবিসর্গও জানতে পারবে না।'

পাশের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখেন যেখানে তাঁদের তিনতলা বাড়ি এখন শোভা পায়, সেখানে ঘোড়ার গাড়ির ভিড়! বরযাত্রীরা সভায় বসেছে, গানবাজনা হচ্ছে, বিয়ের লগ্নের একটু দেরী আছে। নকুড়বাবু উসখুস করছেন, বুঝতে পারছেন বড্ড কাঁচা কাজ করেছেন, অন্তত একটা দিন হাতে রাখা উচিত ছিল, একেবারে লগ্ন এসে গেল বলে, এখন কি করতে যে কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। কন্যাকর্তা তাঁকে নিয়ে বরের কাকা বরকর্তার পাশে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, নকুড়বাবু বুঝি কন্যাপক্ষেরই কোনো শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয়, সুবিধা শুধু এই যে তাঁর কানটি পাওয়া যেতে পারত।

বাঘের মতো চেহারা ভদ্রলোকের, ঝুলো গোঁফ, বাবরি চুল, ঘোর কালো রং, গায়ে অসুরের বল আর এই বড় বড় লোমওয়ালা কান। নকুড়বাবু একটু দমে গেলেও, বুঝলেন শেষ মুহূর্তে ভড়কে গিয়ে পিছপাও হলে, এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তবে বরের বাপের কাছে এগুনো তাঁর কর্ম নয়, বরং বরের কাছে গেলে কিছু হতে পারে মনে হল। একজন পাকা এটর্নির পক্ষে সাক্ষী ভাঙানো খুব শক্ত কাজ নয়। গুটি গুটি গেলেন তার পাশে।

দেখলে মায়া হয়। বয়স বছর কুড়ির বেশি নয়, রোগা, কাকা যেমনি কালো—এ তেমনি ফর্সা, কপালের ওপর গোছা গোছা কোঁকড়া চুল, পরনে জরির বর্ডার দেওয়া পাঞ্জাবী, তার এক পাশে চুণী বসানো বোতাম, গলায় সোনার হার, নকুড়বাবুকে হঠাৎ এত কাছে এসে বসতে দেখে একটু ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। এর ওপর রোমাঞ্চ সিরিজের পুরোনো একটা পাঠ লাগাতে নকুড়বাবুর একটু লজ্জাও করছিল, কিন্তু প্রেমের কিম্বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে ওসব বালাই থাকতে নেই, তাই ওর শাঁখের মতো কানের কাছে মুখ নিয়ে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে, চাপাগলায় বললেন, কেটে পড় এখান থেকে যদি ভালো চাও, এ বিয়ে করতে হবে না।'

ছেলেটা যেন কাঠ হয়ে গেল। নকুড়বাবু আরো বললেন, 'চ্যাঁচামেচি করেছ কি মরা মানুষ হয়ে গেছ'—ঠিক এই কথাই রোমাঞ্চ সিরিজের ক (৫৫) কিম্বা (৫৬)-এর নায়ক বলেছিল। নকুড়বাবু বললেন, 'আস্তে আস্তে হাওয়া হয়ে যাও,

সাতদিনের মধ্যে যদি এমুখো হও তো আর দেখতে হবে না। এ মেয়ে তোমার জন্যে নয়। যাও, কর্পূর হও। নইলে তোমাকে আশী বছর জেল খাটানো আমার পক্ষে কিছু নয়।'

ফলটাও ঠিক রোমাঞ্চ সিরিজের মতোই হল; বাস্তবিক খাসা লেখে ওরা, তা সে ইংরিজী থেকে চুরিই হক আর যাই হক। ছেলেটা আস্তে আস্তে, কখন যে খসে পড়ল, শুধু অন্য লোকে কেন, স্বয়ং নকুড়বাবুও টের পেলেন না। একটু নার্ভাস লাগছিল বটে, কোনমতে লগ্নটা পার করতে পারলে আর কোনো ভাবনা থাকে না। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোমানুষ সেজে এইখানে বসে থাকা। অবিশ্যি মেয়েটার জন্যে একটা পাত্র ঠিক করে দিতে হবে, সে বেচারাকে তো শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। পাত্র কোথায় পাওয়া যায়?

ভিড়ের মধ্যে নকুড়বাবু পাত্র খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, ঐ থামটার পাশে কৌচে বসে, ও-লোকটাকে অর্ধেন্দুর মতো লাগছে না? তাই তো, অর্ধেন্দুই তো বটে, দিব্যি ধুতি-পাঞ্জাবী পরে সেজেগুজে এসেছে, কি মতলব ওর? শেষ মুহূর্তে সব পণ্ড করে দেবে না তো? বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করতে আসে নি তো অর্ধেন্দু? ওর কাছে নিজের উদ্দেশ্যটা ভেঙে বলা বোধ হয় ভুল হয়েছে। যা মনে করেছিলেন ঠিক তাই। অর্ধেন্দু হঠাৎ কৌচ ছেড়ে উঠে গিয়ে কন্যাকর্তার কানে কানে কি যেন বলল। অমনি বর কই? বর কোথায় গেল? খোঁজ খোজ রব উঠল। ততক্ষণে লগ্নও এসে গেছে। দেখতে দেখতে চারদিকে হুলস্থুল কাণ্ড সুরু হয়ে গেল।

দশ মিনিট বাদে কন্যাকর্তা পাইক এনে নকুড়বাবুকে ঘেরাও করে ফেললেন। সব বুঝেছি, ভালো করে বললাম, তবু কানে তুললেন না। এইভাবে অপমানের শোধ তুললেন? আচ্ছা, আমিও কম যাই না। এ বিয়ে আজ এই লগ্নে আমি দেবই এবং আপনি যেমন পাত্র ভাগিয়েছেন, আপনাকেই তার জায়গা নিতে হবে।' পাইকরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল।

মরিয়া হয়ে নকুড়বাবু চারদিকে তাকালেন; কি সাংঘাতিক, নিজের শাশুড়ীর দিদিমার সঙ্গে বিয়ে! বরফের মতো ঠাণ্ডা ঘামে সারা গা নেয়ে উঠল। এমন ফ্যাসাদে কেউ পড়েছে কখনো? হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে অর্ধেন্দুকে দেখা গেল। ততক্ষণে বরপক্ষীয়েরা থানায় খবর দেবে বলে শাসাতে শাসাতে সভা ছেড়ে গেছে। অর্ধেন্দুর মুখে সে যে কি বিশ্রী হাসি। নকুড়বাবুর বিপদ দেখে তার মজা লাগছে!

নকুড়বাবুর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, চিৎকার করে বললেন—ঐ, ঐ, ঐযে ঐ বর, ঐ দেখুন ছদ্মবেশে এসেছে।

এক মুহূর্তের জন্য চোখ ফিরিয়ে সকলে অবাক হয়ে সেইদিকে যেই তাকিয়েছে, অমনি নকুড়বাবুও ১৯৬৪ সালের ডায়াল ঘুরিয়েছেন। চাবি দিয়ে মাস তারিখ আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, শুধু সালটি বাকি ছিল। ঐ এক মুহূর্তের জন্যে মনে হ'ল অর্ধেন্দু সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকাল, তার পরেই সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেল, কান বোঁ-বোঁ করতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল, পায়ের নীচে মাটি সরতে লাগল, বিয়েবাড়ির কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ শোনাতে লাগল, কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা মনে হল যে, অর্ধেন্দুর মুখের ভাবটা পাল্টে গিয়ে গাল দুটি হাসিতে ভরে গেছে। তারপরেই চমকে উঠলেন নকুড়বাবু, এ কি, হুড়মুড় করে এ যে কোথাকার কোন এঁদো পুকুরে পড়েছেন, এখন প্রাণটা বুঝি যায়!

বেশি দূরে নয়, পাশের বাড়ির বন-জঙ্গলে ঢাকা ঘাট-বাঁধানো পুকুরেই পড়েছিলেন। এ পুকুরটি তাহলে আগে ছিল না; এই জায়গাতেই তো মস্ত চাঁদোয়া খাটিয়ে বিয়ের সভা বসেছিল। কি আশ্চর্য, একশো বছর আগেকার সেই সভা নকুড়বাবু এই মুহূর্তেই ছেড়ে এসেছেন। বাঁ-হাতের কব্জির দিকে চোখ পড়ল, কি সর্বনাশ, ঘড়িটা কোথায় খুলে পড়ে গেছে, শুধু খানিকটা ছেঁড়া তার জড়ানো হাতে!···যাক গে, তাই দিয়ে আর কি হবে, কার্যসিদ্ধি তো হয়েই গেছে। তারগুলোকে খুলে পুকুরে ফেলে দিতে গিয়ে নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। আঁতকে উঠলেন নকুড়বাবু। কি ভয়ঙ্কর, তাঁর যে পরনে কিছু নেই! এতক্ষণ পরে মনে পড়ল—বিয়ের সভায় পিন-আঁটা জুতোজোড়া খুলে রেখে, ফরাসে বসে মখমলের তাকিয়ে ঠেস দিয়ে আরাম করছিলেন!

একটু হাসলেন নকুড়বাবু, রোমাঞ্চ সিরিজের নায়করা এত অল্পে কখনো ভড়কায় না; তাঁরও আজ রাতের অভিজ্ঞতা তাদের অভিজ্ঞতার চাইতে কম নয়। তা ছাড়া এখন শেষরাত, দর্শক কেউ কোথাও নেই! নিঃশব্দে বুগানভিলিয়া লতাগাছ বেয়ে নকুড়বাবু তিনতলার ছোট ছাদে গিয়ে উঠলেন! তারপর দরজার ভাঙা কাচের মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে, ছিটকিনি নামিয়ে, ঘরে ঢোকা কিছুই শক্ত নয়। বলাবাহুল্য, এ পথে যাওয়া-আসা করা এই তাঁর প্রথম নয়। বিষ্টুদাই প্রথম বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে, তিনতলার ঘরের ভিতর থেকে ছিটকিনি এঁটে, এই-ভাবে যাওয়া-আসা করলে কাকপক্ষীও টের পায় না।

পাশেই স্নানের ঘরে গিয়ে খুব খানিকটা গায়ে মাথায় জল ঢেলে, শুকনো

তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, ফর্সা কাপড় পরে নকুড়বাবু যখন শয্যাগ্রহণ করলেন, কালান্তরে যাত্রার সমস্ত গ্লানি তখন কেটে গেছে, খালি খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। বিয়েবাড়ির পেল্লায় খাওয়া ছেড়ে এলেন বলে একটু দুঃখও যে না-হচ্ছে তাও নয়। যাই হোক, নিজের কালে, নিজের দেশে, নিজের ঘরে, বড় এক ঘড়া ঠাণ্ডা জলই বা মন্দ কি! একবার পাশের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, এক ঘণ্টা আগেও যেখানে বিয়ের হট্টগোলে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল, এখন সেখানে সব অন্ধকার নিঝুম, এর মধ্যে একশো বছরের ব্যবধান! কি কলই করেছে অর্ধেন্দু! বালিশে মাথা রাখা মাত্র গভীর ঘুম।

সে ঘুম ভাঙল—অনেক বেলায়, সন্ধ্যামণির ব্যাকুল ডাকাডাকি আর দরজার ধাক্কাতে। সন্ধ্যামণি? সন্ধ্যামণির তো আসবার কথা নয়। তবে কি শেষ পর্যন্ত কচি বরটাকেই ধরে আনা হয়েছিল? এত করেও কি তবে সব পণ্ড হয়ে গেল! দরজা খুলতেই সন্ধ্যামণি একেবারে আলুথালু বেশে ছুটে এসে তাঁর পায়ে পড়ল।—এ কেমন সন্ধ্যামণি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, বেশ দেখাচ্ছে লাল লাল গাল দুটো আর তার মুখে এ কি সব অদ্ভুত কথা!—'আমাকে ক্ষমা কর। মাসি বলেছে অত শাসন করলে তুমি কোথায় পালিয়ে যাবে, মেসো নাকি তাই গেছিল। ওগো, আমায় ফেলে কোথাও যেয়ো না!'

কেমন যেন মনটা নরম হয়ে গেল নকুড়বাবুর; নীচু হয়ে তুলে ধরলেন সন্ধ্যামণির দু'মণ দেহখানি। কানের ওপর চোখ পড়ল, দেখলেন বেশ বড় কান, তার লতি জোড়া। আর মুখে কথা সরে না। সন্ধ্যামণি চোখ মুছে, কুঁজো থেকে জল ঢেলে নিজের হাতেমুখে দিল, বাকিটুকু পায়ের ওপর ঢালল। বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে নকুড়বাবু দেখলেন পায়ের আঙুলের ফাঁকে খানিকটা আলগা আলগা চামড়া, অনেকটা হাঁসের পায়ের মতো।

সন্ধ্যামণি একটু অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলল—'আমার মামাবাড়ির সকলের এই রকম পায়ের আঙুল আর জোড়া কানের লতি।' আনন্দে অধীর হয়ে নতুন সন্ধ্যামণিকে নকুড়বাবু দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। অর্ধেন্দুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে গেল। তবে সাক্ষাৎ বুড়োদাদাশ্বশুর বারে বারে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন মনে করে লজ্জাও পেলেন।

৪. বরাহের দাঁতের মালা

কাদম্বিনী মাসিমার শ্বশুরবাড়ির পিছন দিকে কুয়ো খোঁড়া হচ্ছিল। পাথুরে মাটি, খুঁড়ে খুঁড়ে মজুররা হয়রান হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ গর্তের একপাশ দিয়ে অনেকখানি মাটি একসঙ্গে ধ্বসে গেল; আর মস্ত একটা গুহা প্রকাশ পেল। বাড়িসুদ্ধ সবাই তখন গুহা দেখতে ছুটল; কাদম্বিনী মাসিমা চালকুমড়োর বড়ি দিচ্ছিলেন তখন আর তাঁর যাওয়া হ'ল না। কিন্তু কেন জানি খবরটা শুনে অবধি অকারণে তাঁর বুকটা অস্বাভাবিক রকমের ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল।

দুপুরে মজুররা যখন সবাই যে যার কাজ বন্ধ করে চলে গিয়েছে, কাদম্বিনী মাসিমা দিনের মত পাটি পেতে শুয়ে না পড়ে বাড়ির পিছনে কুয়ো দেখতে চললেন।

দেখলেন মাটির উপর থেকে বিশ পঁচিশ ফুট নীচে অনেকখানি দেয়াল ধ্বসে গিয়েছে, আর সেইখানে নতুন কাটা মাটি দিয়ে ঘেরা গুহার মুখটা হাঁ করে রয়েছে। গুহার মুখের কাছে একটা ছাই রংএর পাথর মাটি থেকে উঁচু হয়ে রয়েছে, দেখতে অনেকটা নেকড়ে বাঘের মত; যেন গুঁড়ি মেরে রয়েছে একটা নেকড়ে বাঘ। তাই দেখে কাদম্বিনী মাসিমার হৃদয় সহসা আকুল হয়ে উঠল, যেন কতদিনের না-দেখা হারানো স্বজনকে ফিরে পেয়েছেন।

কুয়োর ধারে ধারে সিঁড়ির ধাপ কাটা ছিল; তাই দিয়ে নামা যায় বটে, কিন্তু কাদম্বিনী মাসিমার মত আধাবয়সী বাঙ্গালী মেয়েকে একটু কষ্ট করতে হয়। কাদম্বিনী মাসিমা অশান্ত হৃদয় ও সতর্ক পদক্ষেপে সেই সিঁড়ি বেয়ে গুহার মুখের কাছে পৌঁছলেন।

এসবই কাদম্বিনী মাসিমার চেনা। দরজার কাছে পাথরের নেকড়ে; তার পিছনে আত্মগোপন করে নিজে সকলের অলক্ষ্যে থেকে বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করা যেত সেসব দিনে। একরকম বড় বড় পাতা-ওয়ালা শক্ত লতা গাছ গুহার মুখ আচ্ছন্ন ক'রে রাখত। তাতে পুরুপুরু পাপড়িওয়ালা বড় বড় লাল ফুল ফুটত। যখন দক্ষিণ বাতাস বইত তার উগ্র মিষ্টি গন্ধে গুহা আমোদিত হয়ে উঠত। এসব কথা কাদম্বিনী মাসিমার হঠাৎ স্পষ্ট করে মনে পড়ে গেল।

ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। দিব্যি শুক্‌নো ঝরঝরে; মেঝেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বালুকাময়। চেয়ে দেখলেন ছাদটা

দেওয়ালটা পাথরের তৈরী, খুব বেশী উঁচু মনে হ'ল না, উপরিভাগটা অন্ধকারে ঢাকা। মনে হ'ল সেখানে মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাদুড়রা এসে বাসা করবার চেষ্টা করত। তাদের সোঁদা দুর্গন্ধে গুহা ভরে যেত। ভিজে কাঁচা কাঠ জেলে রাত্রে তাদের তাড়াতে হ'ত।

সেই কাঠ জ্বালান একটা ব্যাপার ছিল। নদীর ধার থেকে চক্‌মকি পাথর কুড়িয়ে আনতে হ'ত, তাই ঘষে ঘষে আগুন জ্বালতে হ'ত। হাতে ফোস্কা পড়ে যাবার ভয় ছিল, কিন্তু তাকে ভয় করলে চলবে কেন? আগুন না জেলে রাখলে চারদিক দিয়ে মুস্কিল।

চক্‌মকি দিয়ে আগুন তৈরি করে রাখতে হ'ত। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবার বহু পূর্বেই পুরুষমানুষরা সব শিকার থেকে ফিরে আসত, মরা শিংওয়ালা হরিণ, বন্য বরাহ নিয়ে। কত রকম ফল মূল নিয়ে।

মনে পড়ল ধারাল সব পাথরের অস্ত্র ছিল, তাই দিয়ে জানোয়ারগুলোর ছাল ছাড়াতে হ'ত। গুহাভরা লোকজন ছেলেমেয়ে ছিল যেন, তারা সাহায্য করত। ছাল আস্ত ছাড়িয়ে নিতে হ'ত। মাংস আগুনে ঝল্‌সে খাওয়া হ'ত।

পাথরের বল্লমগুলো পরিষ্কার করতে হ'ত। ছালচামড়াগুলো রোদে শুকিয়ে পাথর দিয়ে ঘসে পালিশ করে বসবার আসন হত, বিছানা হ'ত, শীতকালের জামা হত। গরমের সময়ে কী সুন্দর গাছের ছালের জামা পরত সকলে।

মেয়েদের কাজের কী কোনও কালেও অন্ত থাকে? এখনও দিনের কাজগুলি দিনান্তে শেষ হয় না, তখনও হ'ত না। সারারাত ধুনি জেলে রাখতে হ'ত। লম্বা দাঁতওয়ালা লম্বা লম্বা লোমে ঢাকা বাঘ ভাল্লুক ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নিষ্ঠুর চেহারার বানর ছিল, আর চারদিকে শত্রু ছিল। সর্বদা সতর্ক থাকতে হ'ত। কাদম্বিনী মাসিমার ঘুম তখনও এখনকার মতই সজাগ ছিল। ভেতরে ভেতরে আসলে বিশেষ কোনও পরিবর্তনই হয় নি, কিন্তু বাইরেটা অনেক বদলে গেছে।

গুহার মধ্যে কাদম্বিনী মাসিমা চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একটা বড় চ্যাপ্টা পাথর ছিল উত্তরের কোনটিতে, তাই নিয়ে কালো-নাগিনীর সঙ্গে কত না অশান্তি হ'ত। কালো-নাগিনীর কথা সব কাদম্বিনী মাসিমার মনে পড়ল। দেখলেন সেই পাথরটা দু-টুকরো হয়ে ভেঙ্গে রয়েছে, এখন কালো নাগিনীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যেত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কালোনাগিনী গুহায় এসেছিল। পুরুষমানুষদের খাওয়া শেষ হয়েছে। কাদম্বিনী মাসিমা দু'তিনজন স্ত্রীলোকের সাহায্যে মেয়েদের খাওয়ার

ব্যবস্থা করছেন। ছেলেপুলেরা সব কোন্‌কালে দেওয়াল ঘেঁষে ঘাসের বিছানাতে, লোমের আসনে যে যেখানে পেরেছে গাদাগাদি ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এমন সময় কালোনাগিনী এসে গুহার মুখে দাঁড়াল। অবাক হয়ে সবাই তার দিকে চেয়েছিল। বিচিত্র তার রূপ। পাৎলা ছিপ্‌ছিপে, কষ্টি পাথরের মত কালো, চোখ দুটি বেড়ালের চোখের মত একটু পিঙ্গলাভ, জলজলে। কালো চুলে লাল ফুল গোঁজা, সরু একটা হাড়ের কাঁটা দিয়ে চুলগুলি পরিপাটি করে বাঁধা, পরনে বল্কল, আর আশ্চর্য এক বরাহের দাঁতের মালা।

তাকে দর্শনমাত্র কাদম্বিনী মাসিমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল। কর্কশকণ্ঠে তাকে চলে যেতে আদেশ করেছিলেন। সে সেদিকে কর্ণপাত না করে, যেদিকে পুরুষ-মানুষরা বিশ্রাম করছিল হাসিমুখে সেই দিকে চেয়েছিল। কাদম্বিনী মাসিমার স্বামী গুহার দলপতি, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কালোনাগিনীকে ভিতরে আসতে বললেন। বাইরে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছিল, কালোনাগিনী চুল থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলে গুহার মধ্যে এসে দাঁড়াল। কাদম্বিনী মাসিমা দেখলেন তার পাশে আর সকলকে বানরীর মত দেখাচ্ছে। কোনও কথা না বলে সকলে খেতে বসেছিলেন। কালোনাগিনী মাংস খেত না, শুধু ফলমূল খেয়ে থাকত।

কালোনাগিনী গুহাতেই রইল, গুহার মহিষী হয়ে রইল। কোন কাজ করত না। অষ্টপ্রহর সেজেগুজে থাকত। কত না ছিল তার ঢং! নদীর ধার থেকে ছোট ছোট শামুক কুড়িয়ে এনে, বালি দিয়ে ঘষে ধুয়ে, তাই কানে পরত, গলার মালা করে পরত, হাতের বালা ক র পরত। কোথা থেকে শক্ত সরু লতা আনত, তাই দিয়ে মালা গাঁথত,। আর গুহা সুদ্ধ সমস্ত ছেলেমেয়েরা ছিল তার অনুচর।

তাদের সঙ্গে সূর্য চন্দ্র তারা, মেঘ বৃষ্টি, অমাবস্যা পূর্ণিমা, শীত বর্ষা, বিশ্বের যা কিছুর বিষয় গল্প করত। একটানা সুরে গান করত জন্মমৃত্যুর কথা, গুহাসুদ্ধ সবাই অবাক্ হয়ে শুনত।

দেয়ালের পাথরের গায়ে ধারাল পাথরের ফলা দিয়ে ফুল পাখী জন্তু জানোয়ারের ছবি আঁকত। এই বসবার জায়গাটার ধারে।

কাদম্বিনী মাসিমা উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের গা পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন ক্ষীণ রেখা দিয়ে কত না নক্সা করা রয়েছে! তাঁর হৃদয়ের রক্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল। কোন জন্মজন্মান্তরের আঁকা ছবি।

কালোনাগিনী ওষুধপত্র জানত। কারও যদি মাথা ধরত, কি দাঁত ব্যথা করত, কি পেটের অসুখ করত, কি সব শিকড় বাকল চেটে খাওয়াতো, অব্যর্থভাবে

সেরে যেত। রক্ত পড়ার ওষুধ জানত, হাড় ভাঙ্গার ওষুধ জানত, সাপের বিষের ওষুধ জানত।

গুহার আর সব স্ত্রীলোক থেকে কালোনাগিনী ছিল স্বতন্ত্র। তার গলার আওয়াজ ছিল গাছের পাতার মধ্যে বাতাসের মর্মরের মত। সে কখনও রাগও তো করত না, দুঃখিতও হত না। সে ছিল সমস্ত মেয়েদের চোখের বিষ!

কাদম্বিনী মাসিমার মনে পড়ল তাকে কোন সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া হত না, কিন্তু কিছুই তাকে স্পর্শ করত না।

একবার তার হাতে বাবলার কাঁটা ফুটে খুব জ্বর হয়েছিল। ওষুধ আনতে পর্যন্ত যেতে পারে নি। কাদম্বিনী মাসিমারা তাকে এক অঞ্জলি জলও দেন নি। তৃতীয় দিন সে পুরুষ মানুষদের কী সব আদেশ করল। তারা বনজঙ্গল তোলপাড় করে গাছগাছড়া এনে দিল। কালোনাগিনী ওষুধ তৈরী করে খেয়ে সেরে উঠল। দলপতির কাছে কাদম্বিনী মাসিমাদের নামে নালিশও করেনি; কোনও দিনও কোনও বিষয়েই নয়।

যে দিন জ্বর ছাড়ল সেইদিনই বনের মধ্যে গিয়ে সেই লতার চারা এনেছিল। গুহার দরজার পাশে পুঁতেছিল। দলপতির ভয়ে কেউ সেটা উপড়ে ফেলতে সাহস পায় নি। সেই লতা বড় হয়ে গুহার প্রবেশদ্বারকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। লালফুলের গন্ধে গুহা আমোদিত হত।

কাদম্বিনী মাসিমার ছেলেকে সাপে কামড়েছিল, গোড়া-কাটা ফুল গাছের মত সে মাটিতে এলিয়ে পড়েছিল। তার ঠোঁট নীল হয়ে গেল, চোখ বন্ধ হয়ে গেল, কাদম্বিমা মাসিমা বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলেন। এমন সময়ে কালোনাগিনী তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পাথরের কুচি দিয়ে ছেলের দাঁত ফাঁক করে কি একটা ওষুধ খাইয়ে দিল। নিমেষের মধ্যে ছেলের দেহ সজীব হয়ে উঠল। আর কাদম্বিনী মাসিমার কালোনাগিনীর উপর কোনও বিদ্বেষ রইল না।

তবে মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'ত যে সে সাধারণ মানবী নয়। যেসব নিয়মকানুন কাদম্বিনী মাসিমাদের খাটে, সেসব তার জন্য নয়। বহুদিন কালোনাগিনী এই গুহাতে বাস করেছিল। সে যে এদের কেউ নয় সকলে ভুলেই গিয়েছিল। কালোনাগিনী এই গুহাতেই মারা গিয়েছিল। মহামারী হয়েছিল, কালোনাগিনী পাহাড়ে ওষুধ আনতে গিয়েছিল, কেমন করে জানি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল। আর উঠতে পারেনি। তাকে পুরুষমানুষরা ধরাধরি করে গুহায় এনেছিল, তার কথামত কত ওষুধ দিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হয় না, তখন সে এই

পাথরটাতে ভর দিয়ে বসে মহামারীর ওষুধ বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর গলা থেকে বরাহের দাঁতের মালা খুলে কাদম্বিনী মাসিমাকে দিয়েছিল।

কাদম্বিনী মাসিমা সাধারণ নারী ছিলেন বলে, খুব কান্নাকাটি করেছিলেন; পরে বহুদিন ঐ বরাহের দাঁতের মালা গলায় পরে অন্যদের ঈর্ষার পাত্রী হয়েছিলেন।

শেষে মালা পরতে আর ভালো লাগত না, কিন্তু প্রাণভয়ে কাউকে দিতে পারেননি। একদিন গোপনে এইখানে পাথরের আড়ালে বালির মধ্যে পুঁতে রেখেছিল। শত শত বছর পর আজ মনে পড়ল। তখন তিনি বালিতে খুঁড়ে দেখলেন, কতকগুলি বাঁকা বাঁকা পাথরের মতন জিনিস পেলেন প্রত্যেকটিতে সুতো পরাবার ছ্যাঁদা করা রয়েছে।

যখন কাদম্বিনী মাসিমার চমক ভাঙ্গল, দেখা গেল বাইরে রোদ পড়ে এসেছে। নারী কি কখনো ঈশ্বর দেখার সময় পায়? তার পোশাক-পরিচ্ছদ বদলায় বটে; কিন্তু জীবনযাত্রা কি আর বদলায়? হৃদয়ের বৃত্তিগুলো কি আর বদলায়? দুঃখ ব্যথা, আশা নিরাশাগুলো কি আর বদলায়? সংসারের চাকায় বাঁধা থেকে অপরূপকে লাভ করার ইচ্ছাটা কি বদলায়? বিচিত্ররূপিণী যে, রূপ কি তার সত্যি বদলায়?

৫ পেটেন্ট

কলকাতায় একটা সরকারি আপিস্ আছে, সেখান থেকে সব নতুন উদ্ভাবনের পেটেন্ট দেওয়া হয়। অর্থাৎ লিখিত-পড়িতভাবে, যে উদ্ভাবনের মালিক—তা সে উদ্ভাবক নিজেই হক, কিম্বা তার কোনো নগদ ক্রেতাই হক, বা উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধিই হক—সে সাক্ষী-সাবুদ সহ আবেদন পত্র দিয়ে ঐ আপিসের কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করে, যথাবিহিত টাকাকড়ি জমা রেখে, তবে পেটেন্ট পেতে পারে। পেটেন্টের জিনিসের একটা নাম ও সংখ্যাও বোধহয় দেওয়া হয়। তাহলে আর কেউ ঐ নাম সংখ্যা ব্যবহার করতে, বা ঐ জিনিসের নকল করতে পারে না।

কথাটা বলতে যত সহজ শোনাল, কার্যতঃ তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। ফলে ঐ আপিসের অধিকাংশ কর্মচারী স্নায়বিক দুর্বলতা আর অনিদ্রায় ভোগেন। এই কলকাতা শহরেই যে কত লক্ষ আশ্চর্য সব নতুন যন্ত্রপাতি প্রতি বছর তৈরি হয় আর কত হাজার উদ্ভাবক যে হতাশার গ্লানি নিয়ে দিন কাটান, কে তার হিসাব রাখে।

হতে পারে তাঁদের বেশির ভাগই খ্যাপা ও খামখেয়ালী কিন্তু এই ধরনের লোকেরাই যে পৃথিবীর অধিকাংশ অভাবনীয় আবিষ্কার করে থাকে, সে-কথাও কারো অজানা নেই। বলা বাহুল্য পৃথিবীর অন্যান্য আপিসের মতো এ আপিস-ও নিরেট, নীরস, কল্পনাশূন্য। যার চাক্ষুষ প্রমাণ পাচ্ছেন তাও এরা সব সময় সমর্থন করেন না। মালিক সব কথা খুলে বলেন না বলে, অথচ বলবেন-ই বা কোন সাহসে? গোপন কথা তো আর পাঁচ কান করা যায় না। তাই শতকরা ৯৯½ জন লোককেই পত্রপাঠ ভাগিয়ে দেওয়া হয়। আর ঐ বাকি ½ খানা মানুষ পেটেন্টের কাগজপত্র নিয়ে সেই যে ডুব মারে, আর তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

যাদের ভাগানো হল তাদের মধ্যে কত অঘটন ঘটন পটীয়সী থেকে যায়, তাই বা কে বলতে পারে? যেমন সেদিনের সেই খেমো লোকটি। হরিদাসবাবু বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। মনে তাঁর কোনো সুখশান্তি ছিল না। অথচ খেমো লোকটির চেহারা দেখে কিছু বুঝবার জো ছিল না। রোগা, বেঁটে, কালো, তিন দিন খেউরি হয় নি। পানদোক্তা খেয়ে শুধু দাঁত কেন, ঠোঁট

পর্যন্ত কুচকুচে কালো। পরনে একটা হাফ-হাতা কালো গেঞ্জি-শার্ট, কালো সরু-ঠ্যাং প্যান্টেলুন, তৈরি হয়ে অবধি কোনোটা কাচা হয়েছে কি না সন্দেহ। নস্যির গন্ধ। জঘন্য রুমাল দিয়ে সারাক্ষণ নাক মোছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, এখন তার কালো রং। আর হাতে সেই চেনা কালো ব্যাগ।

উঠে আরেকবার জল খেলেন হরিদাসবাবু। তাঁর কাজই হল উট্‌কো লোক ভাগানো। আগেই বলা হয়েছে শতকরা ৯৯½ জনকে পত্রপাঠ ভাগানো হয়। তার মধ্যে ৯০ জনকে ভাগান হরিদাসবাবু। কাগজপত্রের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে, আড়চোখে একবার আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে নেন। বেশির ভাগই স্রেফ্ খ্যাপা। কিন্তু সবার চোখে স্বপ্ন। রাগ ধরে হরিদাসবাবুর। মাথাগুলো আজগুবি চিন্তা দিয়ে ঠাসা। যত রাজ্যের বাজে চিন্তা। তবু চোখে কিসের স্বপ্ন।

এই খেমো লোকটা সবচেয়ে জ্বালিয়েছে তাঁকে গত পাঁচ বছর ধরে। মাসে একবার করে উদয় হওয়া চাই। এসেই হেসে বলে, "এবার স্যার, আমার কথা মানতে বাধ্য হবেন, তাতে কোনো সন্দ নেই! এই দেখুন।" বলে হয়তো মাঝারি সাইজের রেডিওর মতো বড় একটা চারকোণা যন্ত্র বের করে বলল, "রাতে যখন সব শব্দ থেমে যাবে, তখন এটা দিয়ে গত একশো বছর ধরে এখানে যে যা বলেছে বা আওয়াজ করেছে, সব শোনা যাবে।

হরিদাসবাবু বললেন, "কাগজপত্র দেখি।" খেমো লোকটা এ পকেট সে পকেট হাতড়ে বলল, "পাচ্ছি না তো।" হরিদাসবাবু বললেন, "নেক্সট্।"

আরো অনেকে ঘনঘন আসে। তারা অন্য রকম। টাকা হাতে গুঁজে দিতে চায়। ঘরে করা সন্দেশ আনে। জয়নগরের মোয়া আনে। তাদের উদ্ভাবনও সব সংসারী ব্যাপার। মাখন তোলার নতুন কল। নারকেল কোরা। টিন-কাটা। একজন একটা বালতিতে চাকা বসিয়ে কাপড়-কাচার মেশিন আনল। কত রকম উনুন। লুচি বেলার যন্ত্র। মশলা গুঁড়োর যন্ত্র। বললাম না যত সব ঘরকন্নার জিনিস। এরাই অনেক সময় উৎরে যায়।

খেমো লোকটা অন্য ধাতুর। এই পাঁচ বছরে পঞ্চাশ-ষাটটা উদ্ভাবন এনেছে। সবগুলো উদ্ভটের একশেষ। বৃষ্টির ফোঁটা বড় করার জন্য খুদে একটা পিস্তলের মতো কি। ভালো ভালো স্বপ্ন দেখার কল। মার্বেলের মতো কি জিনিস কানে পরে শুতে হবে। ওতে কি আছে, তা কিন্তু বলল না কিছুতেই। আক্ষেপ রোধ করার ওষুধ; নাকি বেশির ভাগ মানসিক রোগের কারণ অনুতাপ, আক্ষেপ। ঐ বড়ি খেলে সে সব দূর হয়, পাগল সেরে ওঠে। কাগজে দেখা গেল বড়ির প্রধান

উপকরণ সেঁকো বিষ। ঐ ওষুধ একটু পেলে, হরিদাসবাবু এক্ষুনি গিলে ফেলেন। হ'ক সেঁকো বিষ। আবার উঠে আরেকবার জল খেতে হল। লোকটার অবস্থা গোড়ায় বেশ ভালোই ছিল। অন্ততঃ কাপড়চোপড় আর গোলগাল ফরসা চেহারা দেখে তাই মনে হত। তখন অনেক কথা বলত। নাকি পাটনায় কোন দোকানের সহকারী ম্যানেজার ছিল। স্ত্রীপুত্রপরিবার, মায় একটা ছোট বাড়িও ছিল। চাকরি ছেড়ে সব বেচেবুচে, পৈত্রিক বাড়িতে উঠেছিল। বাকি জীবনটা উদ্ভাবন করে কাটাবে। মাথায় এত নতুন নতুন বুদ্ধি আসে, সে-সব নষ্ট হতে দেওয়া মহাপাপ। বলা বাহুল্য বাড়ির লোকেরা রেগে টং।

এই পাঁচ বছরে যেমন পঞ্চাশটি উদ্ভুট্টি আবিষ্কার করেছে, তেমনি জমানো টাকা, বাড়ি, আসবাব, স্ত্রীর গয়নাগাঁটি, ইন্সিওরেন্স পলিসি, একে একে সব উড়িয়েছে। এখন স্ত্রী বি-এ বি-টি পাস করে, বাপের বাড়িতে থেকে ছেলেমেয়ে মানুষ করছে। তারপর একটু হেসে বলেছিল, "এক রকম ভালোই হয়েছে। একটা চালাঘরে থাকি আর গবেষণা করি।" তা গত দু-বছর নিজের বিষয়ে কথাবার্তাও বিশেষ বলত না, খালি উদ্ভাবনের কথা। হরিদাসবাবু বেজায় বিরক্ত। এরকম একটা অপদার্থ মানুষ যে ভূভারতে থাকতে পারে, এ তাঁর জানা ছিল না। হাজার গালাগাল দিলেও গায়ে মাখে না। সাংসারিক কর্তব্যগুলোকে হাঁসের গায়ের জলের দাগের মতো ঝেড়ে ফেলে। যাচ্ছেতাই বললেন সেদিন হরিদাসবাবু, যে কোনো ভদ্রলোকের সে-সব কথা অসহ্য মনে হত, এই সাদা কাগজে লেখা যায় না এমন সব কথা।

এতটুকু রাগল না সে, একটু অপ্রস্তুত হেসে বলল, "সত্যি ভারি অন্যায় করি। কিন্তু আপনি জানেন কি আকাশের নীলটা আসলে কিছু নয়, স্রেফ্ ফাঁকার রং, ওর পদার্থ নেই, তার মানে কিনতে খরচও নেই। কোনমতে যদি ওটাকে ধরার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে আর দেখতে হবে না। গিন্নির সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেব!"

বলে চশমার কাচের মধ্যে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল। বাস্তবিক অদ্ভুত চোখ দুটো। কেমন নীল নীল ছায়া লাগা, যেন তার তল নেই। ভারি অস্বস্তি লাগে। হরিদাসবাবুর রাগটাও ঝপ করে পড়ে গেল। বললেন, "কেন যে নিজের আর নিজের পরিবারের এমন সর্বনাশ কচ্ছেন বুঝতে পারি না। রেখে দিন নীল রং। যা নেই তা ধরবেন কি করে তা বুঝলাম না। দাড়ি কামাবার পুরনো ব্লেডে ধার দেবার একটা যন্ত্র বানালেও তো কাজে দিত।"

খেমো লোকটা শিউরে উঠল। তারপর ঝোলাটা তুলে নিয়ে বলল, "এই উদ্ভাবনটা সেরকম মন্দ ছিল না কিন্তু। এটা সে-রকম উড়ুক্কু নয়। পৃথিবীর তিন ভাগ জলের মধ্যে এক ভাগ স্থলের চেয়ে তিনগুণ খাদ্য গজায়। সেগুলো না-গাছ, না-জানোয়ার, কাঁটা নেই, হাড় নেই, বিচি নেই, ছিবড়ে নেই। তবে হ্যাঁ, তুলে আনার অসুবিধে। এই টেবিল-ঘড়ির মতো জিনিসটার সাহায্যে ওরা নিজেরাই উঠে আসতে পারে, তা জানেন? পৃথিবীর খাদ্য সমস্যা ঘুচে যায়। সেটা কি খারাপ।"

হরিদাসবাবু একটা ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বেশ, বলছেন যখন। স্পেসিফিকেশন সহ কাগজপত্র রেখে যান। দেখি কি করতে পারি।"

খেমো লোকটি যেন আকাশ থেকে পড়ল, "স্পেসিফিকেশন? কাগজপত্র? সে-সব কোথায় পাব বলুন, গরীব মানুষ? কাগজপত্র কিনি না। সব আমার এই মগজে লেখা থাকে। হারাবার, ছিঁড়বার, ভিজবার, ছিনতাই হবার ভয় নেই। ও-সব দিয়ে হবেটা কি বলতে পারেন? একটা ফী জমা দিতে পারি, চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করেছি। পেটেন্টটা দিয়ে দিন। তারপর যতগুলো মেশিন্ চান সরবরাহ করব। অবিশ্যি অগ্রিম দাম দিতে হবে। দেউলে মানুষ। বৌ যা পাঠায় তাতে কোনোমতে খাওয়াপরাটা চালাই।"

হরিদাসবাবু রেগেমেগে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য বেশ লজ্জাই হচ্ছিল। ভাবলেন আপদ গেছে। এরপর আর ব্যাটা এ-মুখো হবে না। বৌ চাকরি করে টাকা পাঠায়, তাতে চলে, অথচ এতটুকু লজ্জা নেই! ওর মুখ দেখাও পাপ!

দেড় মাস না যেতে খেমো লোকটি আজ সকালে আবার এসেছিল। সেই রকম নীল ছায়া-লাগা চোখ দিয়ে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, "তা গতবার যতই রাগুন না কেন, এবার যে মোক্ষম জিনিস এনেছি, এবার আর ফেরাতে পারবেন না। এই দেখুন।"

এই বলে পকেট থেকে চার-পাঁচটা লুডো খেলার ঘুঁটির মতো খুদে খুদে লাল চাকতি বের করে, হরিদাসবাবুর সামনে ফেলে, হাসি হাসি মুখে চেয়ে রইল!

হরিদাসবাবুর দাঁত ব্যথা করছিল। সে বড় বিশ্রী ব্যাপার, একেবারে কানের ভেতর পর্যন্ত কট্‌কট্ করছিল। হাঁড়িমুখ করে বলেছিলেন, "কি হবে ও-সব লুডো খেলার ঘুঁটি দিয়ে? আপনার কি মশাই, সময়ের কোনো দাম নেই? মাসের পর মাস এই সব যত রাজ্যের বাজে খেলনা নিয়ে এসে আমার

পকেট থেকে চার-পাঁচটা লুডো খেলার ঘুঁটির মতো খুদে খুদে লাল চাকতি বের করে।

সময় নষ্ট করেন? যান। এখানে আর আসবেন না। এটা পাগলাগারদ নয়।"

এই বলে হাত দিয়ে ঘুঁটিগুলো টেবিল থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন লোকটার চোখের মধ্যেকার নীল আলোটি দপ্ করে নিবে গেল। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে সে মাটি থেকে ঘুঁটিগুলো তুলে পকেটে ভরতে লাগল। হাতটা বেজায় কাঁপছিল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "নিলে ভালো করতেন। গতবার পৃথিবীর খাদ্য সমস্যা ঘুচোবার কলটি একটু পরীক্ষা করেও দেখলেন না। খাদ্যের চেয়ে বড় জিনিস কি জানেন? মানুষের প্রাণ। এই ঘুঁটি রাগ চেপে ধরলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, তা জানেন? অবিশ্যি এর কাগজপত্র দিতে পারব না।"

ঠিক সেই সময় দাঁতের ব্যথাটা আরেকবার মোচড় দিয়ে ওঠাতে হঠাৎ রাগে অন্ধ হয়ে, যা কখনো করেননি, কোনো দিনও করেননি, হরিদাসবাবু তাই করে বসলেন। আঙুল দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিয়ে কর্কশ গলায় বললেন, "যান বলছি। অনেক সয়েছি, আর নয়। চৌবে! এই পাগলবাবুকে আর ঢুকতে দিও না।" খেমো লোকটির মুখটা সাদা হয়ে গেছিল। চৌবেকে কিছু করতে হয় নি। সে নিজেই অন্ধের মতো হোঁচট খেতে খেতে চলে গেছিল।

দাঁত ব্যথার জন্যই হক, কি যে কারণেই হক, হরিদাসবাবু চোখে অন্ধকার দেখছিলেন, হাত ঘামছিল। কোনোমতে সকালের জরুরী কাজগুলো শেষ করে, ছুটি করে নিয়ে, সাইকেল চেপে সোজা দাঁতের ডাক্তারের বাড়ি। নিতান্ত অসময়, অনেকক্ষণ বসে বসে কষ্ট পেয়ে, শেষে পোকা-খাওয়া দাঁতটি তুলিয়ে, কিঞ্চিৎ পয়সা জলাঞ্জলি দিয়ে, সিঁড়ির তলা থেকে সাইকেলটা নিয়ে, ডাক্তারের বাড়ির দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

কপাল দিয়ে, ঘাড় দিয়ে ঠাণ্ডা ঘাম গলা বেয়ে নামতে লাগল। তাতে আর বিচিত্র কি? সকাল থেকে শরীর মনের ওপর দিয়ে যে ধকল গিয়েছে। ঘাম মুছবেন বলে রুমালটা বের করতেই টুপ করে লাল রঙের ছোট্ট একটা ঘুঁটি পায়ের কাছে পড়ল। ঝেঁটিয়ে ফেলার সময় এটা বোধ হয় রুমালে আটকে গেছিল।

সেটি তুলে নিলেন হরিদাসবাবু। হাসি পেল। এই সেই হতভাগার মৃত-সঞ্জীবনী ঘুঁটি। ঠিক তখুনি সেই ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটে গেল। ঘুঁটি তখনো তাঁর হাতে ধরা। ছোট্ট একটা খেলার স্কুটারের ওপর চেপে দুটো ছ-সাত বছরের

ছেলে পাগলের মতো বোঁ-বোঁ করে ছুটে এসে হরিদাসবাবুর সাইকেলে ধাক্কা খেল। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে দাঁড়ানো ছেলেটা ছিটকে রাস্তায় পড়ল, একেবারে একটা গাড়ির চাকার সামনে।

হয়তো চাকাটা তার গায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়নি, ধাক্কা লেগেছিল শুধু। কিন্তু তার গলাটা যে ফুটপাথের কিনারায় বিশ্রী একটা ঘ্যাশ্ শব্দ করে পড়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ঐ বাড়িতে অনেক ডাক্তারের চেম্বার ছিল। নিচের তলার ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাক্তার ছুটে এসে, ছেলেটার পাশে বসে পড়ে, একটু দেখেই বললেন, "কিছু করবার নেই। সব শেষ।"

ততক্ষণ চারদিকে ভিড় দাঁড়িয়ে গেছে। পুলিশের লোকও যে কোত্থেকে উদয় হয়েছে, তার ঠিক নেই। এতক্ষণে হরিদাসবাবুর হুঁশ হল! কাউকে কিছু না বলে, হাঁটু গেড়ে ছেলেটার পাশে বসে, তার রগের ওপর লাল কাপড় দিয়ে চেপে ধরলেন। শীতের সময়, এরি মধ্যে আলো কমে এসেছিল, ভালো করে সব কিছু ঠাওর হচ্ছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে ছেলেটা যে হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল, হরিদাসবাবু সেটা স্পষ্ট টের পেলেন। ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সে নড়েচড়ে উঠতেই, চমকে গিয়ে আবার বসে পড়লেন।

আরে, আরে, একি! লাইফ রয়েছে যে! ওহে তোমরা সর, সর, একটু জায়গা দাও, একটু হাওয়া লাগুক।" সেই গোলমালের মধ্যে হরিদাসবাবুর হাত থেকে ঘুঁটিটা ছিট্‌কে নর্দমার গ্রিলের মধ্যে দিয়ে পড়ে গেল। হরিদাসবাবুর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হয়েছিল বাড়িতে। নাকি যে অ্যাম্বুলেন্সে ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ওঁকেও তাতে করেই পৌঁছে দিয়েছিল। ছেলেটির শরীর নাকি একটুও জখম হয়নি। খালি রগে একটা ছোট্ট গোল দাগ দেখা গেছিল। সেটাও একটু পরেই মিলিয়ে গেছিল।

হরিদাসবাবু শেষ বারের মতো দু-ঢোক জল খেয়ে দেখলেন পূবদিকের আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আপিসে গিয়ে, আবার তাঁকে নিজের জায়গায় বসতে হবে। কিন্তু তিনি মনে মনে নিশ্চিত জানতেন যে সেই খেমো লোকটি আর কখনো আসবে না। আসেওনি।

৬. সিলিকন

পূজোর দশ দিন আগে সবাইকে অবাক করে দিয়ে গুপির ছোটমামা সিমলার হোটেলের আরাম ছেড়ে সটান পানুদের বাড়ি এসে উঠলেন। আগের দিন পোস্টকার্ড পেয়ে গুপিও সেখানে হাজির ছিল। ছোটমামা বললেন, "গোপন কথা সর্বদা পোস্টকার্ডে লিখবি, বুঝলি লুকোতে হলে প্রকাশ্যে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াবি। তবে হ্যাঁ, কার্যসিদ্ধির জন্যে কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়—"

গুপি বলল, "ও-সব বাদ দিয়ে, কি করতে হবে বল।" ছোটমামা কোনো কথা না বলে গুপির হাতে একটা ছোট্ট খবরের কাগজের কাটিং দিলেন। ইংরিজি কাগজের দুটি লাইন, "ডেয়ার-ডেভিল্‌স্ ওয়ান্টেড্। ক্যাড়াকৃটার নো অবজেক্‌শন। অ্যাপ্লাই শার্প, পি-ও বক্স ১১, সিমলা।"

গুপি সোজা ছোটমামার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "তা তুমিই যাও না কেন? কাজ কম্ম নেই, এক রকম বলতে গেলে তোমাদের পাড়ার ব্যাপার। এর মধ্যে বাইরের লোক ডাকছ কেন?"

"সেই জন্যেই। তোরা আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও, সেখানে আমার একটা পোজিশন আছে। অত বড় হোটেলের একজন পার্টনার, তাছাড়া আমার কি টাকাকড়ির দরকার আছে নাকি? তোদের আছে। কি শুনেছিলাম টি ভি কিনতে চাস্। তাছাড়া—"

"তাছাড়া কি?"

"তাছাড়া আমি কি করে যাব? ওদিকে জানোয়ার-টানোয়ার আছে। জানিস্-ই তো জানোয়ারের গন্ধে আমার হেঁচকি আসে। তার ওপর আমি গেলে হোটেলের ব্যাঙের ছাতার কাবাব কে করবে শুনি?"

গুপি বলল, "হুঃ! বুনো জানোয়ারের গন্ধে হেঁচকি আসে! রান্না জানোয়ারের গন্ধে তো জিবে জল ছাড়া কিছু আসতে দেখি না!"

বলতেই নেপথ্যে নাক তুলে ছোটমামা বললেন, "এ্যাঁ! করেছে নাকি কিছু রামকানাই? যেন পাঁঠার ঘুগনি মালুম দিচ্ছে!—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এই তো তোদের পূজোর ছুটি উপভোগ করবার শেষ সময়। আসছে বছর তো পরীক্ষা সামনে থাকবে!"

ছোটমামা বললেন, ' তোরা আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলেও সেখানে আমার একটা পোজিশন আছে।"

পানু এতক্ষণ কিছু বলেনি। এবার রামকানাইকে পাঁঠার ঘুগনি বলে ফিরে এসে, জিজ্ঞাসা করল, "তুমি হোটেল চালাও, এ ব্যাপারে জড়ালে কি করে?"

চাঁদুবাবু চটে গেলেন, "আমি জড়াব না তো কে জড়াবে শুনি? আমাদের খোদ্দেরদের অর্দ্ধেক হল হিপি, সিকি ভাগ হাপ্ হিপি। ঐ বিজ্ঞাপন দেখে উল্লসিত হয়ে, পদপ্রার্থী হয়ে সব চলে যায়। কেউ ফিরে আসে না! বাড়ি থেকে টাকা এসে দিল্লীতে পড়ে থাকে। সরকার থেকে আমাদের হুড়ো দেয়। যাবি কিনা বল্ তোরা? নাকি ডেয়ার-ডেভিল শুনে ঘাবড়াচ্ছিস্? হাজার হক বাঙালী তো!! এদিকে হোটেল উঠে যাক! তোদের আর কি!"

শুনে ভয়ানক রাগ হল পানু-গুপির। ছোটমামা উঠে পড়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বললেন, "ভয় খাস্ তো থাক্। দেখি ব্ল্যাকবার্ন লেনে চাং-এর দূর সম্পর্কের কারা আছে—তারা এমন সুযোগ ছাড়বে না। কি দৃশ্য!—কি তাজা বাতাস!—রক্ত চন্‌মন্ করে!—মনে হয় পাহাড়ের খাড়া পাথরের গা বেয়ে টিক-টিকির মতো উঠে পড়ি!!—সব খরচা আমার! ফেরার পথে সিমলায় সাতদিন!!—আর টি-ভির টাকা শর্ট পড়লে বাকিটা—!!

গুপি বলল, "ব্যস্! যথেষ্ট বলেছ। কবে যেতে হবে এবার তাই বল। ভূতো আর চাং সঙ্গে থাকলে বেড়ে হত—"

ছোটমামা বললেন, "মোটেই বেড়ে হত না। বরং সব পণ্ড হত। সিমলার চারদিকে চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে সবাই ওদের চেনে। সেই একবার দেখলেও সবাই তোদের ভুলে গেছে। চেহারাও বদলে গেছে। অনেক বড় হয়ে গেছিস, চুল বড় করবি, জুল্‌পি রাখবি।—কি হল? না হয় বাড়ির লোকরা একটু গোলমাল করবে। তাই ভয় পাচ্ছিস?"

পানু বলল, "না, না, ঠিক আছে।" বাস্তবিকই ছোটমামার কথা শুনে মাঝে মাঝে গা-জ্বালা করে। তবে কথাটা ঠিক।

রামকানাইদা ছোটমামাকে খুব একটা পছন্দ করত না। বলত "খিদে পেলেই আসে বুঝি? বকনাক্কস আর কাকে বলে!" ধুক করে তিনটে ছোট প্লেট তিনটে চামচ আর এক ডোঙা পাঁঠার ঘুগনি টেবিলে নামিয়ে বলল, "রাতে তুমি ডিম-পোচ খাবে, পানুদাদা, এই বলে রাখলাম। রাজ্যের লোককে নেওতো করলে কুলোবে কেন?"

অনেক কষ্টে ওকে বিদায় করতে হল, গল্প শুনতে বড্ড ভালোবাসে। ছোট-মামা জুতো খুলে খাটের ওপর পা গুটিয়ে বসে ফোঁশ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

"এই জিনিসটা বড্ড মিস্ করি, বললে বিশ্বাস করবি না। তা তোরা বারোগ স্টেশনে নেমে পড়বি। সিমলার কেউ তোদের যেন না দেখে। সেখানেই লোক রাখব, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সমস্ত রাস্তা—হাওড়া ছাড়ার আগে থেকেই নিচু গলায় ছাড়া কথা বলবি না। আর এ বিষয়ে একটি কথা নয়। মনে করবি গাড়ি বোঝাই শত্তুরের চর। মনে রাখিস্, যাচ্ছিস্ একেবারে শত্তুরের ঘাঁটির মধ্যে।—তোদের সেই লংকার আচারটা শেষ করেছিস্ নাকি?"

পানু সেটি এনে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "হিপি সেজে পদপ্রার্থী হয়ে যাচ্ছি, একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না? হয়তো ইন্টারভিউ-ও দিতে হবে। এমনি হুট্ করে হাজির হলেই তো আর হল না।"

"তোরা কি ভাবিস আমাকে? অ্যাপ্লিকেশন পাঠানো হয়ে গেছে। ছদ্মনামে। নে, ধর কপি।" গুপি-পানুর নতুন নাম বস আর টাইগার। ব্যস্। পদবী-টদবীর বালাই নেই। হিপিরা নাকি পদবী ঘৃণা করে। জিগ্‌গেস করলে বলতে হবে আসল পরিচয় দিতে বাধা আছে। পেছনে হুলিয়া আছে। এতটুকু জানা-জানি হলে হাতে হাতকড়া। এই ধরনের লোকই ওরা চায়।

গুপি একটু সন্দেহের সঙ্গে বলল, "দিশী হিপি নেবে তো?" ছোটমামার কি হাসি, "বাঃ! তা নেবে না, যে যাচ্ছে তাকেই নিচ্ছে! বাছাবাছি করতে গেলে অত পাবে কোথায়? নাকি পাঁচ হাজার দরকার। এই রকম গুজব। যারা যায় তারা তো আর ফেরে না যে জিগ্‌গেস করব। তোদের কাজ হল যেমন করে হক, সবাই ভেতরে সেঁদোবি, সব দেখবি শুনবি, যা বলে তাই করবি, তারপর সুযোগ বুঝে কেটে পড়বি। সটাং সিমলের হোটেল। বাকি কাজ আমার। কিছু বললি, পানু?"

"তুমি কি সন্দেহ করছ, সেটা আমাদের বললে সুবিধে হত।"

"সন্দেহ করছি বে-আইনী গোপন কারখানা গোছের কিছু, যার জন্য গোপনীয়তার দরকার আর দরকার এমন সব বেপরোয়া লোক, যারা খোয়া গেলেও কারো কোনো অসুবিধা হবে না। যেমন তোরা।" এই বলে প্লেটে শেষ একটা চাটন দিয়ে ছোটমামা উঠে স্নানের ঘরে গেলেন হাত ধুতে। যাবার আগে পানুর হাতে একটা খাম দিয়েই রওনা। খামের মধ্যে তিনটে একশো টাকার নোট আর সিমলা অবধি দুটো সেকেণ্ড ক্লাস রেলের টিকিট আর রিজার্ভেশন স্লিপ। নামবে বারোগে, কিন্তু টিকিট সিমলার। একেই বলে সতর্কতা।

কোনোই অসুবিধে হল না, দু-বাড়ি থেকেই সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন পাওয়া গেল।

চাঁদুবাবু আজকাল মোটা টাকা কামায়, আগেকার কথা আর কেউ তোলে না। যাবার আগে শেষ সাতদিন ওরা চন্দননগরে নালুদার বাড়িতে কাটাল। ওরা হিপি হতে চায় শুনে নালুদা এত খুশি হয়ে গেল যে কেন হিপি হবে জিজ্ঞাসাও করলেন না।

ব্যাচেলার মানুষ, বাড়িতে ইফান বলে একটা উড়নচণ্ডে চেহারার হাফ-হিপি গোছের রাঁধবার লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না। বেড়ে রাঁধত সে। অদ্ভুত সব সামগ্রী। বলত নাকি গোসাপের মাংস, সমুদ্রের কেঁচো, ইত্যাদি। তবে সত্যি কি না কে জানে। খেতে তো পাঁঠার মতো, ভেজিটেব্‌ল্ ম্যারোর মতো। ভালোই লাগত।

খাওয়াতো আর তালিম দিতো নালুদা! চান করবি না, চুল-দাড়ি কাটবি না, কাপড় কাচবি না, এইসব। নালুদা সব বিষয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। দু সেট হিপি ড্রেস-ও বিক্রি করতে চাইছিলেন। একটা নালুদার, একটা ইফানের। এই সময়ে আরো জানা গেল ইফান মোটেই রাঁধবার লোক নয়, নালুদার বাড়িওয়ালা! সে যাই হক, গুপিরা নিজেদের পুরনো প্যান্ট শার্ট পাঞ্জাবী পরে হিপি হবে শুনে ইফান বলল, "কিন্তু গন্দক্‌টার কি হবে? ঘাট্ হিপি স্মেল্ কোথায় পাবে?"

গুপি আড়চোখে পানুর দিকে চেয়ে বলল, "নিজেরা বানিয়ে নেব। দেখছ না সাবান আনিনি।' বড় ভালো ওরা। তা হবে না, নালুদা তো ছোটমামার ফ্রেণ্ড। সমাদ্দার ইন্‌ভেস্টিগেশন্সে কাজ করার সময় একবার সাত দিন সাত রাত নালুদাকে 'শ্যাডো' করেছিলেন ছোটমামা। সেই সময়ই ইফানের সঙ্গে আলাপ। গোয়া-টোয়ার দিকে বাড়ি। পূর্বপুরুষরা বোম্বেটে ছিল। বেপরোয়া রক্ত। শুনে ওদের ভক্তি হয়। ইফান সঙ্গে গেলে বেশ হত।

কথাটা তুলতেই ইফান শিউরে উঠল। জিব কেটে বলল, "মাই গড্! ছোটকত্তা তাহলে আমাকে ফালা করে ছিঁড়ে ফেলবে। আমরা হলাম গিয়ে মার্ক্‌ড্‌মেন্। তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে একা যাওয়া দরকার। খালি হাতে কোনো জিনিস ছোঁবে না। স্মৃতির দস্তানা পরবে।

শুনে নালুদা বেশ বিরক্ত হলেন। "আহা, কি যে বল ইফান, যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে! ওদের আঙুলের ছাপ পড়লেই বা কি? ওদের প্রিণ্টের তো আর কোনো রেকর্ড নেই।"

ইফান মহা অপ্রস্তুত, "তা বটে! তা বটে! ঐ সব শাকরেদদের তালিম

দিয়ে দিয়ে সব কেমন গুলিয়ে যায়। এরা চ্যাণ্ড সায়েবের রলেশন। কিন্তু এমনি চেহারা পাকিয়েছে যে—"

নালুদা ক্ষেপে গেলেন। "তুমি বড্ড বেশি কথা বল, ইফান, তাই তোমার কিছু হল না"—"কিন্তু কেমন রাঁধি সেটাও বল, মাস্টার। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু ধর তোমার একটা ভালোমন্দ কিছু হয়েই গেল। তখন আমি নেহাৎই জলে পড়ব না। চ্যাণ্ডের হোটেল আমাকে লুপে নেবে। এ-ও আমি বলে দিলাম। তোমাদের মতো এক-বল্লা নই আমি—"

গুপি-পানু এ-সব কথা হাঁ করে গিলছিল। দুঃখের বিষয় নালুদা কাটা-তামাকের গন্ধ-লাগা হাতে ইফানের মুখ চেপে ধরাতে, খানিকটা ইম্‌ম্‌ম্‌-পিম্‌ম্‌ম্‌ মতো শব্দ করে ইফান চুপ করে গেল। নালুদা মুখ ছেড়ে দিয়ে বলল, "রেগো না, মাস্টার। তুমি যা বল তাই হবে।"

"বেশ, আমি বলি তুমি হিপি-বিদ্যে-ছাড়া একটি কথা বলবে না। তোমার ঐ জিব-লক্‌-লকের জন্য শেষটা আমার ব্যবসা উঠে যাক আর কি! এদের তালিম দেওয়ার কিছু বাকি রাখেনি চ্যাণ্ড। তুমিও হিপি-জ্ঞান যথেষ্ট দিয়েছো। ওদের আর এখানে রাখতে ভয় করে। এবার ওরা রওনা দিক। কাল ভি-ডে। সিলিকন অভিযান শুরু।" এই বলে দু-হাত ঝেড়ে হাসি-হাসি মুখ করে নালুদা গুপি-পানুর দিকে তাকালেন। ওরাও এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এত যত্ন, এত শিক্ষার তো একটা দাম দেওয়া উচিত। এদিকে ট্যাঁক গড়ের মাঠ। ছোটমামা এখানে পৌঁছে দেবার সময় পকেট চেঁচেপুঁছে সব বের করে নিয়ে বলে-ছিলেন, "ডেড্‌বডি সনাক্ত করার কোনো উপায় রাখতে হয় না, বুঝলি না। তাছাড়া হিপিদের দেশ থেকে টাকা আসার দুদিনের মধ্যে সব কপর্দকশূন্য হয়ে যায়। বেশি টাকা থাকা প্রকৃত হিপি ধর্ম নয়। তবে হ্যাঁ, অয়লিং-এর জন্য ও-টুকু থাক।" নালুদা বললেন, "ও আবার কি হল? আমাদের কিচ্ছু দিতে হবে না। যা দেবার চ্যাণ্ড দিয়ে গেছে। ইফানকেও। ওকেও কিচ্ছু দেবে না।"

ইফান বলল, "সিলিকন আবার কি, মাস্টার? পেলিক্যান তো জানি। আরে ছ্যা ছ্যা! খেইছিলাম একবার রোস্ট করে। কি বিটকেল গন্ধ রে বাবা! দেখ বাবা বস্‌, বাবা টাইগার, তোমাদের আসল নাম যাই হক, তোমাদের মতো ভালো ছেলে দেখার আমার সৌভাগ্য হয়নি। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না, তোমাদের ঘরে খাটের নিচে আমার ভাঙা বাক্সের ঝুটো তামাকগুলো—"

নালুদা ভীষণ রেগে বললেন, "চোপ্‌!" তারপর ইফানকে বাড়িতে রেখে,

নিজেই ওদের তিন-থাকওয়ালা কামরায় তুলে দিয়ে এলেন। খাবারদাবার জলের বোতল কিচ্ছু দিলেন না। ওরা একটু ক্ষুণ্ণ হল। ট্রেনে উঠলেই খিদে পায়। কিন্তু গাড়ি ছাড়বার সময় দুজনের হাতে দুমুঠো রেজকি টাকা, আধুলি, দশ পয়সা ইত্যাদি গুঁজে দিলেন। বললেন, "নিশ্চয় খিদে পাবে। সব হিপিদের মতো কিনে খাবে। প্ল্যাটফর্মের কলের জল খাবে। তেমন তেমন হলে ট্রেনের বাথরুমের কলের জলও খেতে পার। হিপিরা জলখেয়ে মরে না। আচ্ছা, চলি। খুব সাবধানে এগোবে।"

কি জানি কেন হিপিগিরি ভুলে দুজনে ঢিপ-ঢিপ করে দুটো প্রণাম ঠুকে দিল। নালুদার মুখটা বদলে গেল। একসঙ্গে দুজনকে বুকে জড়াবার চেষ্টা করে বললেন, "ছি ছি। ইয়ে, না বাবা! আমি একটা—আচ্ছা, দুগগা দুগগা!" বলে নেমেই এক রকম দৌড়। ওরা তো হাঁ। পানু একটু পরে বলল, "হয়তো নিজের বাড়ি-ঘরের জন্য মন কেমন করে।"

গাড়ি ভরা লোক। সাধারণ লোক। হিপিটিপি দেখা গেল না। গুপি অন্য কথা ভাবছিল, "সিলিকন! রং নেই, কিন্তু ভীষণ শক্ত, সিলিকায় থাকে। কিন্তু অভাবনীয় ক্ষমতা। ঐ দিয়ে যন্ত্রমানুষ তৈরির সমস্যা মিটে যেতে পারে!" গুপির বার্থ ওপরে, পানুর নিচে। পাশাপাশি দুজনে বসে ট্রেন-ছাড়া উপভোগ করছিল। খানিকটা ছুটোছুটি চ্যাঁচামেচি, তার পরেই সব চুপ। স্টেশনের আলো পেছনে পড়ে রইল, আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নতুন স্টেশন! অনেক পর খানিকটা নিরিবিলি পাওয়া গেল।

"এই টাইগার, বল্ না সেই বইটাতে কি ছিল?" "কোন বই?" "আরে, সেই যে যন্ত্রমানুষের বিষয়। কি অদ্ভুত যে মেশিন তৈরি করে মানুষ আর সে মেশিন মানুষের সব কাজ করতে পারে! হয়তো মানুষ যা পারে না, তাও পারে।"

"না পারে না। রোবোর পেটে মানুষ যেটুকু জ্ঞান-বিদ্যে ভরে দেয়, তার বেশি কোনো ক্ষমতা নেই রোবোর। তবে কি না—"

গুপি উত্তেজিত হয়ে বলল, "পারে, পারে! অনেক সময় রোবোদের পেটে এমন সব ক্ষমতা গজায়, যা তাদের সৃষ্টিকারদের নেই। এই বিষয় একটা চমৎকার নভেল পড়েছি। দি মেশিন! কম্পিউটারগুলোকে তো দেখেই যন্ত্র বলে চেনা যায়। আগেকার নিয়মে তৈরি রোবোগুলোও বিকট যন্ত্রদানবের মতো। কিন্তু ঐ বইতে আছে যে নতুন রোবো হবে ঠিক মানুষের মতো দেখতে। ফোম-

রবারের গা। মানুষের মতো বুদ্ধি, অনুভূতি, সব। আপনা থেকে নানা রকম শক্তি গজাল রোবোর মাথায়। ভারি দুঃখের গল্প, ভাই। একজনকে ভালোবাসল রোবোটা। সে মেয়ে জানেও না লোকটা আসলে রোবো। একটা নকল মানুষের সঙ্গে তো আর সত্যি মানুষের বিয়ে হতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত চাঁদনি রাতে মেয়েটির কাছে বিদায় নিয়ে, চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ট্রেনটা চলে গেল।

মেয়েটি পাগলের মতো ছুটে এসে তার ভালোবাসার মানুষটির ভাঙা শরীর খুঁজতে লাগল। কতকগুলো তালগোল পাকানো রবার আর স্টেন্‌লেস্ স্টীল আর নাট-বল্টু আর যন্ত্রপাতি ছাড়া কিচ্ছু দেখতে না পেয়ে ভাবল, এ নিশ্চয় কারো ভাঙা গাড়িটাড়ির অংশ। সে লোকটি নিশ্চয় তার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে! স্রেফ্ হেদিয়ে মরে গেল মেয়েটা!"

পানু মাথা নাড়ল, "তা হয় না। মৌলিক কোনো নতুন ক্ষমতা গজায় না। তবে জানা বিদ্যে থেকে মানুষ যেটুকু বুঝতে পারে কম্পিউটার তার শতগুণ বেশি পারে। জ্ঞানগুলো মানুষই পুরে দেয়, কিন্তু কম্পিউটার সেই জ্ঞানটাকে অনেক বেশি কাজে লাগায়। বুঝলি না, আমাদের ব্রেনে অনেকগুলো অন্ধকার কুঠরি আছে। তার মধ্যে কি আছে, কি হতে পারে, নিজেরাই জানি না। কম্পিউটারের মাথার মধ্যে সবটাই আলোকিত।"

ও-পাশের বার্থে একটা চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে বসে লুচি আলুর দম খাচ্ছিল এবং কান খাড়া করে এদের কথা শুনছিল। সে হঠাৎ বলল, "তাই নাকি, স্যার? আপনি নিশ্চয় সায়েন্টিস্ট!" চট্ করে ছোটমামার সতর্কবাণী মনে পড়াতে, কট্ করে পানুর মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

গুপি ছেলেটাকে বলল, "অচেনা লোকের সঙ্গে রেলগাড়িতে কক্ষনো কথা বলতে হয় না, তাও জান না। আমরা সায়েন্টিস্ট না। আমরা ভবঘুরে।" তাতে ছেলেটার বোধ হয় কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। কিন্তু গম্ভীর মুখ করে গুপি নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখতেই, সে শালপাতাটা সীটের তলায় ফেলে, জল না খেয়ে, হাতমুখ না ধুয়ে, আঙুল চেটে, চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

গুপি-পানুও শোবার যোগাড় করতে লাগল। ছেলেটার সামনে এত কথা বলাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। তবে নেহাৎ ছোট। ওদের হাঁটুর বয়সী হবে। সেই নেপোর ব্যাপারটার সময় ওদের যে বয়স ছিল। তখন চাঁদে যাওয়া নিয়ে ওদের কি রোমাঞ্চ! এখন ভাবলেও হাসি পায়। তার পরেই গেল তো

আমেরিকানরা চাঁদে ! কি এমন জানতে পারল, যা গুপি-পানু পৃথিবীতে বসেই ভাবতে পারেনি ? বরং আগে ঢের বেশি রোমাঞ্চময় ব্যাপার কল্পনা করেছিল ওরা। কত সম্ভাবনার কথা। এই ছেলেটাও নিশ্চয় 'রোবো' বলতে অজ্ঞান।

হাই উঠতে লাগল পানুর। ট্রেনটা বেশ একটু একটু দোলা দিচ্ছিল। চোখ বুজে আসছিল। কিন্তু—কিন্তু—রোবোর ব্যাপারটা সত্যিই যথেষ্ট রোমাঞ্চকর। মানুষরা যে বিদ্যা ভরে দেয়, তাই কাজে লাগিয়ে ওদের পক্ষে অভাবনীয় কাজ করা আশ্চর্য নয়। যদি কেউ হাজার হাজার কারিগর কাজে লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ রোবো তৈরি করে, তাহলে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দিতে পারবে। তাই এত বেপরোয়া বেওয়ারিশ হিপি সংগ্রহ করা !!

আরেকটা হাই তুলেই চট্ করে ঘুমটা ছুটে গেল। বেওয়ারিশ নয় সবাই। সেটাই ভাবনার বিষয়। ওদের সঙ্গে চাং-এর মামাতো ভাই আছে। তাকে হিপি সাজাতে বেশি কষ্ট করতে হয়নি। এমনিতেই যথেষ্ট হিপি-প্যাটার্নের ছিল, একটু তালিম দিতেই পুরো হিপি বনে গেল। তিন মাস আগে তাকে আরো গোটা চারেক হিপির সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল। যথেষ্ট তুতিয়ে বাতিয়ে যুযুৎসু শিখিয়ে। অথচ তারো কোনো পাত্তা নেই। পনেরো দিনে ফিরে আসার কথা। তার মা-টি হোটেলের পাকা রাঁধিয়েদের একজন। তিনি কাজকম্ম শিকেয় তুলে শয্যা নিয়েছেন আর বুদ্ধিটা ছোটমামার মাথা থেকে বেরিয়েছিল বলে উদয়াস্ত তাঁকে যা-নয়—তাই বলছেন।

অসময় ছোটমামার পয়সা খরচ করে, প্লেনে চেপে কলকাতায় আসা সে-ও একটা কারণ। ফিরে যাবার আগের দিন এ-কথা তিনি স্বীকার করে গেছেন। ইয়ে—এইখানে ঘুমিয়ে পড়াতে পানুর দুশ্চিন্তায় ছেদ পড়েছিল।

ঘুম ভাঙল সেই ভোরে, কাশী পৌঁছে। ছেলেটা পথের মধ্যেই কোথাও নেমে গেছিল, তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। বেজায় খিদে পেয়েছিল। প্ল্যাট-ফর্ম-এর মেলা ভ্রাম্যমাণ ভেণ্ডরদের একজনের কাছ থেকে প্রচুর পুরী ভাজিয়া আর লাড্ডু কিনে আর কল থেকে বোতলে জল ভরে, বেশ ভোজন করা গেল।

তারপর সারাদিন মুখে তালা-চাবি। কত রকম লোক যে উঠে গাদাগাদি করে বসল তার ঠিক নেই। তাদের সামনে কোনো কথাই বলা যায় না। সন্ধে-বেলায় দিল্লী। সেখানে অর্ধেক লোক নেমে গেল। ঘণ্টা দেড়েক সময় হাতে ছিল, লট্‌বহর বলতে নিজেরা যা বইতে পারে। একটা অস্বস্তির বিষয় হল যে চারদিকে হিপি-হিপিনী কিলবিল করছিল। সুখের বিষয় তারা নিজেদের দল ছাড়া

কারো সঙ্গে কথাটথা বলছিল না। এক ফাঁকে ওরা একটা নিরামিষ ভোজনালয়ে গিয়ে পেট পুরে খেয়ে, গাড়িতে ফিরে এসে দেখে ওদের জায়গা বে-দখল হয়ে গেছে। তবে অন্য জায়গাও ছিল। কিন্তু দু-জনকে দু-জায়গায় শুতে হল। এক দিক দিয়ে ভালোই হল, কেউ কোনো বেখাপ্পা কথা বলতে পারল না।

সকাল হল কাল্‌কায়। সে কি হুড়োহুড়ি। ছোট গাড়ি পাহাড় চড়ে চার ভাগ হয়ে। হুটোপাটি, খোঁজাখুঁজি। শেষ পর্যন্ত জায়গা মিলল, ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি করে। কিন্তু একটা বেয়ারা ট্রে-বোঝাই চা, টোস্ট, দুটো করে ডিম ভাজা, মাখন, জ্যাম দিয়ে গেল। সে-রকম দাম-ও নয়। নালুদার জন্যেই এ-সব সম্ভব হল। নাহলে ছোটমামা তো তিনটে একশো টাকার নোট দিয়েই খালাস! আবার বলে দিলেন, "মোজার মধ্যে ভরে রাখিস। অবস্থা সঙ্গীন না হলে বের করবি না। দাগ দেওয়া নোট! মার্কড্ নোটস। ঐ দিয়ে দুষ্কৃতকারীদের কারবার ট্রেস্ করা হয়।"

বারোগ।

পাহাড়ের বুকে মুখ গুঁজে রয়েছে ক্ষুদে দোতলা স্টেশন। এখানে সবাই খেয়ে নেয়। সিমলা পৌঁছতে বেলা হয়ে যায়, তখন খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হয়। এইখানে নামতে হবে। এ-সব জায়গা ওদের চেনা। এমন চমৎকার দৃশ্য কম দেখা যায়। আরো ওপরে আরো সুন্দর। একশোর বেশি টানেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামতে হল।

এখানে ছোটমামার লোক থাকার কথা। কিন্তু তাদের টিকির দেখা পাওয়া গেল না। দেখতে দেখতে স্টেশনের বাইরেটা ভোঁ-ভোঁ! ছদ্মবেশ পরা এমন কাউকে পর্যন্ত দেখা গেল না, যাকে ছোটমামার চর বলে সন্দেহ করা যায়। অস্বস্তির সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে একটা মোড়ের কাছে এসে দেখে গাছের গায়ে কাঠ-কয়লা দিয়ে বাংলায় ছোট্ট করে লেখা 'বস্'। আর বলতে হল না। পথের হদিশ পাওয়া গেল।

আরেকটু এগিয়ে ওদের শিরার রক্ত হিম! গাছের মগ্‌ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে দুটো কি যেন, প্রথমে মনে হল বুঝি মানুষ। কিন্তু ঠিক মানুষ না। নড়া-চড়া কেমন যেন অদ্ভুত। মুখগুলো যেন বড্ড সাদা। এক নিমেষ দেখা গেল, তারপরেই নেই। কোথা দিয়ে কি ভাবে পালাল বোঝা গেল না।

আরো খানিকটা হাঁটতেই লোকালয়ের বাইরে পৌঁছে গেল। সেইখানে দুজন সাহেবী পোষাক পরা লোক ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ওদের দেখে

খুব সাদর অভ্যর্থনা জানাল। বলা বাহুল্য কথাবার্তা সব ইংরিজিতে হল। তবে একজনকে মনে হল মধ্য-ইউরোপীয় কি আর্মিনিয়ান আর অন্যজন উত্তর ভারতীয়। দু' জনেই চোস্ত কায়দাদুরস্ত, চালাক-চতুর, কইয়ে-বলিয়ে। এবং বেজায় ধূর্ত। ব্যবহারে কোনো খুঁৎ নেই। একবারমাত্র নাম জিজ্ঞাসা করল, ছোটমামার লেখা চিরকুটে সব লেখা ছিল। পেছনে কি একটা রবার-স্ট্যাম্প লাগানো ছিল, পড়া যাচ্ছিল না। তবু তাতেই এরা সন্তুষ্ট। মনে হল রবার স্ট্যাম্পটা একটা সংকেত।

বলল, "এবার একটু পা চালাতে হবে। দুটোর পর আর লাঞ্চ দেবে না।" "দু-রাত, দেড়-দিন রেলগাড়িতে যাওয়া কি চাট্টিখানিক কথা। হাতে-পায়ে খিল ধরার যোগাড়। পা চালাতে ওরা খুব রাজি।

কেমন বুনো জায়গা। দুটো পাহাড়ের মধ্যিখানে একটা খাঁজ। একটু দূরে আরেকটা পাহাড়, তার সামনে এবড়ো-খেবড়ো বিশাল পাথরের স্তূপ। ভয়াবহ তার চেহারা। আরেকটু এগিয়ে বোঝা গেল যে নেহাৎ পাথরের স্তূপ নয়। বোধ হয় একটা অদ্ভুত কেল্লা। পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে এমন মিলেমিশে আছে যে হঠাৎ বোঝা যায় না। চারদিকে তিনতলার সমান পাঁচিল। পাঁচিলের গা দিয়েই খাড়াই নেমেছে। কোথাও ঢুকবার বেরোবার রাস্তা দেখা যাচ্ছে না।

পাঁচিলের নিচে খাড়াই, খাড়াইয়ের নিচে খোঁচা খোঁচা পাথরের মাথা। তার ওপর পড়লেই তো হয়ে গেল! এ-কথা মনে হতেই, পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে ওদের চক্ষুস্থির! পাঁচিলের ওপর অনেকগুলো লোক। হঠাৎ আরো কটা লোক পেছন থেকে এসে তাদের ঠেলে নিচে ফেলে দিল! গুপি পানু থমকে থেমে গেল। গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। সঙ্গের লোক দুটোর মুখে হাসি দেখে, হঠাৎ ব্যাপারটা বোঝা গেল। এরা সব রোবো! নিচের পাথরের ওপর পড়েই, আবার লাফিয়ে উঠে, বেয়ে বেয়ে খাড়াই চড়তে লাগল। রোবো! ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে!! মানুষ হলে আর দেখতে হত না।

কিন্তু—রোবোদের ঠেলে ফেলে দিতে হচ্ছে কেন? ঘাবড়াচ্ছে? কলের মানুষ কি ঘাবড়ায়? পানুর বইতে ছিল মানুষের সমান কাজ করতে পারে, আরো বেশি গায়ের জোর, আরো দক্ষ কাজ, কোনো মানসিক দুর্বলতা নেই, কোনো আবেগ নেই, ভয়-ভাবনা রাগ-দুঃখ-হিংসা-ভালোবাসা কিচ্ছু নেই; কোন অনুভূতি নেই, শ্রান্তি, ক্লান্তি খিদে তেষ্টা কিছু নেই। এমন যন্ত্র যাদের যে কোনো দুঃসাহসিক কাজে লাগাতে পারলে তাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। রসদ লাগবে না; পোশাকপরিচ্ছদ, বিছানা-তাঁবু, চিঠিপত্র ওষুধ, চিকিৎসা সরবরাহের কোনো ঝামেলা থাকবে না!

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। ফিরে দেখে লোক দুটি চোখ ছোট ছোট করে ওদের দিকে চেয়ে আছে। হাসিটা কেমন অদ্ভুত লাগল। পানু জিজ্ঞাসা করল, "রোবো? তাই না?" সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুখ থেকে অদ্ভুত ভাবটা মুছে গেল। স্বাভাবিক গলায় সাহেব বলল, "বুঝতেই পারছ, মাউন্টেন এঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজ রোবো দিয়ে করালে, অনেক মূল্যবান প্রাণ বেঁচে যাবে। ভিন্ন গ্রহে গিয়ে প্রাথমিক পরিশ্রমের কাজ-ও এরা অনায়াসে করতে শিখে যায়। এর অনেক সম্ভাবনা। তাই আমাদের বেপরোয়া লোক দরকার। একেকটি রোবোর জন্য একেকটি লোক লাগে, অনেক সার্ভিসিং দরকার হয়। যন্ত্র নিখুঁৎ হওয়া চাই। তোমাদেরো সেই কাজ-ই শিখতে হবে।"

এইসব ইন্টারেস্টিং কথা বলতে বলতে ওদের ওরা আরো অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সাহেব বলল, "এইখানে একটু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।" এই বলে দুটো কালো ফাট্টা বের করে ওদের চোখ বেঁধে দিল। ওরা বেশ ঘাবড়েই যেত, যদি না কানের কাছে অন্য পুঙ্গবটি নরম গলায় বলত, "নিরাপত্তার জন্য আমার গ্রেট্-গ্র্যাণ্ডফাদার গোপন প্রবেশ-পথ তৈরি করেছিলেন। সে পথ খুঁজে বের করা যেমন শক্ত, প্রতিরক্ষা করা তেমনি সহজ। কারণ একজন একজন করে ঢুকতে হয়, এত সরু পথ।"

বাস্তবিক তাই। কোনো কোনো জায়গায় প্রায় কোলপাঁজা করে তুলে, অতি দুর্গম পাথুরে পথ দিয়ে গিয়ে, ওরা এক ভয়াবহ সুড়ঙ্গে ঢুকল। সেটি পার হতে পুরো কুড়ি মিনিট মতো লাগল। তারপর কয়েক ধাপ সিঁড়ি ওঠা। আর তারপরেই মুখে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। কে যেন ওদের চোখের ফাট্টা খুলে দিল।

ওরা কেল্লার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে। যেটাকে দূর থেকে পাঁচিল মনে হচ্ছিল, সেটাই আসলে কেল্লার দেয়াল। নাকি পনেরো ফুট পুরু পাথর দিয়ে তৈরি। অভেদ্য, কামানের গোলা ঠিকরে পড়ে। দুঃখের বিষয় শক্তি দিয়ে গ্রেট্-গ্র্যাণ্ড-ফাদার ব্রিটিশদের রুখতে পারেননি, তারা চাতুরি দিয়ে অনায়াসে তাঁকে পরাজিত করে, বর্মায় নির্বাসন দিয়েছিল।"

গুপি-পানুর কৌতূহল দেখে কে। "কি রকম চাতুরি?" লোকটি কাষ্ঠ হাসল, "সে যদি তোমাদের মতো বহিরাগতদের বলি, কেল্লাটার কোনো নিরাপত্তা থাকবে না।—ও কথা থাক, ফ্রেণ্ড বস্, ফ্রেণ্ড টাইগার। এখন চল হাত-মুখ ধুয়ে লাঞ্চ খাওয়া যাক।"

গুপি বলল, "হাত-মুখ আমরা ধুই না। তবে খিদে পেয়েছে বলতে বাধা নেই। কিন্তু আপনাদের কি বলে ডাকব?" "ডাকবার খুব একটা দরকার হবে না। তবে এখানে ডাক নামেরই চল। তোমরা যেমন বস্ আর টাইগার। সেই একই কারণে সাহেব হলেন 'গোবি', মরুভূমির মতো নীরস। আর আমি হলাম 'কবি'। আমি কবিতা লিখি। সে এমনি আধুনিক যে তার মানে অন্য লোকে তো বুঝতেই পারে না, আমি নিজেও অনেক সময় পারি না। সে কথা থাক—"

পানু চালাক ছেলে, "না, থাকবে কেন, একদিন শোনাতেই হবে।" লোকটি বেজায় খুশি হয়ে গেল।

ওরা ভেবেছিল মস্ত হল ঘরে খাওয়াদাওয়া হবে। কেল্লার অন্য বাসিন্দাদের দেখতে পাবে, সেই হারানো হিপির দল। তা কিন্তু হল না। ওদের একটা ছোট কুঠরিতে জায়গা দেওয়া হল। নেয়ারের দুটো খাট, দুটি নেয়ারের চেয়ার, একটা ছোট টেবিল। দেয়ালে একটা বড় তাক। ব্যস্ আর কিছু নয়। ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে কবি বলল, "বস তোমরা। এখানে বিজলি নেই বলে কোনো কষ্ট হবে না আশা করি। ইচ্ছে করে জেনারেটর শুধু কারখানার কাজে লাগানো হয়। নাহলে দূর থেকে আলো দেখা যাবে। নিরাপত্তা নষ্ট হবে। বাইরের দিকে তাই জানলাও নেই। সব জানলা ভেতর দিকে। সুন্দর বাগান আছে আমাদের কেল্লার মধ্যিখানে। রোবোদের তৈরি। রাতে ঘেরাটোপ দিয়ে লণ্ঠন। গ্রেট-গ্র্যাণ্ডফাদারের সময় সূর্যের সঙ্গে ঘুমোনো জাগা হত। আলোর সমস্যা ছিল না। আর সারা বছর এখানে না-শীত না-গরম। স্বর্গে ছাড়া এমন জায়গা নেই। আশা করি সেফ্‌টির জন্য একটু অসুবিধা তোমরা স্বীকার করবে।" ওরা বলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

পরে পানু জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু স্বাধীন দেশে আবার অত নিরাপত্তার কি কথা উঠছে?"

"বাঃ! তাও জান না। শিল্পের ক্ষেত্রে ছেঁড়াছিঁড়ি কামড়া-কামড়ির কথা তো বিশ্ববিদিত! প্রতিযোগীরা যেই শুনবে আমাদের রোবো কারখানা থেকে কত লাভ হবে। অমনি নেকড়ে বাঘের মতো ছেঁকে ধরবে। এত ভালো রোবো তৈরি করতে তো আর পারবে না, কিন্তু নষ্ট করতে পারবে। ঐ যে তোমাদের খাবার এল। তারপর আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব।"

পানু বলল, "একটা কথা। দেখলাম তো রোবোদের অদ্ভুত ক্ষমতা। কেউ

একজন ডিজাইন করে নিশ্চয়? কি আশ্চর্য মাথা তার! তাঁকে দেখা যায় না?"

"দেখা তো হয়েই গেছে। তার নাম গোবি।" টাকা যোগাই আমি, বুদ্ধি যোগায় গোবি! রাশি রাশি টাকার বদলে!!" এই বলে রাগতভাবে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বোঝা গেল গোবির ওপর খুব প্রসন্ন নয়।

যে খাবার এনেছিল সে টেবিলের ওপর মোটা মোটা রুটি, মাংসের কাবাব; আপেলের মতো বড় বড় পাকা টোমাটো; কাঁচা পেঁয়াজের আর শশার কুচি; লাল লাল কাঁচা লংকা আর এক বাটি করে ঘন দুধ নামিয়ে রেখে, ওদের দিকে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে রইল।

চাং!! চাং? না, চাং তো নয়। এ অনেক গাঁট্টাগোট্টা। তাহলে চাং-এর আত্মীয় টেং ছাড়া আর কেউ নয়। গুপি কি বলতে যাচ্ছিল, টেং নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে, খাটের নিচে দেখিয়ে দিল। আর বলতে হল না।

পানু হাতরে দেখে, একটা তাকের মতো, তার ওপর একটা ছোট্ট কিন্তু জোরালো বিদেশী রেকর্ডার ঘুরছে। অমনি টেং ইংরিজিতে বলল, "আশা করি এতেই হবে।" "খুব হবে, থ্যাংক্ ইউ।" বলেই রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিয়ে গুপি রেগেমেগে বলল, "তুমি কি রকম ছেলে, টেং? একেবারে নিখোঁজ হলে! ওদিকে বুড়ো মা বিছানা নিয়েছেন। চ্যাঙ কলকাতায় গিয়ে হাজির! ছি ছি!"

টেং ভয়ে ভয়ে চারদিকে চেয়ে বলল, "বন্দী হয়ে আছি। সারাক্ষণ চোখ রাখে।" এই বলেই বেরিয়ে গেল। ওরা রেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারল। বলা বাহুল্য খাবার সময় স্বাভাবিক হাসি-গল্প হয়েছিল। বাসন নিতে এল একটা রোবো।

কাছে থেকে দেখে আঁৎকে উঠল গুপি-পানু। অবিকল মানুষের মতো! খালি মুখে কোনো ভাব নেই। বোধ হয় আগাগোড়া ফোম্-রবার দিয়ে মোড়া। ভারি আর কাঠ কাঠ চলাফেরা। সাধারণ মানুষের চেয়ে মাথায় লম্বা! হাতের লোমগুলো পর্যন্ত নিখুঁৎভাবে তৈরি। চোখ দুটি নড়ছে-চড়ছে। ঠোঁট নড়ছে। এত চমৎকার রোবো হয়, ওদের জানা ছিল না। তার বুকে একটা নম্বর লেখা, ১১। তাই দিয়ে বোধ হয় চিনতে হয়! রোবোর আবার নামধাম কি! বাসন নিয়ে সে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে কবি এসে ওদের কেল্লা ঘুরিয়ে দেখাল। তবে মাটির তলাকার কারখানা-ঘরে নিয়ে গেল না। বলল, "আজ আর নিচে গিয়ে কাজ

নেই। যে কারণেই হক রোবোরা একটু উত্তেজিত হয়ে আছে। সিলিকনের ব্যাপার, বুঝলে না। কোথায় কিসের প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তাই ওদের একটা বড় দলকে নিচের ঘরে গ্রাউণ্ড করে ফেলা হয়েছে। সারি সারি মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে সবটা বুঝি না আমি, এ-সব হল গোবির এলাকা। কিছু একটা ভুলভাল করে থাকবে। আমাকে সুদ্ধ নিচে যেতে দেয় না। কিছু বললে রেগে যায়। অথচ এর মধ্যে লাখ-লাখ টাকা ঢেলেছি।—যাক গে, চলি গোয়ালটা দেখিয়ে আনি। ক্যায়সা দুধ হয় তাই বল!"

গোয়াল দেখে গুপি-পানু হাঁ। এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাদা গোরু। নাকি দশ পুরুষের বংশধর। যেমন নধর শরীর, তেমনি সুন্দর দেখতে। একটা দুটো নয়, গোটা সত্তর আশীটা হবে।

"চরে কোথায়?" কবি হাসল। গর্বে ওর ছাতি ফুলে উঠল। "সব ব্যবস্থা করেছিলেন আমার পূর্বপুরুষরা। গোয়ালের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ আছে, নিচের উপত্যকা পর্যন্ত। সব আমাদের জমি। সেখানে চরে। সেখানেও গোয়াল আছে। মস্ত বড় দুধ-ঘিয়ের ব্যবসা আমাদের। পাঁচশোটা মস্ত মস্ত মোষ আছে। সুড়ঙ্গ দিয়ে উপত্যকায় যাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ভাবি, এই রোবো-কারখানাটার বড় বেশি ঝামেলা—ও কি?"

এই বলে কবি দৌড়ল। নিচে থেকে কেমন একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, একটা রাগের গোঁ গোঁ শব্দ। ওরাও ধাপুড়ধুপুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয় শ-তিনেক নিখোঁজ হিপির একটাকেও দেখা গেল না। কি যেন বলেছিল কবি, যত রোবো তত হিপি। এ তো এক মহা রহস্যজনক ব্যাপার। কথা বললেই পাথরের দেয়ালে গুম্‌গুম্ করে প্রতিধ্বনি হয়। হিপিরাই নিশ্চয় বিক্ষোভ করছে। রোবোদের কি আর বিক্ষোভ শেখানো হয়?

তারপরেই একটা চ্যাঁচামেচি, রাগারাগি শোনা গেল। সিঁড়ির বাঁক ঘুরেই চক্ষুস্থির। মুখ লাল করে রিভলভার হাতে গোবি দাঁড়িয়ে, নিচে যাবার পথ আগলাচ্ছে। তার সামনে দুহাত মাথার ওপর তুলে টেং। দাঁতে দাঁত ঘষটে গোবি বলল, "ট্রেটর! বিশ্বাসঘাতক! তুমিই ওদের খেপিয়েছ। এত দিন তো কেউ কোনো কথা বলেনি। যে মুহূর্তে তোমার ফ্রেণ্ডরা এল, অমনি রিবেলিয়ন! এর একটাই মানে হতে পারে। ওরা তোমাদের দলের লোক। নইলে ওদের এত সাহস হয়, ছুঁচো কোথাকার। তোমার মুনিব যে কবি তাও মানি। এখনো সে পূর্ব-পুরুষদের মহিমার স্বপ্ন দেখে।"

এই বলে টেং-এর মুখে রিভলবারের বাঁট দিয়ে এক বাড়ি। তার পরের ঘটনাগুলো ভীষণ তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। আশ্চর্যের বিষয় উত্তেজনার চোটে গুপি পানুকে কেউ লক্ষ্য করেনি। ওরাও বুদ্ধি করে পিছু হটে সিঁড়ির বাঁকের আড়ালে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল। বাড়ি খেয়ে হাত-পা এলিয়ে, টেং পানু-গুপির পায়ের কাছে এলিয়ে পড়ল। আর কবিও এক লাফে গোবির হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রিভলভারটাও ছিটকে গুপিদের পায়ের কাছে পড়ল। তার-পরেই কবি গোবি গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

টেংএর বোধ হয় ফিরে জ্ঞান এসেছিল। হঠাৎ সে গোবি সাহেবের ঠ্যাং চেপে ধরে বলল "গুপি, পানু! ধর একে!" গুপি-পানুকে আর দুবার বলতে হল না। দুজনে মিলে সাহেবের ঠ্যাং ধরে টেনে পাঁচ-ছটা সিঁড়ি ওপরে নিয়ে এল। তারপর টেং যে কি করল তা বোঝা গেল না। দেয়াল থেকে একটা দরজা বেরিয়ে এসে, নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আর টেং-ও হয় রিভলভারের বাড়িব ফলে, নয় উত্তেজনার চোটে, দিব্যি হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

তখন গুপি পানুর সম্বিৎ ফিরে এল। দু-পাশে সারি সারি ঘর, দুজনাকে দু-ঘরে পুরে, বাইরে থেকে শিকলি তুলে, প্রথমটা খানিক হাঁপিয়ে নিল। তারপর গোয়াল-ঘরের পাশের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নিচের উপত্যকায় পৌঁছল। মাঝে গোটা দুই লোহার দরজা পড়েছিল, সে খোলা খুব শক্ত হল না।

নিচে একটু দূরেই গয়লা-পট্টি। সেখানে দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করে, বারোগ স্টেশন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সিমলায় ছোটমামাকে টেলিফোন। ফোন করে তাঁকে পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে বেরিয়ে যাকে দেখল, তাতে ওদের চক্ষু চড়কগাছ ইফান! ফিটফাট সাধারণ ড্রেসে ইফান এবং তার পাশে জন বারো সশস্ত্র পুলিস। সব কথা শুনে, ইফান বলল, "তোমরা সিমলা চলে যাও। এটা জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপার। এখান থেকে আমরা টেক্-আপ করছি। ভাবনা নেই, এদিকের ঝামেলা মিটিয়ে আমরাও আসছি।"

বারোগ থেকে সিমলা ছোটমামাদের হোটেলের আরাম। সমস্ত বিবরণী শুনে ছোটমামা বললেন, "বাঃ! বেড়ে কাজ করেছিস তোরা। আমাদের একটা খটকা ছিল সেটাও এবার মিটল। টেং তো কোনো খবরই দিতে পারে নি।"

গুপি বলল, "কিন্তু টেং যে কবিকে রোবোদের হাতে ঠেলে দিয়ে গোবিকে বের করে আনল, তার মানে বুঝলাম না। তাই টেং আর গোবি দুটোকেই বন্দী করেছি। কবি বেচারার কি অবস্থা হল তা জানি না। আর ভালো কথা

ছোট-মামা, তোমার হারানো হিপিদের ওখানে দেখলাম না। এক যদি মাটির নিচের ঘরে বন্ধ করে রেখে থাকে। তবে শত শত রোবো আছে। অনেকগুলোকে দূর থেকে দেখেছি। কি তাদের দক্ষতা, কি ভয়ংকর সাহস। ভাবছি অত রোবোর—

ছোটমামা কাষ্ঠ হেসে এক মুঠো মাশরুম ভাজা গালে ফেলে, বললেন, "একটাও রোবো দেখনি। এইরকম আমার ধারণা। আজ রাতে কি কাল সকালে ইফানরা এসে পড়বে। তখন রহস্য উদ্ঘাটন হবে।—কি হল রে?"

গুপি তোতলামি করতে লাগল, "ঐ ইফান, ছোটমামা, ও তাহলে দুষ্কৃতকারী নয়? পুলিসের লোক?—"

ছোটমামার চোখ কপালে উঠে গেল, "দুষ্কৃতকারী? বলিস্ কি রে? দুষ্কৃত-কারীর হাতে তোদের ছেড়ে দিয়ে চলে আসব আমি? কি ভাবিস্ আমাকে! ও গুপ্ত গোয়েন্দার খুব বড় অফিসার। প্রধান ট্রেনার বলতে পারিস্।—"

"আর নালুদা? উনিও দুষ্কৃতকারী নন?"

"এ্যাঁ! সেকি রে! উনিই ঐ ডিপার্টমেন্টের হেড! তোরা কি পাগল হলি নাকি? জানিস, অসাধারণ লোক ওঁরা। বহু দুষ্কৃতকারী জেল খেটে বেরোলে, ওঁরা ওদের পুনর্বাসন করেন, দক্ষ ট্রেনিং দিয়ে, ওদের সব গুণগুলোকে সৎকাজে লাগিয়ে দেন। জানিস বোধ হয় পুলিসের আর দুষ্কৃতকারীদের প্রায় একই রকম গুণ আর এক-ই রকম ট্রেনিং দরকার—ধ্যেৎ! এসব কি শেখাচ্ছি তোদের! তবে কথাটা সত্যি!"

গুপি-পানু ভূতো চাং এ-ওর দিকে তাকাল।

অনেক রাতে ইফান এসে পৌঁছেছিল। সঙ্গে টেং। টেং নাকি পুলিশের পরীক্ষার জন্য তৈরি হবে! একটু বেলা হলে ইফান হোটেলে এসে ওদের দেখে মহাখুশি। ওরা অবিশ্যি ততক্ষণে স্নান করে, চুল কেটে, গরম প্যান্ট শার্ট পরে অন্য মানুষ হয়ে গেছিল। কিন্তু ইফানের ওদের চিনতে একটুও অসুবিধে হয়নি। নাকি সব বদলানো যায়, এমন কি তাপ্পি গুঁজে নাকের শেপও বদলানো যায়, কিন্তু কান আর হাত পায়ের আঙুল লুকোবার কোনো উপায় নেই!

হোটেলে ছোটমামার নিজের ঘরে এক সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া হল। ইফান তখন রোবো রহস্য খুলে বলল।

"দুই ওস্তাদই এখন হাজতে। ঐ গোবি সাহেব। আর তার কবি শাকরেদ। অবিশ্যি দুজনের ছুটি। কামড়াতে পারলে আর কিছু চায় না।"

ছোটমামা পর্যন্ত অবাক। "সে কি! ওরা না রোবো কারখানার পার্টনার?"

"তাই নিয়েই তো যত গণ্ডগোল। কবির টাকা আর গোবির দক্ষতা। এখন গোবি হল গিয়ে আমেরিকার এক ফিলম কোম্পানির বিখ্যাত মেক-আপ-ম্যান। সম্প্রতি একটা রোবো ফিলম করে মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি গজায়। ফিলম অ্যাকটরদের রোবো সাজিয়ে, ঝামেলা মেটানো হয়েছিল। নইলে অতগুলো অমন দক্ষ রোবো কোথায় পাবে? হয় নাকি ও-রকম? আবার যন্ত্রের মতো চেহারা নয়, মানুষের মতো দেখতে হওয়া চাই। চমৎকার সব রোবো বানিয়েছিল ফিলমের জন্যে। চলে এল এদেশে। নকল রোবোর ব্যবসা করে বড়লোক বনবে।

এদিকে ঐ কবি নামধারীটি দুধ-ঘিয়ের ব্যবসা করে আর ডাকাত পূর্বপুরুষদের মহিমার গর্বে বুঁদ হয়ে ঠিক করলেন ঐ মহিমার পুনরুদ্ধার করতে হবে। তা দক্ষ সেপাই সামন্ত কোথায় পাবে? জানাজানি হলে তো মুশকিল। ট্রেনে দেখা দুজনার। জায়গা নিয়ে মারামারি, বন্ধুত্ব, ও ষড়যন্ত্র। কবি টাকা যোগাবে, কারখানার জায়গা ও খরচাপাতি দেবে। গোবি রোবো বানিয়ে দেবে। কিন্তু যদ্দিন না রোবোরা তৈরি হয়ে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, ততদিন কবি যেন তাদের দেখতে না চায়, তাহলে কাজের ক্ষতি হবে, ডবল খরচ পড়বে। এখন প্রত্যেক রোবোর একজন অ্যাটেণ্ডাণ্ট দরকার, সে যোগাড় করা কবির কাজ।

কবি কাগজে বিজ্ঞাপন দিল। হিপি দরকার। ও জানত হিপিদের কেউ খোঁজখবর নেয় না। দু-তিন হাজার নিখোঁজ হলে কি হারিয়ে গেলে কোনো ক্ষতি হবে না। ঠিক তাই দলে দলে হিপি হাজির। তারা একবার গোবির হাতে পড়লে, গোবি আর তাদের কেল্লার নিচের ঘর থেকে বেরোতে দিত না। কারণ অল্পে অল্পে সাজ পরাতে হয়। কেউ দেখতে পেলে জানাজানি হয়ে যাবে।

মিঃ চ্যাণ্ড তো ভাবেন উনি সব জানেন, নিজেই তুরিয়ে বারিয়ে দিলেন বেচারি টেংকে ওদের হাতে সঁপে। এদিকে টেং যত সাহসীই হক, ওর বেজায় ভূতের ভয়। পুরনো কেল্লায় মাটির নিচের ঘরে ঐ সব হাফ রোবো দেখে, ভয়ে হিস্টিরিয়া! তখন ওপরে এনে চাকরের কাজ দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। ছেড়ে তো আর দেওয়া যায় না। শেষটা সবাইকে, বিশেষতঃ কবিকে বলে দিক আর কি!

কবি তো জানে ফোম্ রবারের রোবো বানাচ্ছে গোবি। হিপিরা অ্যাটেণ্ডাণ্ট। টেং-এর মুখে সব শুনে রেগে টং কবি। প্রথমটা ওর খুব আপত্তি ছিল না। বেশ তো দামীদামী যন্ত্রপাতির বদলে ফোম রাবার আর হিপি দিয়ে রোবো হলে মন্দ কি। যা দিয়েই তৈরি হক, রোবো হল রোবো। রাগ দুঃখ ভয় ভাবনা খিদে

তেষ্টা, লোভ, হিংসে, রোগ, শোক, কিছু থাকবে না। কি চমৎকার সৈনিকের দল হবে। রোবো সৈনিক। ধরা পড়লেও কিছু বলবার উপায় থাকবে না। কারণ যেটুকু শিখিয়ে দেওয়া হবে, তার বেশি তো ওরা পারবে না!

গোল বাধল হিপিদের নিয়ে। রোবো হতে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু রোজ রাশি রাশি অখাদ্য জানোয়ারের মাংস, মাছ; গাঁজা আফিং, এই সব চাই! আর কি অবাধ্য! গোবি রোজ কমপ্লেন করে ওরা কথা শোনে না। নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। আরো টাকা দাও, ওদের ওষুধ করতে হবে—! এর মধ্যে ভারত সরকার পুলিস লাগালেন হিপিদের খুঁজে দাও, তাদের বাড়ি থেকে টাকা আসে তো নেয় না কেন, ওদিকে ইন্‌কম্ ট্যাক্সও দেয় না। পুলিসের সঙ্গে সমাদ্দার ইন্‌ভেস্টিগেশন্ হরি-হরাত্মা। কাজেই ছোটনামার তলব পড়েছিল। সেই যাই হক। আপাততঃ কবি গোবি হাজতে। হাফ্-রোবোরা দিল্লীতে। সেখান থেকে তাদের দেশে পাচার করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আর টেং? টেং এসেছে শুনেই ওর মা ওকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে। পাছে পুলিসে যোগ দেয়। অবিশ্যি তাতে কোনো সুবিধে হয়নি।

৭. সিঁড়ি

সবাই শুনেছিল শব্দটা। কেমন একটা চাপা গুন-গুনুনি। যেন কানের ভেতরে অনেক অনেক দূরে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনি ওরা। ভেবেছিল ক-দিন ভালো করে খাওয়া-দাওয়া হয়নি তাই কান বোঁ-বোঁ করছে বোধ হয়।

তাই করেও অনেক সময়, যখন রান্না ভাতের স্বাদ-ই মনে পড়ে না। তখন দলে দলে বেরিয়ে পড়ে যে গাছে যা পায়, তাই পেড়ে খেতে হয়! কাঁচা, কষা, টক, কয়েকটাতে থালি বিচি, শাঁসটাস নেই। তিন পাড়ার লোক ওদের ওপর হাড়ে চটা। লাঠি নিয়ে গাছ আগলায়; বদ্-মেজাজী কুকুর রাখে; ধরতে পারলে থানায় দেয় আর কি মার! কি মার!

না খেয়ে করে কি? পা-ই কাঁপে, নাকি পায়ের তলার মাটি ঝিম্ করে, তা টের পাওয়া যায় না।

আজ তাই গুনগুনুনি শুনে যে যার উঠে বসেছিল। অন্য বছর এ সময় ভারি মজা। এটা শহর থেকে কিছু দূরে, পড়তি জায়গা হলেও, এককালে বড় লোকদের বাগান-বাড়ি ছিল। কি বড় বড় বাগান! আম, জাম, কাঁঠাল, নারকোল, পেয়ারা, সফেদা। এ-বছর কিছু হয়নি। ঝড় হয়ে আমের মুকুল সব ঝরে গাছতলায় ছোট ছোট মিষ্টি গন্ধ পাহাড় হয়ে গিয়েছিল। গোদার ছোট ভাই দুটো তাই খেয়ে পেট গুলায় যায় আর কি! আম টাম হয়নি এই সব বে-ওয়ারিশ পোড়ো বাগানে। খেস্তি ঠকেরুণের বাগান ছাড়া।

বড় বড় কাঁঠাল পেড়ে [illegible] দেখে, কোয়া নেই, ছিবড়ের মতো পাকানো পাকানো আঁশ! অন্য ফলের গাছে যা গুটি গোটা হয়েছিল, সব কোন কালে খেয়ে সাবাড়।

বড় বড় পুকুর আছে। ভাঙা ঘাট, কুচকুচে কালো জল, মাছ কিলবিল করছে। কিন্তু ভয়ে কেউ নামে না। নাকি জলের নিচে কি আছে। জলে নামলেই টেনে নামায়। আর সে মানুষ ওপরে ওঠে না! পুকুরের পাড়ের শামুক-গুগ্‌লী খেয়ে শেষ। নাকি ওতে হাঁপানি সারে। তা বটুর ঠাকুমা কিছুতেই খাবে না। বলে কিনা ও-সব মাছ-মাংস, বিধবাদের খেতে নেই।

বটুর যমজ ভাই গবু চটে গেছিল, "গরীবদের অত কি! যাদের বাড়িতে ভাত চড়ে না, তাদের ও-সব বড়-মানুষি কিসের!"

ওদের বন্ধু প্যাঙা বলেছিল, "তাছাড়া বিধবা হলে কোত্থেকে? স্বামী মলে তো বিধবা হয়। যার স্বামীই নেই সে আবার বিধবা কিসের? সবাই যখন সেই কথাই বলল, কেউ কোনো জন্মে দেখেইনি স্বামীটামীকে সে আবার মরবে কি করে—তখন শেষ পর্যন্ত বুড়ি রাজী হল।

জগবন্ধু ধোপাদের কাছ থেকে এই বড় মাটির হাঁড়ি আনল। ভজা, নরহরি, গিলে, নটে ইত্যাদি ছোট ছেলেরা পোড়ো-বাড়ির বন-বাদাড় থেকে রাশি রাশি শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আনল। বটু পোড়া ইঁট পেতে, মধ্যিখানটা খোঁদল করে, ফাগুর কাছ থেকে দেশলাই কাঠি নিয়ে উনুন ধরাল।

ঠাকুমা উঠে এসে বলল, "সব্ দিকিনি। শামুক গুগ্‌লীগুলো ধুয়ে আন্।" তারপর আধ হাঁড়ি জল দিয়ে উনুনে চাপিয়ে দিল। গয়লানিমালী হাট সেরে বাড়ি যাচ্ছিল, সে খানিকটা নুন আর শুকনো লংকা ছেড়ে দিয়ে গেল। গিলে গাছতলা খুঁড়ে এক গাদা মুখি কচু তুলেছিল; সেগুলো ছেড়ে দিল। টুকুর-টুবুর করে ফুটতে লাগল, কি তার সুবাস! সবার শেষে ঢ্যাঙাদা আবার দিন পাওয়া কারখানার শুখো—ভাতার চাল এক গাদা ঢেলে দিল।

কলাপাতা, পদ্মপাতা, ভাঙা সানকি, যে যা পেল, তাতে করে পেট পুরে খেয়েছিল। সবাই বলেছিল জন্মে কখনো এত ভালো খায়নি। ঠাকুমাও সবার খাওয়া হলে হাঁড়ির তলা থেকে বেশ খানিকটা খেয়ে, সারারাত ঘুমিয়েছিল। একবারো হাঁপায়নি। আর যেটুকু হাঁড়ির গা চেঁচে বেরুল, পোষা জানোয়ারদের তাইতেই হয়ে গেল।

কিন্তু তার পর আরো দুদিন কেটে গেছে, খাওয়া দাওয়া হয়নি। সবাই এখন কানে মৌমাছির গুনগুনুনি শুনছে। এর মধ্যে নগা এসে বলল, "যা চলে! খেলার মাঠ বেহাত! বুড়ো চৌধুরী সরকারি লোক লাগিয়ে জরিপ করিয়ে, পোস্তো গেঁথে, দেয়াল তুলছে। হয়ে গেল তোদের ফুটবল।"

বলে দাঁড়ালে মাটি ঝিম্‌ঝিম্ করে, তারা আবার ভোঁদা মেমোরিয়েল কাপে ফুটবল খেলবে!! কিন্তু বুড়ো ভেবেছেটা কি! পোস্তো উপড়ে দোব না! দেয়ালের ইঁট খুলে কালোরবনে ঘর তুলব না! দাঁড়াওনা, একটু পায়ের ঝিম্‌-ঝিম্‌টা যাক।

যেই না ভাবা, অমনি কট করে গুন্‌গুন্, পায়ের ঝিমঝিম সব সেরে গেল।

সবাই আশ্চর্য হয়ে এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল। চারদিক কি অদ্ভুত চুপচাপ। পোষা জানোয়ারগুলোও কাছে ঘেঁষে এল। বটুর ঠাকুমাও তাদের সঙ্গে এল।

তারি মধ্যে খেন্তি ঠাকরুণ উঠিপড়ি করে ছুটে এসে, "ওরে কে আছিস! আমাকে বাঁচা! আমার সব পাকা আম খেয়ে নিল রে! আমার জমা দেওয়া ভালো ভালো আমগুলো পটাপট ছিঁড়ছে আর মুখে পুরছে, থলিতে ভরছে! সিঁড়ি বেয়ে কি শত্তুর-ই নেবে এল। তাড়ালেও যায় না, ঘুঁষি দেখালে হাসে।"

ওরা তো অবাক! সিঁড়ি আবার কোত্থেকে এল? ঠাকরুণের বাড়ি তো একতলা। বিষ্টির জল যাবার নালা বন্ধ হলে, মই লাগিয়ে নালা সাফ করতে হয়। তবু কিছু দেয় না বুড়ি।

বুড়ি বলল, "ওরে, বসে আছিস কি বলে? ওঠ, গাছে চড়ে ভাগা ওদের!"

"তুমি নিজে ভাগাও!" "ও মা! আমি ভাগাব কি করে, মাটিতে নাবে না যে! সিঁড়ির ওপর থেকে গুচ্ছের সব ছিঁড়ে নেয়! চল, লক্ষ্মী সোনা!"

"হ্যাঁ, চল না আরো কিছু! বলি, দিয়েছিলে একটা নারকোল কি পেয়ারা কি কাঁচা আম, যখন খিদের চোটে চাইতে গেছলাম? জানোয়ারদের অদ্দেক না খেয়ে মল?" সে-কথা মনে পড়াতে ছোটরা সবাই জানোয়ারদের শোকে নাক টেনে, চোখ মুছে নিল।

খেন্তি ঠাকরুণ যেন গাছ থেকে পল, "ও মা, কি বলে! গাছগাছলা সব ফোড়ের কাছে জমা দেওয়া। ও-ফল কি আমার, যে তোদের দোব? যে দুটো-একটা মাটিতে পড়ে যায়, তা-ছাড়া নিজেই খেতে পাইনে।"

"তারি কিছু না হয় দিতে। ওরা প্রাণে বাঁচত!"

বুড়ি সত্যি রেগে গেল, "আরে রেখে দে! কি ছিরির সব জানোয়ার! দেখে হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনে! যত রাজ্যের নর্দমা ঝেঁটিয়ে তুলে এনেছে! বাজে জঞ্জাল!"

বকুর ছোট বোন দুটো চটে গেল। ভীষণ তোৎলা তারা। বড়টা বলল, "ব্-ব্-বা-আ-জে! ক্-ক্-ক্—" আর কথা বেরোয় না! তাই দেখে ছোটটা বলল, "ক্-ক-কা—ছ্-ছ্-ছানা ব্-ব্-ব্ আজে?"

"পালক নেই, কানা। বাজে না তো কি!"

বকু বলল, "চিল ঠুকরে চোখ খেয়ে নিয়েছে। তাই তো উড়তেও পারে না। পোষা জানোয়ারটাকে খেতে দেব না? কথা শেখালে কাগ কথা বলে!"

"পোষা জানোয়ার দেখে বাঁচি না! লোম-ওঠা নেড়ি-কুত্তো, কান-কাটা বেড়াল, ঠ্যাং খোঁড়া ভাম—ভাঁড়ের মধ্যে কি?"

শিবু বলল, "খল্‌সে মাছের ছানা। ভীষণ তেজী!"

বুড়ি হাসল, "তা আঁশ নেই কেন গায়? কানকাটা বেড়াল খেয়েছে বুঝি?"

বেড়ালের মালিক তেড়ে উঠল, "হ্যাঁ! বেড়াল খেয়েছে। আঁশ থাকবে কি করে? সারাক্ষণ কামড়াকামড়ি করে যে। আঁশ-ও নেই, খানিকটা খানিকটা কান্‌কো-ও নেই!"

খেন্তি ঠাকরুণ বললেন, "তা হলে আমার আম বাঁচাতে যাবি নে তোরা?" "না, যাব না! তুমি আমাদের কিচ্ছু দাও না। খালি বল যা, চলে যা, দূর হ"— "বেশ আমিও যাচ্ছি চৌধুরীদাদার কাছে, ঐ ছোঁড়াগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে। আর তোদেরও এই বলে গেলাম, শীগ্রি সরকারের নতুন ইস্তাহার বেরুচ্ছে, এই অভাবের সময়ে যারা বাজে জন্তুদের খাবার খাইয়ে লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়, তাদের সব জন্তু জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হবে, হ্যাঁ।" অমনি জন্তুগুলোকে বুকে জাপ্টে ঢ্যাঁ-ভ্যাঁ লেগে গেল।

পালের গোদা ভীমু তার লিক্‌পিকে হাত-পা নেড়ে বলল, "থামবি কি না। ও কি ছিঁচকাঁদুনে। চল্ দেখি গিয়ে। আমরা একটা আম পাই না তো বাইরে থেকে সিঁড়ি নিয়ে কারা এসে আম পাড়ে? এ তল্লাটে আর তো কারো বাগানে আম হয়নি।"

দপ্‌দপিয়ে চলে যাবার সময় বুড়ি ভুলে খিড়কি দোর খুলেই গেছল। ওরা সবাই সুড়সুড় করে ভেতরে গিয়ে একেবারে থ।

দেখে গাছে গাছে সিঁড়ি। কিন্তু এ আবার কেমনধারা সিঁড়ি বাবা। মাটি থেকে ওপরে না উঠে ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছে। সিঁড়ির মাথা একেবারে চোখের বাইরে চলে গেছে আর পাঁচশো ছেলেমেয়ে গাছের সব আম মুড়িয়ে তুলে নিচ্ছে॥ খাচ্ছে, নিচে ফেলছে, থলিতে ভরছে, হি-হি করে হাসছে। কি সুন্দর দেখতে তারা, কি ভালো কাপড় চোপড় পরা।

তাই দেখে ভুলো, খাদা, নেপু, ন্যাকা, বকু, শিবু আর দাঁড়াতে না পেরে থপাথপ মাটিতে বসে পড়ে ভেউ-ভেউ করে কান্না জুড়ে দিল। কত সইবে।

ছেলেমেয়েগুলো এমনি অবাক হয়ে গেল যে একেবারে চুপ। তারপর তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় আর সবচেয়ে সুন্দর, সে বলল, "কি হয়েছে? কাঁদছ কেন? কেউ কিছু বলেছে?"

ভীমু বলল, "তিন দিন কেউ খাইনি, তাই কাঁদছি। আমাদের পোষা জানোয়ারদের মেরে ফেলবে বলছে, তাই কাঁদছি।" "ও মা! কি কষ্ট! কি কষ্ট। ছেঁড়া ময়লা কাপড় কেন ভাই?"

ভীমু বলল, "ফরসা আস্ত কাপড় নেই, তাই।"

বকুর সাহস সবচেয়ে বেশি, সে জিজ্ঞাসা করল, "কোথা থেকে এসেছ তোমরা, উল্টো মই চেপে?" ওরা দেখিয়ে দিল রাতের কালো আকাশে অনেক দূরে একটা নীল তারা মিটমিট করছে তার দিকে, "ঐ আকাশের সূর্য। ওরি চারদিকে আমাদের পৃথিবী ঘোরে। বল তো জন্তু-জানোয়ারগুলোকে সেখানে নিয়ে যাই। খেয়ে বাঁচুক।"

অমনি সবার মুখে হাসি ফুটল, নাও, নাও, এই নাও, ভাই! খেয়ে বাঁচুক। এক দিনও ওরা পেট ভরে খায় না।"

ভীমু বলল, "ওখান থেকেই যদি এসে থাক, তাহলে আমাদের ভাষা শিখলে কি করে? অন্য দেশের-লোকেরা তো ইন্‌জিরি বলে!"

শুনে ওদের কি হাসি! "তোমরা যেমন করে শিখেছ, আমরাও তাই। মাস্টারের কাছে। মাস্টার এসে বাংলা শিখে গেছে। তারপর কত কান্না, জন্তু-গুলোকে কত আদর কত চুমু। ফকিরের বাঁদর তার গলা জড়িয়েছে, ছাড়তে চায় না।

বড় বড় চোখ করে ছেলেমেয়েগুলো তাই দেখে অবাক হয়ে বলল, "তা তোমরাও এসো না, ওদের ছাড়বে কেন? তোমাদের মা-বাবা নেই? তারা কিছু বলবে না তো?"

বকু বলল, "আমার ছিল। মরে গেছে। ওদের কারো ও-সব নেই-টেই। ছিলও না কখনো। খালি বটুর ঠাকুমা বেচারি আসবে।"

"তবে এসো, তবে এসো! সে বড় ভালো জায়গা।"

সিঁড়িগুলো আরো নিচে নেমে এল। মাটি থেকে আধ হাত ওপরে থামল। পিল্‌পিল্ করে জানোয়ার বগলে সবাই উঠতে লাগল। ততক্ষণে কথাটা রটে গেছিল। ক্যাওট্‌পাড়ার পাশের ঘর-ছাড়ারা সবাই নিঃশব্দে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি আধাবয়সী, কারো পেটে ভাত পড়েনি দুদিন।

তারপর দূর থেকে মানুষের সাড়া পেতেই মানুষজন সুদ্ধ সিঁড়িগুলো উঠে যেতে লাগল। উঠতে উঠতে এক সময় চোখের বাইরে চলে গেল।

খেন্তি ঠাকরুণ, তার দাদা বুড়ো চৌধুরী, দলবল, লাঠি সোঁটা, পেয়াদা বরকন্দাজ, নিয়ে এসে দেখে আমবাগান ভোঁ-ভাঁ! একবার মনে হল মাথার অনেক ওপরে কি যেন ঝিলিক দিল; কানে এল হাজার হাজার মৌমাছির গুন্‌গুনুনি; পায়ের তলার মাটি ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল। তারপর সব চুপ।

সবাই হতভম্ব হয়ে আকাশপানে চেয়ে রইল। গুনগুন শব্দ দূর থেকে আরো দূরে চলে যেতে লাগল। হঠাৎ খেন্তি ঠাকরুণ কোমর থেকে চাবির গোছা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডুকরে কেঁদে বললো "ওরে! আমাকেও নিয়ে যা!..আমারো কেউ নেই।"

---

৮. চাকর

যদিও বেহালার ছোট বাড়িটি আশাতীত রকমের ভালো, ভাড়া মোটে একশো টাকা এবং সাইকেলে ড্যালহৌসি থেকে পঁচিশ মিনিটে পৌঁছনো যায়, তবু সেখানে উঠে গিয়ে অবধি কেষ্টবাবুর মনে এক ফোঁটা শান্তি ছিল না। মুনিয়ার মা কেবলি বলে এ কোন ভূতের পাড়ায় আনলে, পথে বেরুতে গা ছম্ ছম্ করে, পাশের শেড্ থেকে কি রকম চাপা শব্দ হয়, কানে এলেই গা শির শির করে, এর চাইতে ভবানীপুরের সেই এঁদো গলিও যে ভাল ছিল।

শেড্‌টি যে একটু অদ্ভুত সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই ; দোতলার সমান উঁচু করুগেটের তৈরী, অ্যাসবেস্টসের ঢালু ছাদ, এ দিকে কোনো দরজা-জানলা নেই, কেউ টিন পেটে না, ধোঁয়া বেরোয় না, কি উদ্দেশ্যে তৈরী কোন মালুম দেয় না। ওটা যে একটা সাধারণ মাল-গুদাম হতে পারে সম্ভবতঃ চোরাই কারবারের মাল-গুদাম, এ কথা মনুয়ার মাকে কে বোঝাবে ?

তার ওপর ফেলা হতভাগাও গোলমাল শুরু করে দিল। পাঁচ বছর এ সংসারে কাজ করছে, একরকম মনুয়ার মার হাতেই তৈরী বলা যায়। এতদিন বলত ওর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, সবাই দুর্ভিক্ষে মরে গেছে, টাকাকড়ি মনুয়ার মার কাছে জমা রাখত, সে-ই দরকার মতো কাপড়-জামা কিনে দিত। ফেলাটাও বলে কি না ওর নাকি ঠাকুরমার শক্ত ব্যামো, দেশ থেকে কে এসে বলে গেছে, না গেলে পৈত্রিক সম্পত্তিটুকু বেহাত হয়ে যায়।

আপিস থেকে ফিরে এ কথা শুনে কেষ্টবাবু চটে কাঁই। 'ঠাকুমার ব্যামো না হাতি! সব মিছে কথা। আসলে হতভাগা চাউলপটির চালিয়াৎ হয়েছেন, পাড়ার আড্ডা পাচ্ছেন না, রকের ক্লাব নাগালের বাইরে, সিনেমা যেতে আধমাইল হাঁটতে হয়, এ বাড়ী ওঁর মনে ধরবে কেন ?'

মনুয়ার মা চায়ের পেয়ালাটা আরেকবার ভরে দিয়ে বললে, তা নয়, আসলে ও ভয় পেয়েছে।'

'ভয় পেয়েছে! সে আবার কি? কিসের ভয়? পাড়ায় এত সব

ভদ্রলোকরা বাস করছে, তাঁদের চাকরবাকরদের সঙ্গে ভাব করে নিলেই আর ন্যাকা চৈতোনের ভয়ের কারণ থাকবে না।'

মনুয়ার মা আস্তে আস্তে বলল, 'সেই জন্যই তো ভয়।'

'কি জন্যে আবার ভয়? কি বলছ বঝতে পারছি না।'

'ফেলা বলে এখানকার সব চাকররা যেন কি রকম থুম্‌থ মে, কথা বললেও কথা কয় না, খালি মাথা নিচু করে ভূতের মত খেটে যায় এবং কেউ যে বাঙালী নয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাইরে থেকে এসেছে, কি উদ্দেশ্যে কে জানে। পাকিস্তান থেকে আসতেই বা বাধা কি! আমার তো মনুয়াকে নিয়ে এখানে থাকতেই ভয় করে।'

কেষ্টবাবু অবাক হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন, বিকেলের শেষ রোদে চারদিকটা কি সুন্দর লাগছে; সামনে পাঁচিল ঘেরা কার মস্ত জমিতে সজনে গাছে ফুল ফুটেছে, পূবের রাস্তার ওপারে সারি সারি সুন্দর নতুন বাড়ি, পথের দু ধারে বাবলা আর অ্যাকেসিয়া গাছের লাইন। এখানে আবার কিসের ভয়? বুঝিয়ে বললেন, চাউলপটির এঁদো গলির পর চামেলি রোডের এই সুন্দর বাড়ি ভালো লাগছে না তোমার? দেড় কাঠার ওপর কেমন কোঠা বানিয়েছে দেখ; নিচে দুটো ঘর, ওপরে দুটো ঘর, দুটো স্নানের ঘর, ঘেরা উঠোন, কল, চৌবাচ্চা, হ্যাণ্ড পাম্প। কত দিন পরে এত আরামে আছ বল দিকি নি? কোথায় আনন্দ করবে, তা না, মন-গড়া ভয়েই আধমরা।'

মনুয়ার মা বলল, 'মন-গড়া ভয়ই যদি হবে তো যারা এত সুন্দর বাড়ি করেছিল, তারা এখানে থাকে না কেন?' এই বলে কেঁদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাই দেখে দু' বছরের মনুয়াও তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগল। তার মুখে এক চামচ চিনি পূরে চুপ করে ফেলাকে একটা ডাক দিয়ে চিন্তিত মনে কেষ্টবাবু সদর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। শুনতে পেলেন তিনি বেরুবামাত্র মনুয়ার মা ছুটে এসে ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল।

নাঃ, এদের নিয়ে তো আর পারা যায় না। একবার নিজে গিয়ে শেডের রহস্যটা ভেদ করে আসাই যাক। শেডের উত্তরেই আরেকটা রাস্তা, তার নাম কামিনী রোড। মোড় ঘুরে কেষ্টবাবু একটু বিস্মিত না হয়ে পারলেন না, কারণ তাঁদের বাড়ি থেকে শেডটা এত প্রকট হলেও, রাস্তা থেকে তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না। বাড়িটার জমি অনেকখানি, কিন্তু চামেলি রোডের ওপর একটা লম্বা দোতলা বাড়ি শেডটাকে আড়াল করে রেখেছে; আবার মোড় ঘুরে কামিনী

রোডের ওপরেও সমস্ত জমিটুকু জুড়ে আছে। অর্থাৎ একটা এল্ শেপের বাড়ি; তার পেছনে শেড। কোন রাস্তা থেকেই শেড্ দেখা যায় না, চোরা কারবার না হয়ে যায় না। তা হোক না চোরা কারবার, তার সঙ্গে কেষ্টবাবুর কি?

ফিরেই আসছিলেন এমন সময় কামিনী রোডের ওপর সবুজ রঙের সদর দরজায় চোখ পড়ল। বাড়িটি একেবারে ফুটপাথের ওপর, জমি সবটুকুই বাড়ির পেছনে। সদর দরজার দু পাশে দুটি নেম প্লেট্ ঝুলছে। একটাতে ইংরিজিতে লেখা এম্ থ্যাকার, অন্যটাতে একটা কাগজ সাঁটা রয়েছে, তাতে সবুজ কালি দিয়ে হাতে লেখা 'এইখানে চাকর ভাড়া পাওয়া যাইবে।' ফিক্ করে হেসে ফেলে কেষ্টবাবু বাড়ি ফিরে মনুয়ার মাকে বললেন 'তোমার ভয়ের কোনই কারণ নেই; ওখানে থ্যাকার বলে একজন কালো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থাকে, চাকরের এজেন্সি চালায়, সম্ভবতঃ কুচবেহার সাইড থেকে লোক আনায়, তাই চাকরগুলার চেহারাও অন্য রকম, এদিকের ভাষাও বোঝে না। ঠিক জানতাম কিছুই নয়। উঃফ, বলিহারি তোমাদের কল্পনা শক্তিকে!'

কিন্তু পরদিন আপিস থেকে ফিরেই কেষ্টবাবু শুনে অবাক হলেন যে তিনি সকালে বেরুবার পরেই ফেলারাম পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে জমানো টাকাকড়ি সব চেয়ে নিয়ে চলে গেছে, নাকি ঠাকুমার খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। কেষ্টবাবু চা খেতে খেতে বললেন, 'গেছে, আপদ গেছে, তাতে হয়েছেটা কি? এখুনি গিয়ে থ্যাকার সাহেবের কাছ থেকে ওর চেয়ে পাঁচগুণ ভালো চাকর নিয়ে আসছি। তুমি কিছু ভেবো না।'

মনুয়ার মার মুখটা একটু সাদা মনে হল। সে শুধু বলল 'আনবেই যখন, মেয়েছেলে এনো।' কথাটা মন্দ বলেনি গিন্নী; সারাদিন একা থাকে, অচেনা পুরুষ চাকরের চেয়ে মেয়েছেলেই ভালো। এম্ থ্যাকারের বাড়িতে বেল টিপতেই, সাহেব নিজেই দরজা খুলে, আদর করে বসালেন। 'যাক, আপনার আশাতেই ছিলাম।'

'সে আবার কি? হোয়াট ডু ইউ মিন?'

সাহেব হেসে বললেন 'না না, ব্যস্ত হবেন না। আমি বলছিলাম কি, এ পাড়ার প্রত্যেকটি চাকর আমি সাপ্লাই করেছি। এত সস্তায় এত ভালো চাকর আর কোথায় ভাড়া পাওয়া যাবে বলুন? ধরেই নিচ্ছি, চাকরের জন্যই এসেছেন। সুনার অর লেটার যেমন এ অঞ্চলের সবাই আসে। তা কি রকম চাই?'

কেষ্টবাবু বললেন, 'মেয়েছেলে চাই, সাধারণ ঘরকন্নার কাজ জানলেই হল, আমার স্ত্রী সব শিখিয়ে নেবেন। কিন্তু এখুনি চাই, সম্ভব হলে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। ও হ্যাঁ, ষণ্ডা মেয়ে চাই যে হ্যাণ্ড পাম্প চালাতে পারবে! আজ বোধ হয় পাব না, খবর দিয়ে আনাতে হবে?'

সাহেব মাথা নেড়ে হেসে বললেন 'ও নো নো, তারা এইখানেই অন্ ট্যাপ থাকে। আপনাদের বাড়ি থেকে তো তাদের কোয়ার্টার দেখা যায়।'

কেষ্টবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'নামধাম কিছু বললাম না, তবু জানলেন কি করে?'

সাহেব খুব হাসলেন 'স্পাই রাখি মিস্টার ঘোষ, স্পাই রাখি। আমার মতো এক হাতে একচেটিয়া ব্যবসা করতে হলে গিন্নিকে স্পাই গিরি শেখাতে হয়। ও এঞ্জেলিনা, একবার এদিকে এসে নিংারেস্ট নেবার ও নতুন মক্কেলের সঙ্গে আলাপ করে যাও।'

সঙ্গে সঙ্গে মোটাসোটা হাসিখুশি বর্মি বর্মি চেহারার চুল ছাঁটা মেম সাহেব এক গাল হাসি ও কানে হীরের টপ নিয়ে বেরিয়ে এসেই বললেন, 'ডিয়ার, আমাদের টার্মস্ বললে না মিঃ ঘোষকে?'

'টার্মস্?' কেষ্টবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—অনেক মাইনে বুঝি?'

'আরে না, না, মধ্যবিত্ত পাড়ায় বেশী মাইনে দেবে কে? শুখো চল্লিশ টাকা, ব্যস্। আপনার অন্য চাকর হলে খাইয়ে দাইয়ে মাইনে দিয়ে ওর চেয়ে বেশিই পড়ত। ভোরে সাড়ে পাঁচটায় যাবে; একটায় এসে খেয়ে নেবে, আবার তিনটে থেকে রাত দশটা। এটা কিছু অন্যায় কথা বলছি কি? পয়সা-কড়ি আমাদের আপিসে দেবেন, ওদের হাতে কিছু নয়। ওদের যা দেবার আমরা দিই, খাবার দাবার, সাদাসিধে কাপড় চোপড় থাকার জায়গা; ওরা শুধু ভাড়া খাটে। রাতে কিন্তু থাকবে না; কাল ভোরে নিশ্চয় যাবে। আপনার চাকরাণীর নাম আড়াইশো। আর হ্যাঁ, দেখুন, ওরা কিন্তু কোনো কথা বলে না, তবে কথা বললে মানে বোঝে।'

কেষ্টবাবু একেবারে হাঁ! 'আড়াইশো আবার নাম হয় নাকি? আর একেবারে বোবা হয়ে কাজ করবে, এত সুখ তো ভাবাও যায় না। গিন্নিও যদি—যাকগে সে কথা। সত্যি আড়াই শো নাম তো শুনিনি।'

মিসেস্ থ্যাকার খুব হাসলেন। 'না, না, ওটা ওর নম্বর, নাম আমরা বলি না। আচ্ছা তা হলে গুড-নাইট।'

পরদিন ভোরে আড়াইশো এসে কড়া নাড়ল, লম্বা হাতার সাদা জামা, সাদা শাড়ি, নীল ক্যাম্বিসের জুতো। উটকপালী থ্যাবড়া নাকী, চ্যাটালো গাল, ঢোকানো থুতনি। ওর রূপ দেখে মনুয়ার মা প্রথমটা ভির্মি খাবার যোগাড়। কিন্তু তারপর যখন দেখা গেল কাজে একেবারে নিখুঁৎ, রাঁধে যেন দ্রৌপদী, কাপড় কাচে বাসন মাজে ওস্তাদের মতো, মুখে একটিও কথা নেই, ঝমাঝম পাম্প চালায়, যা বলা যায় তাই করে, তখন মনুয়ার মাও আহ্লাদে আটখানা। আড়াইশোর মুখে একটু হাসি লেগেই থাকে। তবে সেটা ঠোঁটের অদ্ভুত গড়নের জন্যেও হতে পারে। মনুয়া তার মহাভক্ত হয়ে উঠল। মনুয়ার সঙ্গে তার কত খেলা।

মোট কথা সে এসে অবধি এবাড়ির সব সমস্যা একেবারে মিটে গেল। এইভাবে মাস চারেক কেটে গেল। রবিবার রবিবার একবার গিয়ে কেষ্টবাবু থ্যাকার সাহেবের হাতে ন'টাকা পঁচিশ পয়সা গুঁজে দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আসেন। তবে ইদানীং মাঝে মাঝে থ্যাকারকে একটু যেন উদ্বিগ্ন মনে হয়।

পাড়ার লোকের সঙ্গে আস্তে আস্তে চেনা পরিচয় হল। সবাই থ্যাকার সাহেবের চাকরের ব্যবসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নাকি ভারি অমায়িক সাহেব, কিন্তু কোত্থেকে একটার পর একটা এমন নিখুঁত চাকর আনায় সে কথা জিজ্ঞাসা করলে এক দম চেপে যায়। চাকররা নিজেরা একেবারে বোবা সেজে থাকে। তবে মিসেস থ্যাকার যে ওদের ট্রেনিং দেয়, এবং থ্যাকার নিজে তার জিপে করে খাবার দাবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে আনে, একথা সবাই জানত। বেহালার ঐ অঞ্চলের মতো সুখী পাড়া আর কোথাও ছিল না।

কিন্তু এ পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু নেই। কাজেই এক সময় দুর্দিন ঘনিয়ে এল।

প্রথম থেকেই মনুয়ার মা কেবলি বলে আড়াইশোর শরীর বোধ হয় খুব ভালো নয়, সকালে এসে যেমন ফুর্তির সঙ্গে কাজ করে, দুপুর যত এগুতে থাকে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে। আবার খেয়ে দেয়ে এসে ফুর্তির সঙ্গে কাজ শুরু করে, একটু রাত হলেই হাত-পা যেন হুকুম মানে না, এটা ফেলে ওটা ভাঙে, দুবার করে না বললে যেন শুনতেও পায় না।

কেষ্টবাবু বললেন, 'ভালো লোক পেয়ে নিশ্চয় বড্ড বেশি খাটাও, তাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফেলার ডবল কাজ করে তো দেখি।'

মনুয়ার মা বললে, 'তা সত্যি। হবেও বা তাই, একদিন যেটা বলে দিই,

রোজ সেটা নিজের থেকে করে, বারবার বলতেও, হয় না। কিন্তু ঐ যে কথা বলে না, কেমন যেন গা ছমছম করে।' কেষ্টবাবু কোনো উত্তর দিলেন না।

সেদিন আড়াইশো কখন বাড়ি চলে গেছে; মনুয়াকে নিয়ে মনুয়ার মাও বোনের বাড়ি গেছে দু'দিনের জন্য; কেষ্টবাবু কিছু কাগজপত্র বাড়িতে এনেছিলেন, পূজোর ছুটির আগে এগুলো শেষ করে ফেলতে পারলে, নিশ্চিন্ত মনে সপরিবারে ডুমরির কাছে মনুয়ার মার মামার চাষবাড়িতে বেড়িয়ে আসা যায়। রাত হয়তো এগারোটা হবে, এমন সময় কানে একটা অস্বাভাবিক হট্টগোল এল। খুব জোরে নয়, কিন্তু কেমন একটা ব্যাপকভাবে, যেন দুশো লোক একসঙ্গে গজর গজর করছে। উদ্বিগ্ন হয়ে কেষ্টবাবু উঠে দাঁড়াতেই দরজায় দমাদম ধাক্কা। দরজা খুলতেই থ্যাকারের মেম সাহেব কেষ্টবাবুর প্রায় বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন 'ডিয়ার মিস্টার ঘোষ, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে, আপনি আমাদের বাঁচান। মার্টিন এখনো বাড়ি ফেরেনি।' আর কথা বেরোয় না; চোখ কপালে উঠে, ঢোঁক গিলে, ভদ্রমহিলা যান আর কি। কুঁজো থেকে দু'এক ঝাপটা জল মুখে দিতেই, একটু সুস্থ হয়ে মেম বললেন, 'এক মিনিট সময়ও নষ্ট করা যায় না, আপনি আমাকে সাইকেলের পিছনে চাপিয়ে নিয়ে চলুন। ওদিকে কি হল কে জানে।'

শুনে কেষ্টবাবুর চক্ষু চড়কগাছ। মেম হাত ধরে টেনে বললেন, 'লোকে কি বলবে তা ভাববারও সময় নেই। আপনি এখুনি আমাকে নিয়ে না গেলে মিস্টার থ্যাকারকে আর বাঁচানো যাবে না।' আর অপেক্ষা না করে তিন মিনিটের মধ্যে সদর দরজায় তালা দিয়ে, মেমকে পিছনে চাপিয়ে কেষ্টবাবু রওনা দিলেন। এই রকম তড়িঘড়ি কাজের জন্যই আপিসে তাঁর এত দ্রুত উন্নতি হয়েছে। ভেবেছিলেন পথে যেতেই মেমের কাছে ব্যাপারখানা শুনে নেবেন। শত্রু, না পুলিস, না ডাকাত, না কালোবাজারি, তাই বা কে জানে।

একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু আপনাদের শেডে কিসের শোরগোল?' মেম কেষ্টবাবুর কাঁধ খিমচে ধরে বললেন 'হারি হারি, ও কিছু নয়, ওরা গ্রাম্বল্ করছে।'

'কারা? চাকররা?'

'ইয়েস, ইয়েস, আরো তাড়াতাড়ি সাইকেল চলে না?'

তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর পাওয়া যাবে না জেনে, তাঁর নির্দেশ মতো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে, মিনিট কুড়ির মধ্যে একটা নির্জন আম-

গাছের পেছনে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে এনে, মেম তাঁকে থামিয়ে একটা প্রকাণ্ড বন্ধ গেটের ওপরে টর্চ ফেললেন। শক্ত লোহার গেট, তার মাথায় মস্ত সাইনবোর্ডে লেখা—থ্যাকারসন পিগারি।

কেষ্টবাবু তো অবাক। 'এখানে থ্যাকারকে পাওয়া যাবে?'

'ভগবান তাই করুন, যেন তাকে পাওয়া যায়।'

'কলিং-বেল টিপি?'

কেউ খুলে দেবে না, সে সময় পার হয়ে গেছে। এই নিন চাবি, ঐ গোল ছ্যাঁদা দিয়ে হাত গলিয়ে ভিতরকার-তালা খুলে ফেলুন। আমি পারছি না, আমার হাত কাঁপছে। তা ছাড়া—'

ততক্ষণে তালা খুলে ফেলে কেষ্টবাবু বললেন, 'তাছাড়া কি?

'যদি—যদি কিছুতে খামচে ধরে!'

তাড়াতাড়ি হাত বের করে নিয়ে কেষ্টবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'কি? কিসে খামচাবে?'

মেম টর্চটা নিবিয়ে ফিসফিস করে বললেন 'ও কি? ও কি?'

টর্চ নেবালে সে কি অন্ধকার, কি অন্ধকার! অন্ধকারের মধ্যেই কারা যেন ভেতর থেকে গেট ঠেলে খুলে, হুড়মুড় করে বেরিয়ে, অমানুষিক শব্দ করতে করতে, কেষ্টবাবুকে আর মিসেস্ থ্যাকারকে মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে টাড়িয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!

তারপর সব চুপ। অনেক কষ্টে উঠে বসে ভয়ে ভয়ে কেষ্টবাবু ডাকলেন, 'মিসেস্ থ্যাকার, বেঁচে আছেন?'

'আছি, এখানো আছি, কিন্তু এবার ভয়েই মরে যাব। তার কি সর্বনাশ হল কে জানে।'

এঁওকে ঠেকা দিতে দিতে উঠলেন দুজনে, টর্চের আলো ফেলে সাবধানে এগুতেও লাগলেন। কেষ্টবাবু ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'বাঘটাঘ নয় তো?'

কাষ্ঠ হেসে মিসেস্ থ্যাকার বললেন—'নো, নো, বাঘ হবে কেন?'

'তবে যে চিড়িয়াখানার গন্ধ পাচ্ছি।'

মিসেস্ থ্যাকারকে তখন হিস্টিরিয়ায় ধরল, হি—হি—হি করে সে কি বিকট হাসি। কেষ্টবাবুর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, হাত পা পেটে সেঁধোল। তারি মধ্যে একটা গোঙানির শব্দ কানে এল।

হঠাৎ মিসেস্ থ্যাকারের হিস্টিরিয়া সেরে গেল। ততক্ষণে ওঁরা পিগারির ভেতরে এসে ঢুকেছেন। পিগটিগ আছে বলে মনে হল না, তারাই বোধ হয় হুড়মুড় করে পালিয়েছিল। টর্চের ক্ষীণ আলোকে বিশাল হল্‌ঘরের কতটুকু দেখা যায়। আবার গোঙানি শুনে সেইদিকে টর্চ ফেলে দেখা গেল মস্ত একটা স্নানের টব, উপুড় হয়ে একটু একটু নড়ছে। আর কথা নেই। 'এই যে মিস্টার থ্যাকার, আমরা এসে পড়েছি!' এই বলে যেই না টবটাকে কেষ্টবাবু তুলে ধরেছেন, ঝটকা মেরে চিমড়ে চেহারার কি একটা বেরিয়ে পড়ে কিচির মিচির করতে করতে এক লাফে খোলা দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল।

মিসেস্ থ্যাকার ফিসফিস করে বললেন 'যাক, আর কোনো ভয় নেই। মার্টিন, কোথায় তুমি?' অন্তরালে থ্যাকার গোঁ-গোঁ করে উঠলেন।

মিসেস থ্যাকার বললেন—'নিশ্চয় ওঁর অফিস ঘরে।' অপিসঘরের দরজায় বাইরে থেকে ছিটকিনি তোলা। ছিটকিনি খুলে দেখা গেল, চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি বাঁধা, এই কি মিস্টার থ্যাকার?

তাকে খুলে, মাথায় জল দিয়ে, দেরাজ থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বের করে, সুস্থ করতেই আধ ঘণ্টার বেশি কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত যখন রুমাল দিয়ে মুখ মাথা মুছে একটু মানুষের মতো হয়ে উঠল থ্যাকার, মিসেস থ্যাকার কেষ্টবাবুর গলা জড়িয়ে দু গালে দুটো চুমো খেয়ে, কেঁদে বললেন, 'আপনি আজ আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

কেষ্টবাবু তাকে কোনোমতে সরিয়ে, বললেন, 'আশা করি এসবের একটা এক্সপ্ল্যানেশন পাব?'

থ্যাকার বললেন, 'কাল সব বলব। কাল রবিবার আছে, সারাদিন ধরে বলব, শুনে চুলদাড়ি খাড়া হয়ে যাবে।'

শেষ পর্যন্ত তাই হল। কোনোমতে থ্যাকার তাঁর জিপ চালিয়ে ওঁদের নিয়ে বাড়ি এলেন, কেষ্টবাবুর সাইকেলটাকে পেছনে তুলে নেওয়া হল। নিজের বাড়ির দরজায় নেমেই কেষ্টবাবু ভয়ে ভয়ে শেডের দিকে তাকালেন। সব নিঝুম। থ্যাকার বললেন, 'কোনো ভয় নেই; ওদের এখন না জাগালে একটানা সাত আট ঘণ্টা ঘুমোবে। কাল সকালে আটটায় আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেলে খুশি হব, মিস্টার ঘোষ। আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।'

কেষ্টবাবু ভেবেছিলেন এত উত্তেজনার পর রাতে ঘুম হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দেওয়া মাত্র সে কি ঘুম। সকালে জানলা দিয়ে

মুখে রোদ পড়াতে সে ঘুম ভাঙল। তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। কেমন যেন একটা ভারি হাল্কা নিশ্চিন্ত ভাব এল মনে। তার কারণটা বোঝা গেল যেই পাশের শেডের ওপর চোখ পড়ল। একতলায় দোতলায় সারি সারি জানালা খোলা, তার ভেতর দিয়ে ওপারের নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত পাড়াটার আবহাওয়া বদলে গেছে।

কাপড়-চোপড় ছেড়ে নিয়ে এলেন কেষ্টবাবু। বলা বাহুল্য আড়াইশো আসেনি; নিজের মনে নিশ্চিত জানতেন কেষ্টবাবু আড়াইশো ও তার দু'শো উনপঞ্চাশজন সঙ্গীসাথী আর কখনো কারো বাড়িতে কাজ করতে আসবে না। ভেবেও বড় আরাম হল। পাশের বাড়ির খোলা সরজা দিয়ে কেষ্টবাবু ভেতরে গেলেন। দরজাটাকে কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগল, তার ডান পাশেও হাতে-লেখা সাইনবোর্ডটি আর নেই।

কেষ্টবাবুকে দেখেই থ্যাকার সাহেব তাড়াতাড়ি কৌচের পেছনে একটি কালো বোতল লুকিয়ে ফেলে মুখ মুছে লজ্জিতভাবে বললেন,—'কালকে যা শক্ পেয়েছিলাম, একটু ওষুধপত্র না খেয়ে পারছি না। চাকরের এজেন্সী তুলেই দিলাম, মিস্টার ঘোষ, বড় ঝামেলা। তাছাড়া মুকুটি বলে একজন লোক অনেকদিন থেকেই ওটাকে ভাড়া নিতে চাইছে, কোল্ড স্টোরেজ করবে বলছে, একটু আগে চিঠি লিখে মত দিয়ে দিলাম। আটশো টাকা ভাড়া দেবে, মন্দ কি? আমরা দুজনে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে দিব্যি রিটায়ার্ড লাইফ উপভোগ করতে পারব। চলুন, ব্রেকফাস্ট তৈরী।'

চারদিকের দরজা-জানলা খোলা, ঘরদোর আলোয় ভরা, টেবিলে গোলাপী চাদর পাতা, ফুলদানিতে কুর্চি ফুলের ছড়া। মেম জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেকন চলে কি?'

'আপনাদের পিগারির নাকি?'

'আমাদের আবার পিগারির কোথায়?'

'কেন, থ্যাকারসন পিগারি কার?'

'ওঃ!'

মিসেস থ্যাকার কেষ্টবাবুর সামনে পাত্র এগিয়ে দিলেন; কেষ্টবাবু প্রচুর পরিমাণে আহার করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—'তা হলে পিগারিতে কি হয়?'

'চাষ হয়।'

'কিসের চাষ ?'

'চাকরের বলতে পারেন।'

'সে আবার কি ?'

'কেন, এতে অত আশ্চর্য হবার কি আছে, তা তো বুঝলাম না। চাকর যখন পাওয়া যায় না, তখন চাষ করে বানিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় কি ?'

কেষ্টবাবু বিস্মিত হলেন। আহারান্তে সিগারেট ধরিয়ে থ্যাকার বললেন, 'ব্যবসার জগতে সাফল্যের মূলমন্ত্র হল, যে জিনিসের যথেষ্ট চাহিদা আছে অথচ মাল নেই, সে জিনিস যোগাতে পারলেই আর ভাবনা নেই। আজকাল চাকর চায় সবাই, অথচ চাকর পাওয়া যায় না। তা'হলে হয় চাকর আনাতে হয়, নয়তো বানাতে হয়। আনানোর মেলা হাঙ্গামা, তাছাড়া বানাবার ফলমূলা যখন আমার রয়েছে, তখন অত হাঙ্গামার মধ্যে যাবই বা কেন ?'

'কোথায় পেলেন ফরমূলা ?'

'সে এক মজার ব্যাপার। আগে পুরোনো কাগজের ব্যবসা করতাম। একবার ব্রিটিশ আমলের পেটেনট আফিস থেকে পনেরো মণ কাগজ কিনলাম। প্রায় সবই দরখাস্ত। গিন্নি উনুন ধরাবার জন্যে কয়েকটাকে ঘরে এনেছিলেন, হঠাৎ তার একটার ওপর চোখ পড়ল—চাকর বানাবার ফরমূলা। সেকালের নিয়মমতো সায়েববা নেটিভদের পাঠানো সব দরখাস্ত ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছিল। সেইটি পড়ে আমার চোখ কপালে উঠে গেল। পরে ও ব্যবসা ফেল হলে, একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলাম এবং অব্যর্থ ফল-স্বরূপ পেলাম ঐ বিশ্বাস-ঘাতক থ্যাকারসনকে। ঐ আমার তৈরী প্রথম চাকর। লাই দিয়ে মাথায় তুলেছিলাম। লোভ বড় বেড়ে গেল, তখন আর চাকর থাকতে চায় না, মুনিব হতে চায়। কাল আমাকে বেঁধে ঘর বন্ধ করে বোধ হয় মেরেই ফেলত, যদি না ওরা ওকে টব চাপা দিত।'

'ওরা কারা ?'

'কাঁচা মশলারা। তাদের ওপর কি কম অত্যাচার করত হতভাগা। কাল বাগে পেয়ে টব চাপা দিয়ে তোমরা যেই গেট খুলেছো, সবাই ভেগেছে। ততক্ষণে থ্যাকারসনেরও ওষুধের গুণ কেটে গেছে, সে-ও তাই ছাড়া পেয়েই পালিয়েছে।'

'কিন্তু কোথায় পালাল সবাই ?'

'শেডের চাকররাও যেখানে পালিয়েছে। সম্ভবতঃ সুন্দরবনে। যেখান থেকে ওদের ধরে আনা হয়েছিল। অত অবাক হচ্ছেন কেন, মিস্টার ঘোষ ? তা হলে

শুনুন গোড়া থেকে। ফরমূলাতে শেকড় বাকল দিয়ে তৈরী একটা ওষুধের ব্যবস্থা লেখা ছিল। আপনি জানেন নিশ্চয় মানুষরা বাঁদরের বংশধর নয়, কিন্তু জাত-ভাই। কোনো অজ্ঞাত অতীতে দুটো লাইন আলাদা হয়ে গেছিল। মানুষের লাইনের অনেক ক্রমোন্নতি হয়েছে, কিন্তু বাঁদরদের হয় নি। ঐ ওষুধ খাইয়ে বাঁদরদের ক্রমোন্নতি ঘটানো যায়, যাতে ঠিক মানুষ না হলেও, মানুষের যোগ্য জাতভাই তৈরী করা যায়। পরিমিত ডোজে ওষুধ দিলে তারা খুব ভালো চাকর হতে পারে, কিন্তু মুনিব হতে পারে না, কথা বুঝতে পারে, বলতে পারে না। থ্যাকারসনের পিগারিতে বাঁদরদের এনে ওষুধ খাইয়ে ট্রেনিং দেওয়া হত; তারপর তাদের চাকরি ঠিক হলেই এখানে নিয়ে এসে শেডে রাখার বন্দোবস্ত হত। সবই হত, শুধু একটা ফ্যাকড়া থেকে গেছিল।'

কেষ্টবাবু তো অবাক। 'কি আবার ফ্যাকড়া থেকে গেছিল? ক্লাস এ-ওয়ান্ চাকর তৈরী করতে পারেন তো আপনারা।'

'তা পারি কিন্তু মুস্কিল হল যে ওষুধ খাবার পর মাত্র সাড়ে আট ঘণ্টা তার প্রভাব থাকে; তারপর আস্তে আস্তে ওরা ঝিমিয়ে পড়ে, জাগে যখন সম্পূর্ণ বাঁদুরে ভাব নিয়ে জাগে, যদি না আটঘণ্টা পরপর এক ডোজ করে ওষুধ দেওয়া যায়। কাল রাতে শেডের বাসিন্দাদের ওষুধ পড়েনি, সারারাত তারা ঘুমিয়ে আজ ভোরে এক পাল বাঁদর হয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু দরজা খুলল কি করে তাই ভাবি, ওটা তো এদিক থেকে তালা বন্ধ থাকার কথা।'

মিসেস থ্যাকার এতক্ষণ পর কথা বললেন। 'দরজা আমি খুলে দিয়েছিলাম কাল রাতে ফিরে এসেই। আর সইতে পারছিলাম না।'

কেষ্টবাবু বললেন, 'তা হলে থ্যাকারসনের শত্রুতার জন্যই কালকের ব্যাপারটা ঘটেছিল? তবে কি অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি?'

থ্যাকার মাথা চাপড়ে বললেন, 'আমার দোষে সব হয়েছে। গোড়াতেই ওকে বেশি ডোজ দিয়েছিলাম, প্রথম পরীক্ষা তো, ফলাফল বুঝি নি। ব্যাটা চিরকাল আমাকে হিংসা করে, কিন্তু কিছু করতে পারে না, আট ঘণ্টা পর আমি ওষুধ না দিলে ওরই সর্বনাশ! ফরমূলা পেলে নিজেই ওষুধ তৈরী করে নিতে পারত। সত্যি কথাই বলি মিঃ ঘোষ, ঐ আট ঘণ্টার জন্য ওর মানুষের সমান বুদ্ধি হত, কথা বলতে পারত, পড়তে পারত, সব শিখিয়েছিলাম। ফরমূলা আদায় করার জন্য কাল আমাকে বন্ধ করেছিল। ওটি পেলেই আমারো জীবন শেষ হত।'

মিসেস থ্যাকার বললেন, 'কিন্তু পায়নি কেন? রেখেছিলে কোথায়?'

থ্যাকার হাসতে লাগল, 'তোমার মতো আমিও যে আর পেরে উঠছিলাম না, তাই থ্যাকারসনের সামনেই ওষুধ তৈরীর উনুনে ওটি পুরে দিয়েছিলাম, ও বুঝতেও পারেনি। আমাকে বন্ধ করে, নিজে টব চাপা পড়ে আট ঘণ্টা ফুরুতে না ফুরুতে আগে যেমন ছিল তেমন!—কিন্তু মিস্টার ঘোষ, আপনি আমার জীবনদাতা, চাকর ছাড়া আপনার যে বড় কষ্ট হবে, তার কি উপায় হবে?'

কেষ্টবাবু উঠে পড়ে বললেন, 'থ্যাংকিউ, মিঃ থ্যাকার। আমাদের জন্য ভাববেন না; উপায় আগেই হয়েছে। গিন্নি বোনের বাড়ি থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চাকরকে ভাগিয়ে আনতে গেছেন। আপনার কাছে কথাটা কি করে ভাঙি, আড়াইশোকে কি করে বিদায় করি, তাই ভাবছিলাম। লোমশ হাতের রান্না ক'দিন খাওয়া যায় বলুন? আচ্ছা গুড বাই।'

মিঃ থ্যাকার হাত পেতে বললেন, 'দাঁড়ান একটু, আজ না রবিবার, আমার ন'টাকা পঁচিশ পয়সা দিয়ে তবে যাবেন।'

———

৯. শূন্য

পাহাড়ে যারা কখনো বর্ষা কাটায় নি তারা পরিবেশটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে না। সময়টা সন্ধ্যাবেলা। বাইরে প্রচণ্ড শীত, ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, সোজা হিমালয় থেকে কনকনে হাওয়া বইছে, জলের ধারাগুলো মুখে চোখে তীরের মতো বিঁধছে। ঘরে ঘরে কাঁচের দরজা জানলা এঁটে বন্ধ, ভিতরে আলো জ্বলছে, সুখী লোকেরা সেখানে বাস করে। উঁচু নিচু পিছল রাস্তা, এখানে ওখানে গোল গোল পাথর ছড়ানো, তার উপর পা পড়লেই গড়িয়ে যায়। চড়াই পথ, হাঁটতে গেলে হাঁপ ধরে, আস্তে হাঁটা নিরাপদ মনে হয় না। নিজের ক্লিষ্ট গরম নিশ্বাস জমে গিয়ে চশমার কাঁচ ঝাপসা করে দিচ্ছে।

কোনো গতিকে বাকি পথটুকু পার হয়ে, বটাই জ্যাঠাইমাদের দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ রাতে সে যে কি হুড়মুড় ঝন্ ঝন্ শব্দ সে আর কি বলব। পটলা দরজা খুলে দিতেই, তাকে ঠেলে ভিতরে ঢুকে, নিজের হাতে ছিটকিনি তুলে, দরজা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বটাই হাঁপাতে লাগল।

লোহার আংঠায় কাঠ কয়লা জেলে কাপড় শুকুনোর সোঁদা গন্ধ ঘরময় ভুর ভুর করছে; পাশের রান্নাঘর থেকে জ্যাঠাইমার খুন্তি নাড়ার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ আসছে; টেবিলে বসানো কাঁচের ডোমপরানো বড় ল্যাম্পের আলো ছাদের ওপর গোল হয়ে পড়ছে; কেউ বই দেখছে, কেউ মোজা বুনছে, কেউ চিঠি লিখছে। আঃ, বাঁচা গেল। এখানে সব কিছু কি সাধারণ, কি স্বাভাবিক, কি নিরাপদ।

বটাইয়ের হাঁটুদুটো হঠাৎ মুড়ে গেল, আরেকটু হলেই হাত পা এলিয়ে ধপাস্ করে মাটিতে পড়েই যাচ্ছিল, ভাগ্যিস দু তিন জন ছুটে এসে ধরে ফেলল।

কি হয়েছে রে বটাই? মাথা ঘুরছে? পেট কামড়াচ্ছে? অত মোগলাই খানা রোজ রোজ গিলিস্ কেন? বুক ধড়ফড় করছে না তো?

চাপা গলায় বটাই বললে,—'না, না, অত সামান্য কিছুতে কি আর এত আপ্‌সেট হয়ে পড়ি। ছোটবেলা থেকে যা কিছু শিখে এসেছি, সব এলিয়ে যাচ্ছে।'

পটলা বলল—'তা বললে চলবে কেন, বটাইদা? তোরা বৈজ্ঞানিক, তোরা ইয়ে অঙ্ক টঙ্ক বানাস্, ছোটরা তাই শেখে। এখন সেসব এলিয়ে দিলে চলবে কেন?'

জ্যাঠাইমা কোনো কথা না বলে, রান্নাঘরের সব চাইতে উঁচু তাকে ওষুধের শিশির পিছন থেকে একটা চ্যাপটা সবুজ বোতল নামিয়ে আনলেন। বোতলটা দেখেই ইজিচেয়ার থেকে জ্যাঠামশাই ব্যস্ত হয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জ্যাঠাইমা কনুই দিয়ে তাঁকে সরিয়ে, অন্য কেউ কিছু টের পাবার আগেই, শিশির তিন ভাগ গর্ গর্ করে বটাইয়ের গলার মধ্যে ঢেলে দিলেন। ঢোক গিলে কেশে, হেঁচকি তুলে, বিষম খেয়ে, দম আটকে, মাথা ঝাড়া দিতেই, মস্তিষ্কটা একেপারে পরিষ্কার হয়ে গেল।

উঠে বসে স্বাভাবিক গলায় বটাই বললে, 'জানলা দিয়ে একটু তাকিয়ে দেখতো পটল, আমার পেছন পেছন এবাড়ি পর্যন্ত কেউ বা কিছু এসেছে কি না।' এই অবধি শুনলেই পটলার হাত-পা ঠাণ্ডা। জ্যাঠাইমাও বললেন—'ওসব কি বলছিস রে বটাই, শুনলেও গা শির শির করে! কে আবার তোর পিছু নেবে বাবা, শহরের প্রায় প্রত্যেকটি লোকই তো তোর চেনা, এক যদি কোনো চেঞ্জার—'

নেবুদি বাধা দিয়ে বললে—'তাছাড়া ওর পেছু নেবেই বা কেন? ওর আছেটা কি? একটা পাগলা বৈজ্ঞানিক সাধুর চ্যালা; ও কেন, তার গুরুটিরই বা আছে কি? থাকার মধ্যে ঐ এক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের কেঠো বাড়ি আর নষ্ট করবার মতো অঢেল সময়—'

জ্যাঠাইমা হঠাৎ বললেন—'ছাখ্ বটাই, মিছিমিছি আমাদের ভয় দেখাচ্ছিস্ না তো, সেই যেমন রবারের সাপ নিয়ে—ঐ যাঃ, সূর্য ডোবার পর সাপ বলে ফেললাম!'

ইজিচেয়ার থেকে জ্যাঠামশাই এতক্ষণ বাদে একটু সুযোগ পেয়ে বললেন—'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নে বটাই, ঐ স্যারই তোর ডাল ভাত ঘি নুন, ওর ওপর নির্ভর করে থাকলে তোর ভাল বই মন্দ হবে না। তোর বাপ তো এন্তার ধার ছাড়া আর কিছু রেখে যায় নি।'

নেবুদিও ম্যাও ধরে বলতে লাগল—'কাজ করতে অত আপত্তিটা কি তা তো বুঝলাম না। মুনিবটি ঐ ভোলানাথ পাগল-ছাগল, সময় হবার আগে কাজ কর্ম ছেড়ে কম পেনসান নিয়ে, বাপের ভিটেয় বসে বৈজ্ঞানিক গবেষণা না হাতি না

যেন কি করেন, তুই তাঁর পেছন পেছন থামা ধরে বেড়াস্। তার বদলে চার বেলা হোটেল থেকে আনা চব্যচুষ্য সাঁটাস্ আর গদিওলা ছাপর খাটে সারারাত নাক ডাকাস্ আর মাসকাবারে করকরে কতকগুলো টাকা গুনে নিস্। এতে অত পালিয়ে চলে আসার কি হল শুনি? আর কি এত গোপন সমীক্ষা চলে যে, চাকর-টাকর কাউকে রাতে থাকতে দেওয়া হয় না?'

বটাই হতাশ ভাবে এর মুখ থেকে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল—'শূন্যকে গুটিয়ে ফেলা যায়, তা জানো?' শুনে সবাই অবাক্। আধপাগলা বৈজ্ঞানিকটার সঙ্গে থেকে থেকে বটাইয়ের মাথাটাও খারাপ হল নাকি? গুরুটির তো চিরকালই একটু মাথাটা খারাপ, বিয়ে-না-হওয়া লোকদের যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু বটাই হতভাগা মনে ভেবেছে কি? জ্যাঠাইমা দারুণ চটে গেলেন, 'বলি, কথার কি কোন মাথামুণ্ডু আছে তোর? শূন্যটা কি একটা মাদুর যে ইচ্ছেমতো গুটিয়ে ফেলা যায়? আসলে তোর একটা ওষুধপত্র করা দরকার। দেখি সেই বীরেশ্বরের মাদুলিটা যদি খুঁজে পাওয়া যায়—'

জ্যাঠামশাই আশ্চর্য হয়ে বললেন—'বীরেশ্বরের মাদুলি? সেটা না ছেলে হবার মাদুলি, ও দিয়ে কি হবে?' জ্যাঠাইমা বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'আহা, তা বললে চলবে কেন? তোমার পেট ব্যথা কিসে সেরেছিল? সেই বীরেশ্বরের মাদুলি দিয়েই না? মা'র দেওয়া পেট ব্যথার মাদুলিটা তো কোনকালে হারিয়ে গেছে। সব মাদুলিই ধন্বন্তরী, সব সারায়।'

বটাই মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল, মাঝে মাঝে চোখ তুলে ভয়ে ভয়ে জানলার দিকে তাকাচ্ছিল। পটলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল—'চালাকি রাখ বটাই দা, ব্যাপারটা কি খুলে বল্।'

বটাই পকেট থেকে একটা ছোট জিনিস বের করে ঠুং করে টেবিলের ওপর ফেলে দিল। একটা এক-চোখো চশমা, যাকে মনোক্ল্ বলে। ফ্রেম লাগানো কালো কাঁচের চশমা, নাকে চিমটি দেবার ক্লিপের পাশে একটা সরু কাঁটা, ফ্রেমের উপর খুদে খুদে অক্ষরে আঁকিবুঁকি কাটা, কাঁচটা ঠিক কালো নয়, কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া। তার উপর ল্যাম্পের আলো পড়ে কি রকম যেন রং বদলাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল।

নেবুদির সবটাতেই সর্দারি করা চাই, একবার দেখেই অমনি তুলে নিয়ে চোখে দিতে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বটাইও ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মনোক্ল্‌টাকে কেড়ে নিয়েছে।

'উঃ, আরেকটু হলেই কি বিপদ ডেকে আনতে নেবুদি, তা তুমি নিজেই জানো না।' ক্লিক্ করে বটাই কাঁটাটাকে একটু সরিয়ে দিল, অমনি যেন রঙের খেলা বন্ধ হয়ে কাঁচটা একটা সাধারণ পরকলার মতো হয়ে গেল। ঘরের সকলের গায়ে কাঁটা দিল। বটাইকে বকাবকি করাও বন্ধ হল।

বটাই পটলাকে বলল, 'জানলার পর্দাগুলো টেনে দে। এরকম বে-আব্রু ভাবে বাস করা নিরাপদ নয়। মুন্না পাহাড়ের চূড়ো থেকে চোখে দূরবীন লাগিয়ে কেউ দেখলে, তোমাদের হাঁড়িতে কি ফুটছে তাও জানতে পারবে।'

নেবুদি উঠে পর্দাগুলো টেনে দিয়ে বলল—'কে তোমার দূরবীন লাগিয়ে আমাদের রান্নার হাঁড়ি দেখছে আর দেখলেই বা হয়েছেটা কি? দূর থেকে দেখছে বই তো নয়।'

বটাই কাষ্ঠ হেসে বললে—'দূর কাকে বলে? দূর বলে কিছু আছে নাকি? হেঁটে কিম্বা গাড়ি চড়ে কিম্বা প্লেনে চেপে একটু এগুলেই, দূর আর দূর থাকে না। একেবারে হাতের নাগালে এসে যায়। তেমনি নিজে না এগিয়ে দূরকে টেনে গুটিয়ে কাছে এনে ফেললেও আর সে দূর থাকে না, দোরগোড়ায় পৌঁছয়, ঘরে এসে ঢোকে।'

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাঘরের দরজাটার ওপরের আর নিচের ছিটকিনি এঁটে দিয়ে, ফিরে এসে ধপ্ করে মোড়ায় বসে পড়লেন। তাঁর মুখটাকে কেমন সাদা মনে হতে লাগল। কালো চশমাটাকে হাতে তুলে নিয়ে বটাই বলতে লাগল।

'সাত বছরের গবেষণার ফল এটা, সারা পৃথিবীতে এরকম আর একটিও নেই। সাত বছর বলছি কেন, এর পেছনে আসলে সাতাশ বছরের সাধনা আছে। জ্যাঠাইমা, স্যারের বাবার বিষয়ে তুমি কি জান, বল।'

'কতটুকুই বা জানি যে বলব? উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক ছিলেন, দেশ বিদেশে নামডাক, অঢেল পয়সা, তবু শেষটা কি যে হল।'

'কি হল তাই তো শুনতে চাই।'

জ্যাঠাইমা যেন একটু ফাঁপরে পড়ে গেলেন—'ত্যাখ্, প্রায় সবই হয় তো শুধু কানাঘুষো, বাজে গুজব। আমি তখন তোর জ্যাঠামশায়ের কর্মস্থলে, বর্মায়। কে যেন লিখেছিল যে অবিনাশদার বাবা অন্তর্ধান করেছেন। তার জন্য তাঁকে তেমন দোষও দেওয়া যায় না, কম জ্বালায় নি তো বেচারাকে অবিনাশদার মা'টি। তবু কি ভাগ্যি সে পাহাড়ে কিছুতেই আসত না। মামা এইখানে ল্যাবরেটরি করে,

গবেষণা নিয়েই পড়ে থাকতেন। তারপর হঠাৎ একদিন নিখোঁজ, একেবারে খালি হাতে নিখোঁজ, জিনিসপত্র, কাপড় জামা, বই যন্ত্রপাতি যেমনকে তেমন, শুধু মামা নেই! আর কেউ তাঁকে দেখে নি। নিন্দুকরা বলত নাকি কোন সুন্দরী পাহাড়ি কন্যাও সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ। হয় তো বিদেশে গিয়ে আবার মেলা পয়সাকড়ি বাড়ি-ঘর করে সুন্দরী পাহাড়ি বৌ নিয়ে, দিব্যি সুখে শেষ জীবনটা কাটিয়েছেন। আমি তাতে কোনো দোষ দেখি না।"

আস্তে আস্তে বটাই বললে—'না, সে মেয়েটি মোটেই ওঁর সঙ্গে যায়নি। স্যার তাকে খুঁজে বের করে, তার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন।'

জ্যাঠামশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের আবার সাহায্য? অবিনাশ তো চশমা তৈরী করে, তোমার এটা যেমন করেছে। আমাকেও বছর পাঁচেক আগে একটা দেখিয়েছিল, ভারি অদ্ভুত সেটা। কাঁচ, অথচ তার মধ্যে দিয়ে দেখলে সব কিছুকে কখনো বেগনি, কখনো ঘন নীল, কখনো ফিকে নীল, কখনো সবুজ, কখনো হলদে, কখনো কমলা রঙ, কখনো লাল দেখায়, স্রেফ্ রামধনু। এখন আবার তার কি নতুন পাগলামিতে ধরল?'

জ্যাঠাইমা চোখ মুছলেন। 'বলতে গেলে জন্মদুঃখী, ওর বিষয়ে অমন করে ব'ল না! বাপ ফেরারী, মা দজ্জাল, বিয়ে করল না, অকালে চাকরি ছেড়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে আছে। কি এমন বয়স, পঞ্চাশও নয়। বটাইকে কি সুখেই রেখেছে, রোজ মুর্গি মটন—আচ্ছা বটাই, বিপদ যদি কিছু ঘটেই থাকে—তুই এমনি এমনি এই জলঝেড়ে পালিয়ে এলি আর সেই বিপদের মাঝখানে নিরীহ মানুষটাকে একলা ফেলে—'

জানলার কাছ থেকে পটলা বলল, 'খুব যে একলা তাতো মনে হচ্ছে না, মা; ঘরে ঘরে আলো, কারা সব ঘুরছে ফিরছে—ওকি বটাইদা, কি হল?'

বটাই বললে, 'যদি সাহসে কুলোত, এই চশমাটাকে ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলতাম! যদিও এটা অনেক বছরের অনেক সাধনার ফল এবং হয়তো এর গায়ে স্যারের বাবার রক্ত লেগে আছে, আর শুধু তাই নয়, এর মধ্যেই স্যারকে বাঁচাবার একমাত্র উপায়ও লুকোনো আছে।'

নেবুদির স্বামী বিনয়বাবু চশমাটাকে তুলে কি দেখছিলেন, রক্ত লেগে থাকার কথা শুনেই ধপাস করে সেটাকে টেবিলে ফেলে, রুমাল দিয়ে হাত মুছতে লাগলেন। নেবুদি বলল—'জানলা-টানলা সব বন্ধ আছে, কোনো ভয় নেই।'

বটাই অদ্ভুত করে হাসল। 'কোনো ভয় নেই! হায় রে মুখ্যুরা কি সুখেই

না বাস করে! জানলা বন্ধ, অতএব নিরাপদ। ওদিকে লক্ষ কোটি মাইল দূর থেকে—কি করে বোঝাবো তোমাদের? বি-এ, এম-এ পাশ করেছো বটে, কিন্তু কিছুই জান না। জ্যাঠাইমা যেমন পেটব্যথার জন্যে ছেলে-হওয়ার মাদুলি দিয়ে নিশ্চিন্ত, তোমরাও তাই। বিজ্ঞানের খুঁটি আঁকড়ে সব নিরাপদ হতে চাও! বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিরাপত্তার যবনিকাটা ছুঁড়ে দেয়, তাও জান না? অভাবনীয় সব বিপদ, যা তোমরা কল্পনাও করতে পার না—' বটাই দম নেবার জন্য থামতেই, পটলা জানলার কাছ থেকে উঠে নেবুদি আর জ্যাঠাইমার মাঝখানে যে একটুখানি ফাঁক ছিল, তার মধ্যে ঠেসেঠুসে বসে পড়ল।

বটাই বলল, দূর বলে কিছু নেই, নেবুদি। স্যারের বাড়ি থেকে এখানে আসতে, আমাকে প্রথম আধ মাইল নিচে নামতে হল, তারপর ঝর্ণার ওপরের কাঠের পুল পার হয়ে, এদিকে আবার আধ মাইল চড়াই উঠতে হল, এক ঘণ্টা সময় লাগল, বেশ দূরই বলতে হবে। অথচ তোমাদের বাগানের কোণা থেকে গুলি দিয়ে স্যারের বাগানের পাখি মারা যায়, এত কাছে। দূর গুটিয়ে গেলেই কাছে চলে আসে।'

শুকনো গলায় জ্যাঠাইমা বললেন—'কি করে গুটোবে? কোনো দিনও তো গুটিয়েছে বলে শুনি নি।'

'অন্ততঃ একবার গুটিয়েছিল নিশ্চয়ই, জ্যাঠাইমা। স্যারের বাপের কালেই গুটোবার রহস্য জানা গেছিল, তিনিই জেনেছিলেন, লিখে রেখেও গেছিলেন। সেই লেখা পড়ে তারপর আরো অনেক দূর এগিয়ে, এই চশমা তৈরী হয়েছে। এটাকে অবিশ্যি চশমা বলা ভুল। এটা একটা সর্বনাশের কল। আমার মনে হয় স্যারের বাবার অদৃশ্য হবার মূলে এই রকম একটা চশমা ছিল।'

ঘরে কারো মুখে কথা নেই। সেই নিস্তব্ধ রাতে বাইরের অবিরাম বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কি একটা করুণ মিষ্টি মন-উদাস করা সুর যেন সবার কানে আসতে লাগল। বটাই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল—'শুনতে পাচ্ছ? সর্বনাশের গান শুনছ?'

ঠিক এই সময় কে যেন বড় ভয়ে বড় উদ্বেগে দরজার কড়া নাড়ল। ঘরে কেউ নড়েচড়ে না, রা কাড়ে না। বাইরে থেকে সে যে কি নিদারুণ হতাশায় কে ডাকল—'বটাইবাবু, ও বটাইবাবু।'

অমনি বটাইয়ের চেহারা বদলে গেল। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, কালো চশমাটাকে পকেটে ফেলে, দরজার ছিটকিনি খুলে দিল। হুড়মুড় করে যিনি

ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন, বয়স তাঁর বছর পঞ্চাশ হবে, কিন্তু অমন রূপের রাশি কম দেখা যায়। ভালো কাপড়-চোপড় পরা, হাতে গলায় কানে কাঁচা সোনা আর পলার গয়না ল্যাম্পের আলোতে ঝলমল করছে। সাদা রক্তশূন্য মুখে, টানা কালো চোখে সে যে কি নিদারুণ হতাশা, সে ভাষায় বলা যায় না।

'আবার তাই হল, বটাইবাবু? তুমি আমি থাকতে আবার তাই হল? আবার তাই তোমাকে দেখতে হবে? পাহাড়ের উপর থেকে সেই গান, যেই শুনেছি, অমনি ভেবেছি দুঃখের কখনও শেষ হয় না—।'

বটাই বললে,—'না, পেমা পিসি, আবার তাই হবে না, চলুন, স্যারকে বাঁচাই।'

কোথায় উবে গেল বটাইয়ের সব ভয়, কাউকে কিছু না বলে, দরজা হাট করে খোলা রেখে, প্রৌঢ়া মহিলার কনুই ধরে বটাই রওনা হয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত ঘরের সকলে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলো, তারপর নেবুদির ছোট বোন যে বটাইকে মনে মনে ভালোবাসে যদিও মুখে কিছু বলে না, সে উঠে ওদের পিছন পিছন চলল। অমনি যেন কিসের ঘোর কেটে গেল, পটলা, বিনয়বাবু, নেবুদি পিল্লে বলে চাকরটা, সবাই রওনা দিল। জ্যাঠামশাই পর্যন্ত খচমচ করে ইজিচেয়ার থেকে উঠে জ্যাঠাইমাকে বললেন—'ওগো, আমার মফিক্যাপটা কোথায়?'

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে এবং আর সকলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নিচে নামবার সময় যে নেই যে আর কাকেও বলে দিতে হল না, পাকদণ্ডি বেয়ে, দড়ির পুল পার হয়ে, মিনিট পঁচিশের মধ্যেই তারা অবিনাশ মামার বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে গেল। আশ্চর্য সঙ্গীতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে, শরীর অবশ হয়ে পড়ছে, ইচ্ছাশক্তি লোপ পাচ্ছে।

তারি মধ্যে আলো জ্বালা বসবার ঘরের প্রকাণ্ড কাঁচের জানালা দিয়ে অদ্ভুত অভাবনীয় দৃশ্য সকলের চোখে পড়ল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবিনাশ মামা গদি আঁটা চেয়ারের হাতল দুটি আঁকড়ে ধরে বসে আর তাঁর চারদিকে ওরা কারা, ওরা কি, হাঁটছে না ভেসে বেড়াচ্ছে? চোখ মুখ কান মাথা চুল হাত পা সবই আছে, মাঝে মাঝে রূপ নিচ্ছে আবার মাঝে মাঝে যেন আলো ছায়ার সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কি অদ্ভুত চোখ ওদের, এইখানে বসে পড়তে ইচ্ছা করছে। ওরা মেয়ে, না পুরুষ, না তার বাইরে আর কিছু?

স্বাভাবিক শুধু পেমা দিদি আর বটাই, তাদেরও হাত পা কাঁপছে। কাঁপা হাতেই বটাই নেবুদির বোনের হাতে চশমা দিল, বলল, রাখ। কাঁপা হাতেই

গায়ের সব গয়না খুলে পেমাদিদি আঁচল জড়ো করতে লাগলেন। বটাই বাড়ির পিছন দিকের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পেমাদিদি বড় একটা পাথর তুলে কাঁচ ভেঙে গয়নাগুলো ঘরের মধ্যে ফেলে দিলেন। ছোট একটা ঢিপি হয়ে পড়ল সেগুলো, ঘরের উজ্জ্বল আলো লেগে ঝিকমিক করতে লাগল।

অমনি গান থেমে গেল, তার বদলে কি একটা থমথমে নীরবতা, মন ভারি হয়ে ওঠে। তারা অবিনাশ মামাকে ছেড়ে দিয়ে, গয়নাগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, যেন একটা আলোছায়ার স্তূপ, যার রঙ বদলাচ্ছে, আকার বদলাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে, আড়ষ্ট স্তম্ভিত দর্শকরা দেখল ঘরের ওধারের দরজা দিয়ে ঝড়ের মত ঢুকে বটাই অবিনাশ মামাকে কোল পাঁজা করে তুলে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অমনি নেবুদির বোনের হাত থেকে চশমাটা নিয়ে, নিজের চোখে তুলে পেমাদি কাঁধটাকে ঘোরাতে লাগলেন।

সব যেন নড়ে উঠল, সরে গেল। সিনেমার ফিল্মের ঘরবাড়ি যেমন একেক সময় দূরে সরে গিয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি আসবাবে ভরা আলোজ্বলা ঘরসুদ্ধ, ঘরের মধ্যে যারা ছিল তারা সুদ্ধ, সকলের চোখের সামনে থেকে ক্রমে সরে দূর থেকে আরো দূরে, কত দূরে সরে, পাহাড়ের পিছনে দিগন্ত রেখার চেয়েও দূরে মিলিয়ে গেল।

সকলের সম্বিৎ ফিরে এল যখন অচেতন অবিনাশমামাকে নিয়ে হুড়মুড় করে ওদের ঘাড়ের উপর বটাই পড়েই মুচ্ছো গেল। পেমাদিদির একটা কাজ বাকি ছিল, পাথর দিয়ে ঠুকে চশমাটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। তারার আলোয় সব পরিষ্কার দেখা গেল।

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর সবাই উঠে, ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল, অবিনাশ মামার আর বটাইয়ের সেবা শুশ্রূষা করল। কল থেকে ঝরঝর করে জল পড়ছে, বড় ষ্টোভটা সোঁ-সোঁ শব্দ করছে, দুধ গরম করে অবিনাশমামা আর বটাইকে খাইয়ে সুস্থ করে তোলা হল। কারো মুখে কথা নেই, প্রশ্নও নেই, তার উত্তরও নেই। সব সাধারণ, স্বাভাবিক, নিরাপদ।

ততক্ষণে রাত বেড়েছে; সন্ধ্যার আগে রোজকার মতো নিচের হোটেল থেকে পাঠানো খাবারগুলো ঢাকা পড়ে থাকল। আরো রাত্রে ভাঙা চাঁদ উঠল, তারপর হাঁকডাক, চ্যাঁচামেচি, লোকজন নিয়ে মস্কি-ক্যাপ পরে সত্যি সত্যি জ্যাঠামশাই এসে উপস্থিত।

বাইরের থেকে ওঁরা ভাবলেন বুঝি পাহাড়ের গায়ে ধ্বস নেমে অবিনাশমামার

বসবার ঘরটি, তাঁর কাগজপত্র, যন্ত্রপাতির বেশির ভাগ, চেয়ার টেবিল, ছবি, ফুলদানি সবসুদ্ধ খোয়া গেছে। জ্যাঠামশাই বললেন—'না অবিনাশ, তোমাকেও বড়ই ফ্যাকাসে লাগছে, তাছাড়া আরো খানিকটা ভাঙতেও পারে, আজ আর এখানে থেকে কাজ নেই। বাঁকের নিচে আমার রিক্সা আছে, দুজনাকে বেশ ধরে যাবে।'

পেমাদিদিও কাউকে কিছু না বলে পাকদণ্ডি বেয়ে কখন নিজের ঘরে ফিরে গেছেন, কেউ খেয়াল করেনি। দুদিন পরে বটাইয়ের সঙ্গে সেইখানে এরা উপস্থিত, নেবুদি, বিনয়বাবু, পটলা, নেবুদির বোন। তার আঙুলে এখন বটাইয়ের মা'র হীরের আংটি পরা, আর বটাই।

পেমাদি ওদের নিজের তৈরী ক্ষীরের সন্দেশ আর সুগন্ধী চা খাওয়ালেন, বললেন—'সব কথা কি অল্প সময়ে বলা যায়? কিন্তু তোমরা সেদিন যা দেখলে, তারপর না বলাও ঠিক হবে না। তবে মনে রেখো, যারা দেখেনি তারা কেউ এক বর্ণও বিশ্বাস করবে না।'

বিনয়বাবু বললেন—'অবিনাশমামার বাবাই বোধ হয় প্রথম ঐরকম চশমা বানিয়েছিলেন, যা দিয়ে দূরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়া যায়? আপনি তার সহকারী ছিলেন?'

পেমাদি হাসলেন, 'না, না, আমার তখন হোল সতেরো বছর বয়স, আমার বাবা ছিলেন ওঁর বন্ধু, ওঁর গবেষণা দেখতে যেতেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম, এটা ওটা ধরতাম। উনি দূরের জিনিস কাছে আনতেন। ঐ চশমা দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, শুধু সেইটুকুকেই আনা যেত। আবার কাঁটা ঘুরিয়ে সরিয়েও দিতেন। ক্রমে কেমন রোখ চেপে গেল, চশমার শক্তি বাড়ালেন। বড় বেশি বাড়াতে লাগলেন, বাবার কথা শুনলেন না। তারপর একদিন শূন্য থেকে ওরা এল। বাবা বলতেন শূন্যেই ওদের বাস, নইলে সঙ্গে আরো কিছু আনেনি কেন। বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেননি বড়সাহেব, বাবা আর আমি জানলা দিয়ে দেখেছিলাম। ওদের চোখের দিকে তাকালে কেমন অবশ লাগে, ওদের গান কানে গেলে হাত-পা দুর্বল হয়ে যায়, ওরা চকচকে জিনিসে আকৃষ্ট হয়। ঘরের সামনে তখন ছোট বারান্দা ছিল, তাতে চকচকে কাঁচের ঝালর দেওয়া ঝাড়বাতি ছিল, ওরা তাই দেখে বারান্দায় যেই বেরিয়েছে, বাবার ঘরে ঢুকে বড় সাহেবের ডেস্কের উপর থেকে চশমাটা নিয়ে কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। কিছু জানেন না, সবটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন।'

পেমাদি দু' হাতে চোখ ঢাকলেন। তারপর হাত নামিয়ে বললেন, 'ঐরকম

করে তারা আবার শূন্যে ফিরে গেল। কিন্তু সেদিন বড় সাহেব ওদের সঙ্গে ছিলেন। অমন সর্বনাশ যে হবে বাবা বোঝেন নি। তারপর চুকে গেলে, পাছে পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হয়, তাই রাতারাতি আমাকে নিয়ে বাবা তিব্বতের কাছে আমার মামার বাড়িতে চলে গেলেন। চশমাটাকে ভেঙে ফেললেন।'

বাকিটা বটাই বললে—'স্যার এখানে এসে বাবার কাগজপত্র নেড়েচেড়ে ক্রমে সবই বুঝে নিয়েছিলেন। খুঁজে পেতে পেমাদিদিকে ধরে এনেছিলেন, তাঁর বাবা কবে স্বর্গে গেছেন। মনে তো ভয়ডর নেই, তাছাড়া পেমাদি সব কথা ভেঙেও বলেনি, পাছে আবার সেই পথে যান। কিন্তু স্যারকে কি কেউ ঠেকাতে পারে? চশমাও তৈরী হল, তাদেরো নামানো হল; বা যা, তাতে তোমরা সবাই জান। চশমাটি ভাগ্যিস আমার কাছে ছিল, নইলে আরো মুস্কিল হত। আমি দূর থেকে গান শুনেই ঘর থেকে পালিয়েছিলাম, পেমাদির কাছ থেকে গানের কথা আগেই শুনেছিলাম।'

নেবুদি বললে—'অবিনাশমামা শোনেন নি?'

'শুনেছিলেন বই কি, তাতে তাঁর জেদ আরো বেড়ে গেছিল।' নেবুদির বোন উঠে পড়ে বলল, 'যাকগে, ভালোই হয়েছে, ঘরের সঙ্গে কাগজপত্রও উধাও হয়েছে, মামা আর এদিকে মাড়াবেন না বলেছেন। এখন থেকে সাধারণ চশমা আর দূরবীন তৈরী হবে তোমাদের ল্যাবরেটরিতে।'

'কিন্তু তা হলে স্যারের কি হবে?'

পেমাদি রূপোর চা-দানিতে কম্বলের ঢাকনি পরিয়ে বললেন, 'কি আর হবে? এখন থেকে আমি তাঁর দেখাশুনো করব, চিরদিন যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভাগ্যদোষে পারি নি।'

১০. অতিকায়

কয়েক বছর আগে পূজোর ছুটিতে বটুয়া মধুপুরে দাদুর বাড়িতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে তাদের আগেই মেজমামা এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর আদর দেখে কে? নাকি জামশেদপুরে তাঁকে বেজায় খাটতে হয়। তাই একটু যত্ন করা দরকার। খুব খাচ্ছেন দাচ্ছেন বেড়াচ্ছেন। বাঁ হাতের কনুইয়ের নীচে খানিকটা জায়গা ব্যাণ্ডেজ করা। বটু জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, 'কি আবার হবে? গন্ধকের নিশ্বাসে ঝলসে গেছে। দেখতে বড় বীভৎস তাই বেঁধে রাখি।'

শুনে বটু অবাক। গন্ধকের নিশ্বাস আবার কি? বিকেলে পাথর চাপটির ওদিকে বেড়াতে গিয়ে বটু কথাটা আবার পাড়ল। মেজমামার বন্ধুর আতা বাগানের ভিতর ধাঁধানো জায়গাটায় বসে পড়ে, মেজমামা বললেন, 'ওঠ, মালিকে জল দিতে বল।' বাতাসা আর জল খেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডিম্‌না পাহাড় দেখেছিস কখনো? জামশেদপুরে আমার কোয়ার্টার থেকে সেখানে হাতী চরতে দেখা যায়। খুব আদিম জঙ্গল ওখানে। হাজার হাজার বছর আগে হয়তো সমস্ত দেশটা জুড়েই ঐরকম বড় বড় গাছের বন ছিল। অন্ততঃ কোনো অঞ্চলে যে নিশ্চয়ই ছিল, তার প্রমাণ সে সব জায়গায় কয়লার খনির আধিক্য। বড় বড় মরুভূমিও সম্ভবতঃ ছিল নইলে যেখানে সেখানে অত বালি আসে কোত্থেকে? আর কিছু কিছু এখানকার উঁচু জায়গা সমুদ্রের নীচে ছিল। তাই হিমালয় পাহাড়ের চূড়োর কাছেও সমুদ্রের বড় বড় শামুকের ফসিল পাওয়া গেছে।

এছাড়া যে-সব জায়গার কোনো অদল-বদল হয় নি, এখনও অনেক আছে। আমার হাতের এই ব্যাণ্ডেজ তার প্রমাণ। বটু তো হাঁ। মেজমামা তার মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে বললেন, 'আদিম জায়গার বিশেষত্ব কি জানিস্ তো? সেখানে সব কিছু বড় মাপের। বড় বড় গাছ, বড় বড় ছাতার মত ফার্ন, বড় বড় পাথরের চাঁই, বড় বড় জানোয়ার।'

বটু বলল, 'তারা তো সবাই মরে গেছে, আমাদের প্রকৃতি-পাঠে আছে। তাদের এই বড় বড় গাছের সঙ্গে ঐ ছোট ছোট সুপুরির মতো মগজ নিয়ে কদ্দিন টিকতে পারে? তবে প্রস্তরীভূত হাড়গোড় দেখে—'

মেজমামা কর্কশ গলায় বললেন 'থাম! অত পাঠ্যপুস্তক আওড়াতে হবে না। সত্যিকারের জীবন অন্য রকম।' তারপর একটু থেমে আবার বললেন, 'ও-সব জায়গা খুব নিরাপদও নয়। শুধু যে বাঘ-ভালুকের উপদ্রব, তা নয়। গভীর বনের মধ্যে ডাকাতদের আস্তানাও আছে। আমি সে-সব বিপদের কথা বলছি না।'

বটু বলল, 'তবে কি ভূতপ্রেত?' মেজমামা হাসলেন, 'ঐ নিয়েই থাক ভূত-প্রেত, পরী, জলকন্যা—। হুঁ!'

বটু বলল, 'না, মেজমামা, ও-সব গল্প এখন আর ভাল লাগে না। ডিমনা পাহাড়ের কথা বল।'

মেজমামা চমকে উঠে বললেন, আহা ডিমনা কেন, ব্যাপারটা ঘটেছিল অন্য জায়গায়। গোমো থেকে আরো অনেক দূরে চেগ্রো বলে একটা স্টেশন আছে। গত মাসে বিশেষ কাজে সেখানে যেতে হয়েছিল। থাকবার ভালো জায়গা নেই, খাবার দাবার পাওয়া যায় না তবে একটা বড় সরকারী পরীক্ষামূলক খামার আছে। তারি আশেপাশে কর্মীদের জন্য ছোট ছোট খানকতক কামরা আছে, নিরাপত্তার জন্যে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি। টিউবওয়েল আছে; ছোট একটা ডাক্তারখানাও আছে। অনেক ধরাধরি করে ঐ ডাক্তারখানার লাগোয়া রুগীদের ঘরে একটু শোবার জায়গা করা গেল আর কর্মীদের ক্যান্টিনের খাওয়া-দাওয়া খুব মন্দ নয়।

মোটের উপর বেশ ছিলাম। কিন্তু কাজের জন্যে রোজ ঘন জঙ্গলে ঢুকতে হত। এ-সব বন কুখ্যাত ভেল-ওয়ার বনের অংশ বোধ হয়। বড় বড় গাছ, বড় বড় পাথরের চাঁই, মাঝে রুক্ষ শুকনো জমি। সেখানে ফসল হয় না, টিপ-কল বসালেও জল ওঠে না। তারই চারদিকে ভয়ঙ্কর বন। সকালে বেরোতম। সারাদিন গাছের কাঠ পরীক্ষা করতে হত, সন্ধ্যায় ডেরায় ফিরতাম। সঙ্গে একটা লোক থাকত না। ঐ বনে কেউ যেতে চাইত না। ওর নাকি নাম খারাপ।

কত করে বললাম আমার বন্দুক আছে, হাতে বাঁধা বীরেশ্বরের মাদুলী আছে, তাছাড়া রোজ একেক-জনা দেড় টাকা মজুরি পাবি, কাজ বলতে কাজই নয়। খালি সঙ্গে যাবি, মাঝে মাঝে গাছের গুঁড়িতে একেকটা কোপ দিবি, এই অবধি শুনে স্থানীয় লোকরা 'ও-বাবা!' বলে কানে হাত দিয়ে দৌড় দিল।

শেষটা কাঁধে বন্দুক, হাতে কুড়ুল, কোমরের বেল্টে জলের বোতল, টর্চ আর টিফিন বাক্স ঝুলিয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন নির্বিঘ্নে কাটল, আমার ফুর্তিও বাড়ল। ওরা না যাবে তো বয়ে গেল। ওদের মজুরিটা আমারই প্রাপ্য হবে, মন্দ কি! পাঁচদিনের দিন জঙ্গলের প্রায় মাঝখানে কাজ করছি। দেখি একটা বড় মেহগিনি গাছ একটা প্রকাণ্ড পাথর ফুঁড়ে বেরিয়েছে। খুব পুরনো গাছ, তবু লোহার মতো শক্ত। ভাবলাম এর একটা টুকরো নিয়ে গিয়ে দেখতে পারলে বেশ হয়। শুনেছিলাম অনেক গাছ নাকি হাজার বছরের বেশি বাঁচে। এটাকে দেখে তাই মনে হয়।

শক্ত কাঠে ধাঁই-ধাঁই কোপ মারলে কুড়ুলের ধার নষ্ট হয়। বরং একটু তেরচাভাবে আস্তে কোপ দেওয়া ভালো। তাই করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পাঁচ-ছয়টা কোপ দিতেই গাছটা কেমন যেন শুয়ে পড়তে লাগল। আশ্চর্য হয়ে সরে দাঁড়ালাম। গাছটা ক্রমে একেবারে শিকড় উপড়িয়ে গেল। ঐ নির্জন বনে তার কি শব্দ!

শব্দ থামলে কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি, তলায় বেশ বড় একটা গর্ত। তাতে একটা হাঁসের ডিমের মতো বড়, পাটকিলে রঙের ডিম। ডিমের চারদিকে গাছটার শিকড়গুলো যেন জড়িয়ে ধরে কোলে করে রেখেছিল। কিছু না ভেবেই ডিমটাকে তুলে নিয়ে আমার টুপির ভিতরে রেখে দিয়ে, জায়গাটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলাম। এক টুকরো কাঠ-ও কেটে নিলাম।

গাছ পড়াতে পাথরটার অনেকখানি ভেঙে পড়েছিল। তার ভিতরের পাঁজরা মতো বেরিয়ে পড়েছিল। ঠিক যেন অতিকায় কোনো জানোয়ারের পাঁজরা। কাছে গিয়ে যে ভালো করে পরীক্ষা করব, তার জো ছিল না। সূর্য বেশ নীচে নেমে পড়েছিল। টুপ করে যেই ডুববে, অমনি ঝুপ করে অন্ধকার নামবে। ঘন জঙ্গলের সেই বহাবহ অন্ধকার যে না দেখেছে সে বুঝবে না।—দু'একটা আতা পাড়তেও পারিস না নাকি?

কয়েকটা আতা পেড়ে দুজনে খেল। তারপর মালি আবার কলাই করা গ্লাসে জল দিয়ে গেল। মুখ মুছে বটু বলল, 'তারপর কি হল?'

মেজমামা বললেন, 'ডিম হাতে নিয়ে একরকম দৌড়তে দৌড়তে বন থেকে বেরুলাম। যারা অচেনা জঙ্গলে কাজ করে, তারা এগুবার সময় গাছে গাছে ছোট ছোট কুড়ুলের কোপ দিতে দিতে যায়। ফিরবার সময় তাই দেখে পথ চিনতে দেরী হয় না। আমিও তাই করেছিলাম। ডিমটা হাতেই ধরা ছিল। যতই

এগোই, ততই মনে হয় ডিমটা যেন মুঠোর মধ্যে বেজায় গরম হয়ে উঠেছে। শেষটা ঘরে ফিরে ডাক্তারখানার ইস্টিলের কানা-তোলা টেবিলে নামিয়ে টুপি চাপা দিয়ে ঢেকে, তবে নিশ্চিন্ত হলাম।

ভাবলাম গাছের গুঁড়ির ছোট টুকরোটা আর ঐ ডিম, এই দু'টো জিনিস আমাদের অফিসের গবেষণাগারে জমা দিয়ে, তবে মনে শান্তি পাব। কিন্তু সে আর হল না।

বটু বলল, 'কেন হল না?'

মেজমামা কাষ্ঠ হাসলেন, 'কেন হল না? কারণ মাঝ রাতে পোড়ো গন্ধ পেয়ে, লণ্ঠন জ্বেলে দেখি আমার টুপি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। টুপি তুলতেই একটু একটু আগুনের হল্‌কাও দেখলাম। পাশে রাখা সেই দুষ্প্রাপ্য কাঠের টুকরোটা জ্বলছে। আর তার উপরে পা না দিয়ে আঁকড়ে ধরে বসে একটা নীল-সবুজ-ময়ূরপঙ্খী রঙের গিরগিটি, রুবির মতো লাল লাল চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। পাশেই ভাঙা ডিমের খোলাটা পড়ে আছে। গিরগিটির সারা গায়ে ছোট ছোট আঁশ মনে হল, পিঠে খাঁজ কাটা শিরদাঁড়া।

এ রকম গিরগিটি নিয়ে যেতে পারলে তো আমি সব দুঃখ ভুলতে পারতাম। ভাবলাম খুদে বাচ্চা, সবে ডিম থেকে বেরিয়েছে; আগুন যে কি ভয়ানক জিনিস, তাও জানে না। আগুনের মাঝখানে দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে আছে। আস্তে আস্তে হাত বাড়ালাম। তাই দেখে গিরগিটিও এক লাফে কাঠ থেকে নেমে, স্টিল টেবিলের উপর পড়ল।

ধরেই ফেলেছিলাম আর কি, কিন্তু সে হঠাৎ নাকের দুই ফুটো দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া আর দুই হল্‌কা আগুন বের করে, পাশের খোলা জানলা দিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবছায়াতে ঠিক মনে হল, যাকে শিরদাঁড়ার খাঁজ মনে করেছিলাম, সেটি এক জোড়া বেঁটে চওড়া সবুজ ডানা।

একবার মাত্র চোখটা বুজেই খুলে দেখি কোথাও কিছু নেই, ঘর ভরা গন্ধকের গন্ধ আর আমার হাতের যে জায়গাটা গিরগিটির কাছে পড়েছিল, সেখানে অসম্ভব জ্বলুনি! যন্ত্রণার আর ধোঁয়ার জন্যে হোক, কি যে কারণেই হোক, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল আর বিছানায় এলিয়ে পড়লাম।

বটু উত্তেজিতভাবে বলল, 'পোড়া কাঠের টুকরো আর ডিমের খোলা এনেছিলে নিশ্চয়?' মেজমামা বললেন, সে কথা আর বলিস্ না। সকালে যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখি কখন চৌকিদার এসে ডাক্তারখানার দিকের দরজা খুলে

ঢুকে ঘরদোর সাফ করে ফেলেছে। আমি ঘুমোচ্ছি ভেবে ঠেলে ঠুলে জাগিয়ে দিয়ে বললে,—উঠুন, বাবু, এখনি রুগীরা আসবে। ডাক্তারবাবু গোসা হচ্ছেন। তাছাড়া জঙ্গলে দাবানল লেগেছে।

চেয়ে দেখি সত্যি সত্যি কাল যে বনে কাজ করে এলাম আজ সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জলছে! ওরা সে আগুনের নানা কারণ দেখাতে লাগল। বনটা ওদেরই হেফাজতে ছিল, তাই সাফাই গাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। চৌকিদারকে বললাম, টেবিল থেকে কাঠের টুকরো আর ডিমের খোলা কে নিল।

চৌকিদার বলল, আমি নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি পাকঘরের উনুনে পুরে দিয়েছি। এখানে আগুন জ্বালার নিয়ম নেই। আমাকে বললেই তো ক্যান্টিন থেকে খাবার এনে দিতাম। এ ঘরে টেবিলে কাঠ জেলে ডিম রেঁধে খেয়ে কি সঙ্গে সঙ্গে আমার চাকরিটাও খেয়ে দিতে চান, বাবুজি? হাত পুড়িয়েছেন তো দেখতে পাচ্ছি।

ওখানে আর কিছু করার নেই দেখে, সেদিনই নিজে নিজে যেমন পারি হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, চেগ্রো থেকে ট্রেন ধরে জামসেদপুরে চলে গেলাম। আজও কষ্ট পাচ্ছি, গন্ধকের নিশ্বাস, কি যে সে জিনিস। কাজেই আর কখন যে সেকালের জানোয়াররা মরে গেছে, ওটা যদি বেঁচে থাকে এতদিনে কি আকার নিয়েছে ভাবলেও শিউরে উঠি। তবে হয়তো না খেয়ে মরে গেছে। না হলে এত দিনে কাগজে লেখালেখি হত—বীভৎস ড্রাগনের আবির্ভাব ইত্যাদি। এখন ওঠ দিকি নি, বড্ড খিদে পাচ্ছে।'

রাতে খাবার সময় বড় মামিমা বিরক্ত হয়ে মেজমামাকে বললেন, 'ঢের দেখিছি, বাপু, কিন্তু একটা সামান্য লোম-ফোঁড় নিয়ে কাউকে এত ঢং করতে শুনিনি।' বটু কিছু বলার আগেই মেজমামা টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন। বলে গেলেন—ভজা যেন আমার খাবার আমার ঘরে দেয়।

১১. হরি পণ্ডিত

পুজোর ছুটিতে পশ্চিমে—যাক্ গে জায়গাটার নাম করলাম না—দাদুর বাড়ি গিয়ে ভজু লক্ষ্য করল যে পাশের বাড়িটা এবাড়ি থেকে দেখা যায় না। সেখানে হরি পণ্ডিত থাকেন, দাদুর সঙ্গে নাকি ছোটবেলায় দারুণ ডাংগুলি খেলতেন, দাদুর প্রাণের বন্ধু। তারপর অনেক বছর ছাড়াছাড়ির পর বুড়ো বয়সে আবার পাশাপাশি থাকতে এসেছেন।

হরি পণ্ডিত রোজ-রোজ যখন তখন দাদুর কাছে টাকাকড়ি চান। দাদুও যা পারেন দেন। কেউ কিছু বললে বলেন, 'আহা! ও তো আর নিজের খাওয়া পরার জন্য নেয় না—সে তো আমি এমনিতেই দিয়ে থাকি—এ টাকা দিয়ে ও এক অভাবনীয় গবেষণার কাছ করছে।'

ভজু বলল, 'কি অভাবনীয় গবেষণা দাদু? মরা মানুষ জ্যান্ত করবার গবেষণা?'

দাদু শিউরে উঠলেন, 'আরে না না, তার চেয়েও ঢের গুরুতর ব্যাপার। ঠিক অর্ধেক কাজ হয়েছে, বাকি অর্ধেক না হলে কাউকে কিছু বলা যায় না। বললে সর্বনাশ হবে!'

এ-কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। দাদু একটু চটে গেলেন। বললেন, 'তা তোরা হাসতে পারিস্। কিন্তু অদ্ভুত মাথা ওর। পৃথিবীতে হেন জায়গা নেই যেখানে গিয়ে ও গবেষণা না করেছে, খেতাব মেডেল পুরস্কার না পেয়েছে। সে-সব বুঝবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি তোদের থাকলে তবে তো। এখনো যেটা নিয়ে কামড়ে পড়ে আছে সেটা শেষ করতে পারলে পৃথিবীতে যুগান্তর ঘটিয়ে দেবে। তোদের নিউক্লিয়ার বোমা-ফোমা নস্যাৎ হয়ে যাবে। অথচ সম্পূর্ণ অহিংস। এতটুকু চিহ্ন কেউ খুঁজে পাবে না। দুঃখের বিষয়, টাকার অভাবে কাজটা শেষ করতে পারছে না।'

এই বলে দাদু এমনি জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন যে টেবিলের ওপর রাখা ২—৩ দিনের খবরের কাগজ ফড়ফড় করে উঠল।

ভজুর মামাতো ভাই পন্টু বলল, 'তাহলে এখন এ-কথা কেন?' দাদুর কি দুঃখ, 'আরে তাই তো বলছি। গবেষণা গবেষণা করে খেপে গেল। চাকরি-বাকরি করল না, বিয়ে-থাও করল না। পূর্ব বাংলায় জমিদারি ছিল। সেখান থেকে টাকা আসত। নিজে না খেয়ে না পরে, সব টাকা ঢালত গবেষণায়!'

'গবেষকরা তো সরকারের কাছ থেকে টাকা পায়। উনি নেন না কেন?'

'নিত রে নিত। তাতে কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছে, কোনো ফল দেখাচ্ছে না, কাউকে কিছু ভেঙেও বলছে না—দিয়েছে সরকার সব সাহায্য বন্ধ করে!'

এই বলে দাদু এতক্ষণ চুপ করে থাকলেন যে এরা বিরক্ত হয়ে উঠল, 'বল না তারপর কি হল? গবেষণাটা কি অন্ততঃ সেটুকু বল।'

দাদু উঠে পড়ে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'ও সাধুচরণ, ও নটবর, পণ্ডিতমশায়ের বিকেলের দুধ-সন্দেশ দিয়ে এলি না!' বলে পিট্টান।

দেখে দেখে গা জ্বলে। আধ ময়লা, ছেঁড়ামতো জামা-কাপড় গায়ে; এ-বাড়ি থেকে চার বেলা খাবার না গেলে উপোস, সে নাকি আবার পৃথিবীতে যুগান্তর ঘটাবে! থেকে থেকে উঁচুনিচু দু-সারি দাঁত বের করে বলে 'ও লাটু, তোর কাছে বড্ড ঋণী হয়ে যাচ্ছি যে রে। তা ভাবিস্‌নে, সব শোধ করে দেব; তার চেয়েও ঢের বেশি দেব। আমার গবেষণার ফল-পাকড় তোর এই নাতি দুটোকে দিয়ে-যাব—'

সঙ্গে সঙ্গে ভজু পন্টু পণ্ডিতমশায়ের কাঁধে ঝুলে পড়ল, 'বলুন, পণ্ডিতমশাই, কিসের গবেষণা। আমরা রোমাঞ্চ-সিরিজ পড়ি কি না, এ-সব ব্যাপার বড্ড ভালো লাগে। যতটুকু করেছেন, ততটুকুই বলুন।'

পণ্ডিতমশাই ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে ওদের ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আঃ, ঝামেলা কর না। সবটা বলতে পারলে যুগ-পরিবর্তন। অর্ধেকটা বললে সর্বনাশ!—ও লাটু আমার ফতুয়াটা পাচ্ছিনে। কি জানি হয়তো—' এই বলে জিব কেটে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। ধাপ্পা দেবার আর লোক পেলেন না?

কিন্তু দাদু কিচ্ছু শোনেন না। উল্টে বলেন, 'বড়লোকের ছেলে, দুর্দিনে পড়েছে, তোরাও যদি ওকে টিট্‌কিরি দিস্‌, আমার কিছু বলবার থাকে না।' মনে হল বেশ দুঃখিত হয়েছেন।

ওরা একদিন সকালে গিয়ে পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি দেখে সেটি স্রেফ একটি ধ্বংসস্তূপ। পন্টু বলল, 'ঘাঁটলে ওর মধ্যে থেকে অশোকের শিলালিপি বেরিয়ে

পড়াও বিচিত্র নয়।' গবেষণা হয় গোয়াল-ঘরে। সেটি আষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধ, দরজা-জানলা লোহার তৈরি—নিশ্চয় দাদুর খরচায়—ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবু কেমন মনে হচ্ছিল থেকে থেকে মাটিটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। চারপাশের গাছপালাও কেমন শুকনোপানা।

তবু পল্টু বলল, 'বুড়ো হয়ে গাছ মরেছে। গত পঞ্চাশ বছর তো কেউ জল কিম্বা সার দেয়নি।' মোট কথা পাখিও চোখে পড়ল না। ওরা বাড়ি ফিরে এসে দাদুকে সে-কথা বলতেই, তিনি বললেন, 'হুঁম্। ওখানে যেতে মানা করিনি? একেবারেই নিরাপদ নয়। তখন তোদের মা-বাবাদের কি বলব বল্ দিকিনি!'

ওরা তো হাঁ! ঐ শুটকো খেমো লোকটা বেড়াল দেখলে মুচ্ছো যায়—ওর বাড়িতে যাওয়া নিরাপদ নয়! দাদু বলে কি! তবে মাটিটা কাঁপছিল সত্যি, হয়তো ডাইনামো চালাচ্ছেন পণ্ডিত। যা ক্যাবলা দেখতে, ফেটেফুটে যাওয়া বিচিত্র নয়! খুব হাসাহাসি করল ওরা পণ্ডিতকে নিয়ে।

এর পর পর-পর কতকগুলো এমন ব্যাপার ঘটল যে কিছুদিন পণ্ডিতমশায়ের কথা ওদের মনেই হল না। প্রথম দিন আদালত থেকে ক-জন লোক এসে দাদুকে কি সব বলে গেল। শুনে দাদু শুয়ে পড়লেন, খেলেন-দেলেন না, কথাও বললেন না। সন্ধেবেলা জলখাবার খেতে পণ্ডিতমশাই এসে ব্যাপার দেখে বললেন, 'নিশ্চয় সেই জামিনের ব্যাপার! বলিনি আত্মীয়াই হক আর যে-ই হক, লাখ টাকার জামিন কক্ষনো হয়ো না। লাখ টাকা দিতে হলে ঘটিবাটি বেচতে হবে! তা সে তো শুনলে না!'

ভজু পল্টু তো অবাক্। বেশ বলছেন পণ্ডিত! নিজে এদিকে দাদুর মাথায় হাত বুলিয়ে কম সুবিধে করে নিচ্ছেন না! পণ্ডিতমশাই বলে চললেন, 'আরো হাজার পঞ্চাশেক হলেই আমার এটাও কমপ্লীট হয়। তখন আর দেখতে হবে না। তোর সব দুশ্চিন্তা দূর করে দেব।'

দাদু এতক্ষণে কথা বললেন, 'আর ততদিন?' ভজু পল্টু এক সঙ্গে বলল, 'কেন আমরা আছি, দাদু!' দাদু একটু হাসলেন। হঠাৎ পণ্ডিত বললেন, 'ভালো কথা। তোর আবার ভাবনা কিসের? সেই কিপ্টে মামাতো দাদা না তোকে তার যথাসর্বস্ব লিখে দিয়ে গেছেন! রেডিওতে বলল তিনি সগ্‌গে গেছেন।'

পণ্ডিতমশাই জল খাবার খেয়ে হাসতে হাসতে বিদায় নিলে ভজু পল্টু বলল, 'সত্যি, দাদু? তোমার মামাতো ভাই তোমাকে সব দিয়ে গেছেন?

দাদু বললেন, 'তার নিজের এক দুর্দান্ত ভাই আছে। জেলে জেলে জীবন

'…তিনজনের সই দেওয়া কাচা দানপত্রটা বের করে দাও দিকিনি—'

কাটায়। চোর, ঠক, ঠ্যাঙাতে—' এই অবধি বলতে না বলতে বাইরে থেকে তিনটে বিশ্রী চেহারার লোক ঢুকল। প্রত্যেকের হাতে ছোরা। দাদু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এ কি, মোহন! তুমি কবে ছাড়া পেলে?'

সবচেয়ে বিশ্রী যার চেহারা, সে কাষ্ঠ হেসে বলল, 'না পেলে তোমার বোধ হয় সুবিধে হত? এখন ভালোয় ভালোয় সেই তিনজনের সই দেওয়া কাঁচা দানপত্রটি বের করে দাও দিকিনি, নইলে নাতিদের জন্য শোক করতে হবে।'

সঙ্গী দুটি দরজাটা বন্ধ করে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বিশ্রী লোকটা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বলল, 'কই, দাও দিকিনি, আমি ধৈর্যের জন্য বিখ্যাত নই।'

দাদু ভজু পন্টুকে বললেন, 'নড়িস্ নে।' তারপর দেরাজ খুলে দলিল খুঁজতে লাগলেন। মোহন লোকটার তেড়িবেড়ি বেশী, 'ন্যাকামো হচ্ছে নাকি? দাও শীগগির—' তারপরেই মনে হল পেছনের জানলার দিক থেকে এক ঝলক আলো দেখা গেল। চোখ ঘষে ভজু পন্টু দেখল সেই তিনটে লোক অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে দাদু লাফিয়ে উঠলেন, 'হরি! হরি! এ কি কাণ্ড করলে!' বলে ছুটে বেরিয়ে এলেন। চারদিক অন্ধকার, চুপচাপ, কেউ কোথাও নেই!

দাদু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধপত্র করে বাকি রাতটা কাটল। সেই লোকগুলোর কথা কাউকে বলা হল না।

সকালে দাদুকে অনেকটা সুস্থ দেখে, ওরা কৌতূহল রাখতে না পেরে সটাং হরি পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে হাজির হল।

সব শান্ত, চুপচাপ, দু একটা পাখি ওড়া-উড়ি করছে আর গোয়ালঘরের জায়গাটা একটা ফাঁকা শূন্য মাঠ। হরি পণ্ডিতকেও কোথাও দেখতে পেল না। ওঁরা ভাঙাচোরা বাড়িতে কেউ কোনো দিন ছিল বলে মনে হল না।

সুস্থ হয়ে বাড়ি এসে দাদু ওদের বললেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। এই নিয়ে তোরা আর কাউকে কিছু বলিস্ নে। হরির গবেষণা এতটা এগিয়ে ছিল যে আলোর রশ্মি দিয়ে সব কিছুকে অণুতে পরিণত করে দিতে পারত। আবার পড়ে দেবার কাজটি শেষ হয়নি। আর হবেও না।'

ভজু পন্টু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু উনি গেলেন কোথায়? কত খুঁজলাম, পেলাম না।' দাদু একটা বড় খাম খুলতে খুলতে বললেন, 'গেছে মহাশূন্যে। গবেষণার শেষে আঁক মিলছিল না।' এই তো গেল ব্যাপার। বাকি শুধু রইল দাদুর সম্পত্তি পাওয়ার সুখবর। তার অর্ধেক দিয়ে হরি পণ্ডিতের পোড়া বাড়ির জায়গায় একটা বিজ্ঞান কেন্দ্র করে দিয়েছেন।

১২. তদন্ত

নিজেকে ঐ কাজ করতে হয় না কিনা, তাই শ্যামরতনদা অসীমের চাকরির খুব প্রশংসা করেন। বলেন, সব চেনার বড় হল নিজেকে চেনা, সব জানার বড় এই পৃথিবীকে জানা। অসীম ভাবে ও-সব কিছু নয়, স্রেফ তথ্য সংগ্রহ করা। তবে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যে অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতাও লাভ হয়ে যায়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অসীমদের আপিসটিকে ভারতায় কৃষি বিভাগের একটা টুকরো বলা চলে। সাধারণ লোকের মনে হতে পারে এর মধ্যে রোমাঞ্চের কোনো অবকাশই নেই, কিন্তু সে ধারণাটা যে কত ভুল তা অসীমের ডাইরি পড়লেই বোঝা যায়। কাউকে অবিশ্যি দেখায় না সে ডাইরি—বোধ হয় বানান ভুলের জন্য—কিন্তু ইতিমধ্যে যে-ঘটনার বর্ণনা দেয় তাতেই রোমাঞ্চ লেগে যায়।

সেবার কোথাও ভালো বৃষ্টি হল না; ধান গম শুকিয়ে থাক্। তারপর তিন দিন একটানা জল; বাড়ি-ঘর গোরু-বাছুর ভেসে নিরুদ্দেশ। তারি মধ্যে খবর এল যে ককলং গ্রামের আশেপাশে শস্য আর ধরে না। চিরকাল বছরের যে-সময় গ্রাম খালি করে সব দলে দলে ভিক্ষে করতে বেরোয়, এ বছর সেই সময় ওরা চারদিকে ধান, তেল, ডিম সরবরাহ করছে। তবে লোকের মুখে মুখে সাদা যেমন কালো হয়ে যায়, এর মধ্যেও কতখানি সত্যি তাই বা কে জানে। কিন্তু কথাটা যখন উঠেছে তখন একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

অসীমের আপিসের কাঠ বাঙ্গাল বড়-সায়েব দাঁতে এক টিপ চূণ লাগিয়ে ওকে বললেন, ইনফর্মেশন দেইখ্যা আস। এবিষয়ে খানিকটা রিলায়েবেল্ খবর না পেলে, আমি হেড আপিসের চিঠির কি উত্তর দেব? "যদি অসীম বেনামায় ছোটদের পত্রিকায় দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প লিখে, তবু ঠিক এই সময় ওর কোথাও যাবার আগ্রহ ছিল না। শীত প্রায় এসে পড়ল, আপিসের এগারো এবার স্থানীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নামছে, নতুন ছেলে দুটো খুব সম্ভাবনাময় হলেও, কিঞ্চিৎ তালিম দেওয়া দরকার। অসীম চলে গেলে কিছুই হবে না।

বড়-সায়েব দু-কানের লতিতে দুটিপ চূণ লাগিয়ে বলে চললেন, "ভালোই লাগবে তোমার। এ কিছু একটা মামুলী সফর নয়। অদ্ভুত জায়গা। তাহলে যোগাড়-যন্ত্র করতে থাক। যতটা পারা যায় ট্রেনে যাবে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আমি হেড-আপিসে সেই কথাই লিখি। আর দেখ—ইয়ে এ বিষয়ে তোমাদের ইয়ং মেনস্ ক্লাবে কিছু বলার দরকার নেই। ধান-গম হয়নি, অথচ কাতারে কাতারে লোক ধান-গম পাচার করছে, এর মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে কি না কে জানে।"

আর কাউকে না বললেও, শ্যামরতনদাকে বলতেই হল। কিসং শুনে উনি এই পঁচাত্তর বছর বয়সেও লাফিয়ে উঠলেন। কিসং! ব্রহ্মপুত্র যেখানে হিমালয় ফুঁড়ে এদিকে বেরিয়ে এসেছে, তারি একটু ওপরে কিসং! ওখানকার লোকেরা না—আট না মোঙ্গল সত্যিই এ তোমার মামুলী সফর নয়। এমন সুযোগ ছেড়ো না। ঐ একটা জায়গা আমারো দেখা বাকি রয়ে গেছে। খুব দুর্গম জান তো? প্লেন থেকে পাহাড়তলির বনের আগে পর্যন্ত যানবাহন পেলেও, তার পর স্রেফ পায়ে হাঁটা। ও অঞ্চল সম্বন্ধে আমার এখনো অনেক জানতে বাকি আছে। নাকি ভেতরে ভেতরে পথ আছে সোজা বর্মা অবধি। এক সময় ঐ পথে পিজিয়ন্স ব্লাড রুবি চালান হত। সে যাক গে। তুমি তাহলে এসো, আমারো কিছু কাজ আছে।

অসীমের হাসি পেল। প্লেনে চড়ে এক সময় শ্যামরতনদা দুনিয়ার বেবাক অগম্য স্থান নিজের চোখে দেখে এসেছেন। এমন সব জায়গা যেখানে মানুষের পা ফেলার উপায় নেই। শুধু রাত্রিতে সেখানে বাসা বাঁধে, যাতে মানুষরা তাদের নাগাল না পায়। এখন ওঁকে দেখলে এত কথা বোঝার জো নেই। শেলী না কীটস্ না কোন ইংরেজ কবি নাকি লিখেছিলেন রুগ্ন ঈগল আকাশের দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে। শ্যামরতনদা বলেন ওঁর অবস্থাও তাই! সে যাক্ গে, এখন যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হয়। এরোপ্লেনে হবে না, বড্ড খরচ। তার ওপর আঘাটায় নামিয়ে দেয়। সেখানে কি একটা মিলিটারি গুদাম আছে, তাদের কাছে মেলা পয়সায় জীপ পাওয়া যেতে পারে। বনের সীমানা পর্যন্ত। তারপর শ্যাম-রতনদা যেমন বলেছিলেন, হান্টিং ডনশেয়ার জেন্টিল্ম্যান। তাছাড়া আর কি!

বড়-সায়েব খাতা দেখে বললেন, যারা সাড়ে সাতশোর কম মাইনে পায়, তাদের প্লেনের খরচা দেওয়া হয় না, তারা ট্রেনে যায়। রং না কি যেন নামের একটা

গুমটিতে ভোরে নেমে, নড়বড়ে এক বাসে ২৭ কিলোমিটার মুরগি, বড় বড় ছাগল ইত্যাদির সঙ্গে গিয়ে, বেলা দশটায় খুদে এরোপ্লেন ঘাঁটিতে পৌঁছনো। সেখান থেকে বনের সীমানা দশ কিলোমিটার মতো। জীপ চলে। যোগাড় করতে পারলে নইলে পা-গাড়ি।

সত্যি অদ্ভুত জায়গা। ব্রহ্মপুত্র নদের আর হিমালয়ের গন্ধ এক সঙ্গে পাওয়া যায়। অবিশ্যি সেটা হয়তো অসীম জানে বলে। সবুজ পায়রা আর ধনেশ পাখীরা ভুটানের সীমানার দিকে চরতে যায়। খুদে বেডিং-ব্যাগ আর কাঁধে ঝোলা থলি নিয়ে বাস থেকে নেমেই অসীম দেখল, যা ভেবেছিল ঠিক তাই! বিমান-ঘাঁটির বাইরে একটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিককার হাড্ডি-জিরজিরে জীপে, পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরা, স্নান করা, দাড়ি কামানো শ্যামরতনদা টাক-মাথা নিয়ে বসে, ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন!

অসীমদাকে বাস থেকে নামতে দেখে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'সর্বদা সময়-নিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবে। ৩২ বছর স্বাধীন হয়েছি, অথচ এইটুকু এখনো আমরা শিখলাম না।" অসীম বলল, "যা বলেছেন!" ও কখনো শ্যামরতনদার সঙ্গে তর্ক করে না। করলে হেরে যায়।

দূর থেকে দুর্ভেদ্য মনে হলেও ঐ বনে মানুষ চলাফেরার যথেষ্ট চিহ্ন আছে। আরো ওপরের পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে ধানের আর ছোট লাল দানার গমের চাষ হয়। এখানকার ধানের দানা আর গমের দানা প্রায় এক রকম দেখতে। বড়-সায়েবের কাছে শোনা। খরার জন্য বোধ হয় এ বছর সব শুকিয়ে খড় হয়ে আছে। ঘণ্টা দুই পরে বন পার হয়ে এটা দুজনের চোখে পড়ল। অথচ এখান থেকে ধান গম সরবরাহ হয়। অদ্ভুত না তো কি!

অসীম বলল, "নমুনা দেখেছি, সেগুলোর মোটেই লাল লাল ছোট দানা নয়! মুক্তোর মতো গোল, বড় বড় দানা। ও-রকম আমাদের আপিসের কেউ দেখেনি। যদিও ঐ আমাদের কাজ। সবাই বলছে ভারতের বাইরের কোনো শক্তি ঐ-সব জুগিয়ে, এদিককার সরল গ্রামবাসীদের মন ভাঙিয়ে নিচ্ছে।"

শ্যামরতনদা একবার আড় চোখে চেয়ে, বড় বড় পা ফেলে ওর আগে আগে চড়াই ভেঙে উঠতে লাগলেন। হাঁশফাঁশ করতে করতে ওঁর সঙ্গে যেতে অসীমের প্রাণ যায়! ওরা ক্রমে লোকালয়ের কাছে এল। গোটা দুই ছোট মাথা লালচে রঙের পাহাড়ি কুকুর, যাদের কোনমতেই নেড়ি বলা যায় না। বাঁশবনের নিচে বাছুর। পাহাড়ের ধাপে ধাপে শস্য শুকিয়ে খড়। চির শ্যামল গাছের বন। তার

ওপরে বেশি দূর ঠাওর হয় না। হঠাৎ ফিকে নীল সুদূর পাহাড়ের পেছনে বরফের ঝিক্‌মিক্‌।

অসীম একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর বসে পড়ে বলল, "আঃ!" শ্যামরতনদা পকেট থেকে লেবু লজঞ্জুষ বের করে একটা দিলেন। সামনে পাহাড়ের গায়ে কিলং গ্রামের ঘরবাড়ির জানলার কাচে রোদ পড়ে বরফের মতো ঝিক্‌মিক্‌ করতে লাগল।

তারপর গ্রামের প্রধান তার পাঠিয়ে আদর ওদের করে নিয়ে গেছিল। চার-দিকে খরার চিহ্ন, ঘাস পর্যন্ত শুকিয়ে গেছিল। তবে দেবদারুর বন কখনো শুকোয় না। বনের গা ঘেঁষে গ্রাম। অন্য বছর এত বেশি বৃষ্টি হয় যে লোকে মাটির ঘর করে না। কিছু পাথরের ঘর, কিছু ঘরের কাঠের দেয়াল, বাঁশের দেয়াল। পাট আর শন পাকিয়ে ফাঁকা-ফোকর বন্ধ করা। এবার এরা জানলায় কাচ লাগিয়েছে। এ গ্রাম গরীবদের নয়।

কৃষি বিভাগে চাকরি করে অবধি অসীমের সন্দেহ-বাতিক। কানে কানে বলল, "চোরাকারবারের টাকায় গ্রামের উন্নতিসাধন।" শ্যামরতনদা একটু ভুরু কোঁচকাতেই লজ্জা পেয়ে বলল, "তা না হলে কোথায় পায় এ-সব। ঘরে ঘরে শেডের তলায় তাঁত বসিয়ে পাটের কাপড় বুনছে!"

শ্যামরতনদা বললেন, "সেইটে জানবার জন্যেই এত খরচ করে তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। খবরের কাগজওয়ালারা কিছু আঁচ করবার আগেই। আগে থেকেই মন স্থির করে বোকারা।"

প্রধানের বাড়িটি দোতলা। পাথরের একতলার ওপর কাঠের দোতলা উঠেছে। সদ্য সদ্য। চারদিকে নতুন টাকার গন্ধ। এরা দেখতে একটু মঙ্গোলীয় হলেও এক রকম বাংলা বলে। অবিশ্যি কলকাতার বাংলা নয়, উপজাতীয় ভাষাও নয়। চেনা কথাও আছে অনেক। মুড়িকে বলে হুড়ুম, ঝাঁটাকে বলে বাড়ন। পূর্ব থেকে সুঁড়ি পথে আসা-যাওয়ার ওপর এ গ্রাম, পাঁচমিশেলী ইতিহাস। এ-সব পথে গাড়ি চলে না, খালি মানুষের যাতায়াত। বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ফিরে যে বর্মা পৌঁছানো যায়, সে বিষয় অসীমের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

প্রধানের বাড়ির সামনেটা নিকিয়ে বড় বড় গাছের গুঁড়ি ফেলা। ওপরটা চেঁচে চুলে চকচকে হয়েছে, পাশগুলোতে কারিকুরি করা। পাখি উড়ছে, ছাগল লাফাচ্ছে, বুনো কুকুর নিয়ে মানুষরা শিকার করছে—নক্সাগুলোয় কেমন একটা আদিম ভাব। শ্যামরতনদা দেখে দেখে বোধ হয় মুগ্ধ। নীল পাহাড়ের পেছনে বরফ চিকচিক করছে।

বাড়ির মেয়েরা ওদের জলখাবার এনে দিল। বাঁশের নলে ঠাণ্ডা জল—ঝরণা সব শুকোয়নি তাহলে—শুকনো তাওয়ায় সেঁকা, নরম নরম মোটা মোটা হাতরুটি, তার সঙ্গে বনের মধু। এ রকম ভালো জিনিস খায়নি কখনো অসীম। রুটিগুলো ভালো বিস্কুটের মতো ফুরফুরে, নাকি চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি।

শ্যামরতনদা বললেন, "এত ভালো চালের গুঁড়ো হয় তা তো জানতাম না।" শুনে আহ্লাদের চোটে প্রধানের বুড়ি স্ত্রী হাতে করে এক মুঠো চাল এনে দেখাল। সত্যিই গোল গোল মুক্তোর মতো, এমন চাল অসীম কখনো দেখেনি। প্রধানের মুখটা গম্ভীর হল। তাড়াতাড়ি সে অন্য কথা পাড়ল।

গ্রামের চারদিকে উঁচু উঁচু ধানের গোলা। প্রত্যেকটা ছোট ছেলের ফুলো ফুলো লালচে গাল। পরিষ্কার সুন্দর পোষাক পরা। সবটাই একটু অদ্ভুত। প্রধান চমৎকার বাংলা বলে। নাকি কলকাতায় লেখাপড়া শিখেছিল ওর ঠাকুরদা, ইংরেজদের আমলে। ফিরে এসে নিয়ম করে দিয়েছিল এখানকার কেউ আর যাবে না সমতলে, নিতান্ত দরকার না হলে। কলকাতায় কখনো না। সে বড় খারাপ জায়গা। তাছাড়া লেখাপড়া না শিখে কি এমন মন্দ আছে এরা?

প্রধানের বড় ছেলে দাম্ভিক। সে অসীমকে বলল, "বরং তোমাদের চেয়ে ঢের সুখেই আছি।" বলেই আড়চোখে বাপের দিকে চাইল। প্রধান কটমট করে তাকাতেই একেবারে চুপ মেরে গেল। বোঝাই গেল ওদের নতুন সমৃদ্ধির কথা ওরা বাইরের লোককে বলতে চায় না।

তবে বলবার দরকার ছিল না। গ্রামের বাড়ির চারধারে ফলন্ত তরি-তরকারির বাগান। চেনা কুমড়ো, শশা, কপি, বিন, আলু, গাজর, বিট। সব-ই একটু অন্য চেহারার, বেশি বড়, বেশি ভালো। শ্যামরতনদা অসীমকে বললেন, "খালি চোখে দেখে গিয়ে হুবহু রিপোর্ট কর। একটি কথা-ও বল না, নোটবইতে একটি আঁচড়ও নয়। তোমার জন্য এরোপ্লেনের টিকিট কেটে রেখেছি।"

প্রধান বলল, "আজ রাতে ফেরার চেষ্টা কর না। এক্ষুনি সূর্যটা পাহাড়ের পেছনে টুপ করে নেমে যাবে। ঘন অন্ধকারে চারদিক ঢেকে যাবে। বনে খারাপ জানোয়ার এখনো বেরোয়। কাল ভোরে বেরিয়ে পড়বে।"

রাতে সকলে একসঙ্গে বসে তরি-তরকারি আর কোনো পাখির মাংস দিয়ে সেই আশ্চর্য চালের ভাত খেয়েছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাতটি তারার আলোয় ফুটফুট করছিল। সূর্য নেই, চাঁদ নেই, কোন সুদূরের তারার আলোয় যে চারদিক এমন আলোয় আলো হয়, এটা অসীমের অজানা ছিল।

ছোট ছোট কাঠের খুরো দেওয়া রূপোর মত কিছু গেলাসে, সবাই কোনো ফলের রস পান করেছিল। নেশার জিনিস নয় মনে হল। কিন্তু মনটা বড় খুশি লাগছিল। প্রধানের মুখ আস্তে আস্তে খুলে গেল।

শ্যামরতনদা আস্তে আস্তে বলেছিলেন, "কোনকালে সমতলে, এমন স্বর্গের মতো জায়গা ছাড়ে। এখানে কিসের অভাব?"

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর, প্রধান বলল, "অথচ গত বছর এই সময় এসে একেবারে অন্য দৃশ্য দেখতেন বাবু। ধুঁকে ধুঁকে সব মরে যাচ্ছিল। ঠিক এই রকম একদিন সন্ধ্যায় এখানে বসে আছি, এমন সময় বন থেকে তারা দশ-বারোজন কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল। চ্যাং-দোলা করে এক সাপে-কাটা ছেলে নিয়ে। চোখ বোজা, ঠোঁট নীল। হাউমাউ করে কি যে বলল, তার ভাষা অন্য দেশের। কিন্তু মানে বুঝতে কারো কষ্ট হল না। অন্য কোনো অসুবিধাও হল না। আমাদের ওঝা থাকতে ভয়টা কিসের! সাপের বিষ ঝেড়ে মরা মানুষকে জ্যান্ত করে দিতে পারে ও। দয়া দিয়ে তৈরি ওর বদন।"

অসীম আড়চোখে মানুষের হাড় আর শাঁখের মালা পরা কুচ্‌কুচে কালো ওঝার চেহারাটা একবার দেখে নিল। মোট কথা ওঝা ছেলেটাকে ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে ভালো করে দিয়েছিল। ওরা কৃতজ্ঞতার চোটে গা থেকে সোনা রূপোর গয়না খুলে দিয়েছিল। পরে অসীম প্রধানের বৌয়ের গায়ে দেখেছিল তার কিছু কিছু। আশ্চর্য কারুকার্য।

শ্যামরতনদা বললেন, "তারপর কি হল? ওরা কিছুদিন থেকে গেল? ধান চাল এনে দিল? আপনারা কি দিলেন? প্রধান মাথা চুলকোতে লাগল।" ঠিক ও-রকম না বাবু। তোমরা সমতলের লোক ঠিক বুঝতে পারবে না। ওরা আমাদের অতিথি, আমরা ঘর-দোর খুলে দিলাম। কিন্তু থাকেনি ওরা আমাদের ঘরে। রাত হলেই বনে চলে যেত। ওটা বন-দেওদের এলাকা। আমাদের উদিকে পা দেওয়া বারণ। ভোরে চলে আসত। সারা দিন থাকত। আমাদের খাবার খেত না। ছিলও না কিছু বটে। ফসল তো শুকিয়ে খড়। ঘাসের বিচি সেদ্ধ আর বুনো পাখি খেয়ে কোনো মতে প্রাণ বাঁচাতাম আমরা। শকুন পর্যন্ত খেয়েছিলাম, যা আমাদের বাপ-ঠাকুরদারা কখনো ছোঁননি।

ওরা তিন মাসে আমাদের কথা শিখল, পাথরের খাঁজে নল ঢুকিয়ে ঝরণা বইয়ে দিল, গোলা বানিয়ে ধানে ভরে দিয়ে গেল। নিল শুধু শেকড় সুদ্ধ ওষুধের গাছ গাছড়া। বীজ ধান দিয়েছিল এক গোলা ভরা। এ বছর এক পরত মাটি

তুলে বীজ বুনতে বলেছে। নাকি জলে গোড়া ডোবাতে হবে না, নলের জলে মাটি ভেজালেই হবে।"

শ্যামরতনদা বললেন, "বনের ভিতর দিয়ে পথ আছে নিশ্চয়। তাহলে বর্মা থেকে এসেছিল ওরা মনে হয়। কিন্তু এত ধান আনল কিসে? ট্রাক তো এখানে উঠবে না।"

প্রধান একটু অবাক হল। "বর্মা থেকে? তা হবে। কিন্তু বড় ভালো লোক। ট্রাক তো মটর গাড়ি, সে এখানে আসতে পারে না। তবে পেলেন চেপে এসে থাকতে পারে। যে দিন চলে গেল, আমরা গাঁ সুদ্ধ ছেলেবুড়ো কাঁদছিলাম। তার মধ্যেই মনে হল কিসের যেন গুন্‌গুন্‌ শব্দ শুনলাম।"

তারার আলোয় অসীম আর শ্যামরতনদা এ-ওর মুখের দিকে চাইল। রাতে প্রধানের বড় ঘরে নরম লোমের কম্বলের ওপর আরামে ওরা ঘুমিয়েছিল। সকালে প্রধানের অনুমতি নিয়ে বন-দেওদের নিষিদ্ধ বনে গেছিল। প্রধান একটু দো-মনা করছিল, কিন্তু শ্যামরতনদার হাঙরমুখো সিগারেট লাইটার দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। ঐ নাকি দেওদের মুখ।

ঘন বনের মধ্যে সরু পায়ে চলা পথে ঘাস গজিয়ে আবার শুকিয়েও গিয়েছিল।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ঘন বনের মধ্যে আট-দশ কিলোমিটার গিয়ে দেখে মস্ত ঘাস জমি। মানুষ সমান উঁচু ঘাসে ঢাকা। তারি এক ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দশ-বারোটি গোল গোল ঝল্‌সানো দাগ। এখন আর পোড়া ঘাসের চিহ্ন নেই, কিন্তু যে কারণেই হক, নতুন ঘাস ও-জায়গায় ভালো করে গজায়নি।

অসীমের গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল, "বর্মা থেকে আসেনি, শ্যামরতনদা, এ আর কোন বড় শক্তির কাজ মনে হয়। নতুন রকম আকাশ-যান পরখ করে দেখে গেছে। বৈজ্ঞানিক নিয়মে ধান-চাষ শিখিয়ে দিয়ে সবাইকে হাত করে গেছে। এ জায়গাটা সীমান্তের বড় বেশি কাছে। আগন্তুকদের কি মতলব কে জানে। এদিকে মোড়লের দলের তো কথা ওদের মনে করলেও চোখে জল আসে! কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো উচিত, না শ্যামরতনদা?"

শ্যামরতনদা যেন নিজের মনের মধ্যে ডুবে গেছিলেন। খালি বললেন, "হুঁম।"

কিলং গ্রামে ফিরে এসে, আবার এক চোট বিদায়ের পালা। যাবার মুহূর্তে প্রধান একা ওদের সঙ্গে এল। নিচে জীপের রাস্তা অবধি পৌঁছে দেবে। ধান-

গমের নমুনা সে খুশি হয়ে দিল। সব জায়গায় হক এই ভালো শস্য। কিন্তু তারা বলেছিল পাহাড়ে ছাড়া হবে না। অসীম বলল, "চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? গরীব লোক যদি খেয়ে বাঁচে।"

শেষ মুহূর্তে শ্যামরতনদার দুটো হাত চেপে ধরে প্রধান ভাঙা গলায় বলেছিল, "তোমার পায়ে পড়ি, বাবু, ধান-গমের কথা সবাইকে বল, কিন্তু ঐ লোকেদের কথা মুখে এনো না। ওরা আমাদের মা-বাপ। সরকার জানতে পারলে ওদের ধরে নিয়ে যাবে। তাহলে ওরা কেউ বাঁচবে না। হাল্কা পালকের মতো শরীরে ভয়ঙ্কর শক্তি।

শ্যামরতনদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রকম দেখতে ওরা? বর্মীদের মতো?"

প্রধান একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, "বর্মীদের মতো বলছেন, বাবু? বর্মী দেখিনি। তাদের কি এদের মতো কপালের মধ্যিখানে আরেকটি চোখ থাকে? ওরা বলেছিল দু-চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে হয় আর তৃতীয় চোখ দিয়ে নিজের মনকে।"

চোখ মুছে তাকাল প্রধান। শ্যামরতনদা তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমার কোনো ভয় নেই, মায়ের-পেটের ভাই, তাদের কথা কাউকে বলব না।"

জীপে দুজনে বোবা। প্লেনে চড়ে পাশাপাশি বসা হল। শ্যামরতনদা তাঁর নোট বই বের করে খচ্‌খচ্‌ করে কি যেন লিখে বললেন, "এই নাও, ধর, তোমার বিবৃতির খস্‌ড়া।"

বিবৃতিতে লেখা—"কিলংএও খরা। এ বছর ফসল হয়নি। আগেকার প্রচুর ফসল গোলায় তোলা ছিল, এখন খরচ হচ্ছে। পাহাড়ি ধান, কম জলে হয় বলে প্রচুর নমুনা আনা হয়েছে, পরীক্ষা করে দেখা যায়।"

তিন চোখের কথা কি লেখা যায়?

---

১৩. শব্দ

.....

ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়ে কিছু দূরে গেলে যে চিংড়িখালি বলে একটা জায়গায় পৌঁছনো যায়, এ-কথা অনেকেই জানে না। অথচ দুশো বছর আগে ঐ জায়গার নামে এ অঞ্চলের লোকে ভয়ে কাঁপত, কারণ ঐখানে ছিল কুখ্যাত বোম্বেটেদের একটা বড় আস্তানা। এখনো মাটি খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ মড়ার খুলি কিংবা রূপোর বাসন বের করে চাষীরা আঁতকে ওঠে।

আমি অবিশ্যি এ-সব নিজে দেখিনি; আমার পিসতুতো ভাই সাবুর দাদুর বাড়ি ওখানে, আমার সঙ্গে চিংড়িখালির এইটুকুই সম্বন্ধ। সেবার পুজোর ছুটিতে গেছিলাম ওখানে। গ্রাম বলতে বিশেষ কিছু নেই, খান-দুই পুরনো পাকা বাড়ি, খানকতক টিনের চালের ঘর, একটা প্রাইমারি স্কুল, একটা পর্তুগিজ গির্জা, কাছেই নদীর ধারে জেলেদের গ্রাম, কয়েকটা দোকান, একটা কালী-মন্দির। সেখানে বোম্বেটেরা ফিরিঙ্গি কালীর পুজো দিত, জেলেরা এখনো দেয়। মন্দিরের চাবি থাকে গির্জার পাদ্রীর কাছে। সাবুর দাদুদের কুলপুরোহিত রোজ দুবেলা পুজো দিয়ে আসেন। বেশ রোমাঞ্চকর জায়গাটা।

গঙ্গা ওখানে দু'মাইল চওড়া, ওপার দেখা যায় না। জোয়ারের সময় মনে হয় বুঝি গোটা বঙ্গোপসাগর নদীর মুখে ঢুকে পড়ছে। হাওয়া দিলে অদ্ভুত গুপ-গুপ শব্দ হয়। হাঙরের ভয়ে কেউ জলে নেমে স্নান করে না। আমি নিজেই কতবার দেখেছি হাঙরদের তেকোণা পাখনা জলের ওপর ভেসে রয়েছে।

নদীর তীর ধরে আরেকটু দক্ষিণে গেলে মনে হয় বুঝি কোনো জনমানবশূন্য সাগরের দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। সেখানে উঁচু পাড়ি, বসতির চিহ্ন নেই; চাষ হয় না, মাটি বড় নোনা। সন্ধ্যাবেলায় সাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ওখানে একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। নদীটা সেখানে একটা বাঁক নিয়েছে, স্রোতের সে কি বেগ! পাড়িটা পাথুরে, তার ওপর ছলাৎ ছলাৎ করে জল আছড়ে পড়ছে, তারপর ফেনা ছিটিয়ে কলকল করে ছুটে যাচ্ছে।

ডুবন্ত সূর্যের আলোতে হঠাৎ মনে হল নদীর ঢেউয়ের বুকে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

পাথরের চাঁই মাথা তুলে রয়েছে, তারই মধ্যে যেন একটা কালো পাথরের প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। সেটা চারপাশের সঙ্গে এমনি মিলিয়ে আছে যে হঠাৎ ঠাওর হয় না। ঠিক প্রাসাদ হয়তো নয়, তবে চারদিকে উঁচু প্রাকার দিয়ে ঘেরা একটা কেল্লা বটে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে জলের শব্দ ঠিক কানে আসছিল না, শুধু একটা মিহি গুম-গুম ক্যাঁও-ক্যাঁও মনে হচ্ছিল।

সাবু বলল, "অত অবাক হবার কি আছে? ঐ তো বোম্বেটেদের কেল্লা। উত্তরাধিকারসূত্রে দাদুদের ওটা পাওয়া উচিত। আমরা বোম্বেটেদের বংশধর।"

"কে থাকে ওখানে? একটা আলো জ্বলে উঠল যে?"

"থাকে এক পাগলা প্রফেসার। গোপনে গবেষণা করে। আর থাকে তার অ্যাসিস্টেন্ট। ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোকরা ওদিক মাড়ায় না। চল, জায়গাটা সত্যি ভালো না! এত দূর এসেছি জানলে দাদু রেগে যাবেন। এখানকার লোকরা নাকি অনেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে—ও কি!"

খ্যা—খ্যা—খ্যা—খ্যা করে কে জানি বিকট হেসে উঠল। দেখি লালচে মুখ, রোগা লম্বা একটা লোক, তার খাড়া খাড়া কাঁচা-পাকা চুল, পরনে জাহাজের সারেঙদের মতো ঢিলে নীল কুর্তা পাজামা, কখন নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

সাবু আমার শার্ট ধরে টেনে বলল, "বাড়ি চল।"

লোকটা বলল, "সে কি, মজা না দেখেই চলে যাবেন? ঐ যে পাগলা প্রফেসার যন্ত্রপাতি সওদা করে ফিরছেন, দেখে যাবেন না? কেউ ওঁকে দেখতে পায় না।"

আমি বললাম, "কিসের যন্ত্রপাতি? কি হয় ওখানে?"

লোকটা উঠে পড়ে বলল, "কি জানি, মুখ্যু মানুষ। শুনেছি শব্দ ধরার যন্ত্র।" এই বলে টুপ করে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম দূরে একটা কালো নৌকো খোলামকুচির মতো ঢেউয়ের মাথায় উঠছে পড়ছে। চারদিক থমথম করছে। আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ি ফিরলাম।

জায়গাটা গল্পের বইয়ের জায়গার মতো। রাতে সমুদ্রের কচ্ছপের মাংস হয়েছিল! মাখনের মতো নরম। ওখানকার হাটে প্রকাণ্ড গুগলী বিক্রি হয়। অদ্ভুত চেহারার মাছ কেনে লোকে। এক রকম মাছের আবার মাথার একই পাশে দুটো চোখ, অন্য পাশটা চাঁচা-পোঁছা। পাথরের ফাটল থেকে জেলেদের ছেলেরা এই বড় বড় নীল চিংড়ি, কালো কাঁকড়া টেনে বের করে, বিক্রি করতে আনে। রুই কাতলাকে ওরা বলে নিরামিষ।

সাবুর দাদু এ-সব কথা বলেছিলেন আমাদের। ওখানে ওঁদের চোদ্দ পুরুষের

বাস। ও জায়গা সম্বন্ধে জানেন না এমন কিছু নেই। দুঃখের বিষয়, বোম্বেটের কেল্লা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা গেল না, কারণ ওদিকে আমাদের যাবার কথা নয়।

কিন্তু জায়গাটা আমাদের চুম্বকের মতো টানত। রোজ যাওয়া ধরলাম। ক্রমে সাহস বাড়তে লাগল। পাড়ির ওপরের পথে না থেকে, পাথরের খাঁজে পা রেখে একটু একটু করে নিচের দিকে নামা ধরলাম! যতই নামি ততই কেল্লাটাকে স্পষ্ট করে দেখা যেতে লাগল। নিরেট পাথরে তৈরি, চারদিকে দোতলার সমান উঁচু দেয়াল, দেয়ালের গায়ে ছ্যাঁদা। তার ভিতর দিয়ে বোম্বেটেরা শত্রুদের গুলি করত। পাঁচিলের গায়ে লোহার দরজা। বাইরে গভীর খাল কাটা। এক দিক দিয়ে তার মধ্যে নদীর জল হুড় হুড় করে ঢুকছে, আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পার হবার জন্য পুল আছে, সেটাকে লোহার শেকল দিয়ে টেনে কপিকলের সাহায্যে তুলে রাখা হয়েছে। সামনের দিকটাতে নদী। ব্যস্, কেল্লাটি যেন উদ্দাম জল-বেষ্টিত একটা দ্বীপ। দেখলে গা শিরশির করে।

নামতে নামতে সাত দিনের দিন কেল্লার পাথরের পাদদেশে পৌঁছে গেলাম। পাথরের খাঁজে অদ্ভুত পাখির বাসা দেখলাম। তারা আমাদের দেখে, ক্যাঁও ক্যাঁও লাগাল।

পায়ের নিচে পাথর বড় পিছল। সামনে উত্তাল জলের স্রোত। বুক ঢিপঢিপ করছিল। সন্ধ্যা হয়েছে, এখন ফেরা উচিত। ফিরতে যাব, এমন সময় পেছনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দুটো লোক আমাদের কনুই চেপে, হাতদুটোকে পেছনে পাছ-মোড়া করে ধরল। আমি আঁ আঁ করে যাই আর কি! সাবু বলল, "কি! কি! আমরা তো শুধু দেখছি, কোনো অনিষ্ট করছি না। ভালো করে দেখতেও পাচ্ছি না।" বেঁটে জন কাষ্ঠ হেসে বলল, "সেই ভালো গোমেজ, ভেতরে এনে ভালো করে দেখিয়ে দেওয়া যাক।"

গোমেজ বলল, "শুনিয়ে দেওয়া যাক, বলুন। কি খোকারা, বলিনি স্যার শব্দ ধরেন?"

এই তবে সেই পাগল বৈজ্ঞানিক। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন "আঃ গোমেজ! যার তার কাছে আমাদের গোপন গবেষণার কথা বলে বেড়াও কেন বল তো? সে যাক গে, আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম। আজ আমার মন বড় ভালো। এত দিনের চেষ্টা সফল হবার মুখে! ভালোই হয়েছে তোমরা এসেছ। তোমরা বড় ভাগ্যবান, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদানের নমুনা সবার আগে তোমরা শুনতে পাবে! ও কি, চোখ পিটপিট করছ কেন, গোমেজ, নিয়ে চল।"

"চোখ বাঁধব, স্যার?"

"আরে না না, আর গোপনীয়তার দরকার নেই। চল।"

দেখলাম হাঙর-ভরা পারিখার তলায় গোপন সুড়ঙ্গ পথ আছে তাই দিয়ে ঢুকে আমরা কেল্লার হলঘরে উঠলাম। অদ্ভুত জায়গা। পাথরে তৈরি, মনে হল কামান দাগলেও টসকাবে না। সেখান থেকে যে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসাল, সেটা একটা আধুনিক গবেষণাগার ছাড়া আর কিছু নয়। রেডিও, রেকর্ডার, গ্রামোফোনের ম তো সব যন্ত্রপাতি। তাকের ওপর বড় বড় সমুদ্রের শাঁখ, বাজনাবাদ্যি, বাঁশি, খোল, করতাল।

পাগল বৈজ্ঞানিক বললেন, "অবাক হবার কিছু নেই। শব্দ নিয়ে গবেষণা করি, শব্দ তৈরির জিনিস থাকবে না? এ আর কি দেখছ কত মোরগ, ছ্যাতারে, বেড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো, উল্লুক, কোলাব্যাঙ ইত্যাদি আছে আমার সাউণ্ড-প্রুফ ঘরে। নইলে ক্ষেপে যাব। ওদের গলার স্বর পাখার ঝাপটানি মহাশূন্যে অনন্তকাল ধরে তরঙ্গায়িত হবে, ভাবলেও রোমাঞ্চ হয় না? ও কি গোমেজ?"

গোমেজ প্রফেসারের কোঁকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল, "শব্দ-তরঙ্গের মূল কথা বুঝিয়ে না দিলে কিছুই ওদের বোধগম্য হবে না, স্যার!"

প্রফেসার বসে পড়লেন। দেখলাম মোটা, বেঁটে, কালো লোমশ, খ্যাঁদা নাক, সাবুর দাদুর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য। পায়ে রবারের চটি, বোধ হয় যাতে অনন্তকাল শব্দ না হয়। প্রফেসার বললেন, "এটুকু নিশ্চয় জান যে শব্দ হলেই তরঙ্গ ওঠে? মানে তরঙ্গ না উঠলে শব্দই হয় না? সেই তরঙ্গগুলো যায় কোথায়?"

আমরা বললাম, "থেমে যায়, স্যার, আর শোনা যায় না।"

প্রফেসার রেগে গেলেন। "থেমে যায় না হাতি! এই বুদ্ধি নিয়ে তোরা বেঁচে আছিস!"

গোমেজ বলল, "বুদ্ধি না স্যার, বিদ্যে।"

"তুমি থাম, গোমেজ, অকারণে তরঙ্গ তুলো না। তরঙ্গ থামে না। অনন্তকাল ধরে দূর থেকে দূরান্তরে মহাশূন্যে কেবল এগিয়ে চলতেই থাকে। কোনো শব্দ থেমে যায় না। সেই আদ্যিকালে একটা বিকট বিস্ফোরণের ফলে সূর্যের গা থেকে পৃথিবীর গ্যাস ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল তার শব্দও আজ পর্যন্ত মহাশূন্যের বুকে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে তো চলেইছে। কিচ্ছু থামে না। ডাইনোসরদের ক্যাঁওম্যাও, ম্যাস্টোডনের গর্জন, মহা-গিরগিটির খচমচ, তেমন ব্যবস্থা করতে পারলে, আজও শোনা যেতে পারে।" আমরা তো তাই শুনে হাঁ!

প্রফেসার লজ্জিতভাবে হেসে বললেন, "আমি সে ব্যবস্থা করছি।"

আমরা আঁতকে উঠলাম। প্রফেসার বললেন, "গোমেজ, কান ফুসফুস লাগাও!"

কোথা থেকে চারজোড়া ইয়ার-ফোন বের করে, গোমেজ নিজের ও আমাদের কানে লাগিয়ে দিল। প্রফেসার সুইচ টিপলেন। অমনি কানে আসতে লাগল অদ্ভুত সব শব্দ! যেন দূরে কিছুতে গর্জন করছে, কাছে কিসের প্রচণ্ড হাঁসফাঁস, মাঝখানে কান ফাটানো চ্যাঁ-চ্যাঁ! আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা। প্রফেসার ঝুঁকে পড়ে সুইচ বন্ধ করে বললেন, "আদিম মহাকায়দের দৈনন্দিন জীবনের কয়েক মিনিটের শব্দ শুনলে। এবার যা শুনবে সেটা ওর কয়েক লক্ষ বছর পরের শব্দ। গোমেজ, দুই নম্বর দাও।"

অমনি মনে হল কলকল, ছলছল, হুড়হুড়, হড়হড় করে প্রবল জলরাশি কূল ছাপিয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে গব-গব গরাস্ করে বড় বড় কি সব ডুবে যাচ্ছে। আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ফট্ করে প্রফেসার সুইচ বন্ধ করতেই ধড়ে প্রাণ এল।

প্রফেসার বললেন, "বাইবেলে যে মহাপ্লাবনের কথা আছে, এ হয়তো তারই শব্দ। এবার তিন নম্বর দাও, গোমেজ। এই জায়গাটাতে দশ হাজার বছর আগে কেমন শব্দ হত শুনুক এরা।"

সঙ্গে সঙ্গে কানে এল সড়সড়, খরখর খুরখুর, খুট খুট, টকটক, কটকট, গুম গুম গুম, ধুপ ধুপ ধুপ—! প্রফেসার সুইচ টিপতেই সব চুপ। প্রফেসার হেসে বললেন, "এখানকার আদি বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক শব্দ শুনলে। জলাভূমির গোসাপ, গিরগিটি, কচ্ছপ, কুমীরের চলাফেরা আর সেই পটভূমিকায় আদিম মানবের ঢোল পেটা ও তাণ্ডব নৃত্য।"

তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "অনেক রাত হয়েছে, গোমেজ তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক। আমার ঢের কাজ বাকি। তানসেন ধরতে হবে; বেহুলার নূপুরের ঝমঝম। আচ্ছা, তাহলে এসো।"

আমাদের মুখে কথা নেই। গোমেজ টর্চ জ্বেলে দুজনকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে বের করে, নদীর উঁচু পাড়ের তলা দিয়ে হাঁটিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে দাদুর সামনে হাজির করল। "এই নিন, বড়বাবু, আগাগোড়া চোখে চোখে রেখেছি। কোনো অনিষ্ট করেনি। আচ্ছা চলি, স্যারের জন্য কচ্ছপের ডিমের অমলেট ভাজতে হবে।"

গোমেজ চলে গেলে, দাদু মুচকি হাসতে লাগলেন। একটুও বকলেন না। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল-বারের মতো গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন, "প্রাগ্-

ঐতিহাসিক শব্দ শুনে বুঝি পিলে চমকেছে? ওতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সেকালে ঐ ধরনের আওয়াজ হওয়াই স্বাভাবিক। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে ঐ সমস্ত রোমাঞ্চকর শব্দ সবই এই সামান্য জিনিসটা দিয়ে তৈরি।"

এই বলে তাকের ওপর থেকে মাটির খোল বসানো একটা খেলনার একতারা আর তার বাঁশের ছড় নামিয়ে দেখালেন। আমাদের চক্ষু ছানাবড়া।

"কে শব্দ তৈরি করল, দাদু?"

"কে আবার করবে, এই শর্মা ছাড়া? কার অত মাথাব্যথা ভাই বল্? আমার মামা-বংশের শেষ উত্তরাধিকারীকে তো শব্দ-শব্দ করে ক্ষেপে যেতে দিতে পারি না। যেটুকু পারি শব্দ যোগাই। সারা বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স পড়ায়। ছুটি পেলেই এখানে এসে গবেষণা করে, নিজের পয়সাকড়ি, সময় সব ঢালে, সে-সব তো আর ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া যা চালাক, শীগগিরই একদিন প্রাগ্-ঐতিহাসিক না হোক, নিদেন 'ঐতিহাসিক শব্দ ঠিক ধরে ফেলবে। তার আগে যাতে নিরাশ হয়ে ছেড়ে না দেয়, সেটুকু দেখা তো আমার কর্তব্য। তাই যা পারি খোরাক যোগাই। গোমেজের সাহায্যে। শুনবি নাকি?"

এই বলে একতারাটা তুলে নিয়ে কখনো ছড় টেনে, কখনো ঢাকের মতো পিটিয়ে, কখনো তারে চিমটি দিয়ে, কখনো খোলের ওপর নখ দিয়ে আঁচড়ে, কখনো খাবলে, কখনো খামচে, কখনো খুঁটে, কখনো ঠুকে, কি শব্দ যে না বের করলেন তার ঠিক নেই। মনে হতে লাগল আদিম কালের কোনো জলাভূমির ধারে দাঁড়িয়ে অতিকায় সরীসৃপদের জীবনযাত্রার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। যে যেখানে ছিলাম হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম; আর দাঁড়াতে পারলাম না।

তারপর একতারাটাকে আবার তাকে তুলে, দাদু বললেন, "কিন্তু তোদের না ওদিকে যেতে মানা করেছিলাম! শেষটা আমাকে ধরে ফেলে সব ফাঁস করে দিস আর কি! গোমেজটার চোখ রাখার কথা ছিল, ব্যাটা করেটা কি? অবিশ্যি যথেষ্ট হেল্পও করে। গবুর রেকর্ডারের সঙ্গে আমার গাছের ওপরের মাইক না হলে কে কনেক্ট করত শুনি? তাছাড়া আমি যখন গাছে চড়ি, ও মই ধরে। এ-সব ঋণ শোধ করার নয়।" আমি বললাম, "গবু কে, দাদু?"

দাদু তো অবাক! "সে কি, গবুকে জানিস না? ঐ তো তোদের পাগলা বৈজ্ঞানিক, আমার মামাতো ভাই গবু। যা, খেয়েদেয়ে শো গে, যা।"

---

১৪. লিম্বো সায়েবের পেশা

অর্ধেকটা শহরের সব বাড়িগুলো পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে, অর্ধেকটা নিচে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মধ্যিখানে তোরসা নদী। তার জলের কি স্রোত! সেই স্রোতে ছোট বড় রূপালী মাছ ডিগবাজী খায়। পাহাড়গুলিতে তুঁতফলের বন। তাতে গুটি পোকার চাষ হয়। গুটি থেকে মুগার সুতো হয়। সেই সুতো তাঁতে চড়িয়ে রেশম বোনা হয়। এদিককার বেশীর ভাগ লোক সেই কাজ করে। দেশ-বিদেশে ঐ রেশমের চাহিদা।

দুরকম চেহারার লোক থাকে পাহাড়তলিতে। তারা দুই ভাষায় কথা বলে। পাহাড়ের ওপর থেকে ধূপকাঠ আর গাওয়া ঘি বেচতে আসে যারা, তাদের বেঁটে বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা শরীর, ট্যারা চোখ, থ্যাবড়া নাক, কটা চুল। তাদের কেউ কেউ নিচেই থেকে গেছে, সবজি বাগান করে দুধ বেচে। আর নিচের লোকরা ওদের চেয়ে রোগা লম্বা টিকলো নাক। সবার ছেলেমেয়েরা একই স্কুলে পড়ে, একই মাঠে খেলে। এ ওকে মামা চাচা বলে। সবাই সবার কথা বোঝে।

এরা সবাই সবাইকে চেনে, সবার বাড়ি সবাই যায়, দুই জাতের হলেও, স্থানীয় লোক সবাই। এখানে জন্মেছে, বড় হয়েছে। খুব একটা বড়লোক কেউ নয়, তেমনি খুব গরীবও নয়। তবে একেবারেই যে গরীব নেই, তাও নয়। তারা শহরে থাকে না। পাহাড়ের একটু উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে বিদেশী কাপড়চোপড়, বাসনকোসনের বোঁচকা নিয়ে বেচতে আসে। ভালো জিনিস আনে। লোকে কেনেও। এখানে ও-সব পাচ্ছে কোথায়? তবে সবাই সাবধান হয়ে যায়। বলে বিদেশী গুপ্তচর। ওদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে পুলিশ ধরবে। খিড়কি দোরে হুড়কো দেয়। গরু বাঁধে। ছেলেপিলেকে ঘরে ডাকে।

অচেনা বিদেশী এরা পছন্দ করে না। চীনে যুদ্ধের সময় তারো আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেক পোড় খেয়েছে। মনে মনে ঠিক করেচে আর নয়। ভিন-দেশীরা এখানে আর ঠাঁই পাবে না। দুইবারই যথেষ্ট। সেই সময় থেকে যারা

এখানে থেকে গেছে, তারাও এখন স্থানীয় লোক হয়ে গেছে। তারাও অচেনা লোক ভয় করে।

বলেচি না, সবাই এক-ই স্কুলে পড়ে। এক সময় গায়ের পাদ্রীরা স্কুলটা করেছিল; এখন সরকারী সাহায্যে চলে, ছেলে-মেয়ে সবাই পড়ে এখানে। মাস্টাররা, দিদিমণিরাও সবার বাড়ি যান। দাওয়ার ওপর চাটাইয়ে বসে আখের গুড় দিয়ে চা খান। কেউ কেউ একটু দূর থেকে এলেও, তাঁদের বিদেশী বলা যায় না। হেডমাস্টারকে সবাই ডাকে স্যার; ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবার আগে তাঁর মত নেয়। কারো বাড়িতে কোনো ব্যাপার হলে, মাস্টার-মশাইদের দিদিমণিদের আগে ডাক পড়ে। বেশ সুখে থাকে ওরা। ভারি জ্ঞানী দয়ালু মানুষ।

এর মধ্যে নতুন বছরের গোড়ায় চারজন একরকম চেহারার নাতি-নাতনিকে স্কুলে ভর্তি করতে পাহাড় থেকে নেমে এলেন লিম্বো সায়েব। তাই বলে সত্যিকার সায়েব না। শোনা গেল ঐ তাঁর নাম। বড় সাহেবের ঘরে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল যেমন সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই পাদ্রীদের সময় থেকে ঐ স্কুলে নিয়ম চলে আসছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। যে যে ক্লাসের উপযুক্ত তাকে সেই ক্লাসে ভরতি করা হবে।

স্কুলময় গুজব রটে গেল ওরা চারজনেই ক্লাস সেভেনে ভরতি হবে। নাকি এক সঙ্গে জন্মেছিল, এক মিনিট পর পর। ওদের নাম নাকি একা দোকো তেকা চৌকো। একা তেকা মেয়ে, বাকী দুটো ছেলে। ভারি সুন্দর দেখতে এক নাক মুখ, তিন রকম চোখের রং। কারো কালো, কারো সবুজ, কারো পাটকিলে, কারো নীল। লাল লাল গাল, কটা কটা চুল। এদেশের লোক যে নয় সে আর বলে দিতে হল না। চমৎকার হিন্দি, বাংলা বলে, ইংরিজি জানে। হাসি-খুশি, মিশুকে। দেখতে দেখতে ছাত্রছাত্রী মাস্টারমশাই দিদিমণি সবাই তাদের ভালবেসে ফেলল।

যেমন ভালো পড়াশুনায়, তেমনি ভালো খেলাধূলায়। ইতিহাস ভূগোল তেমন জানত না, জীববিজ্ঞানও নয়। অংকে বেজায় ভালো। একটুও অহংকার ছিল না ওদের। যেসব বিষয়ে কাঁচা ছিল, একে ওকে জিজ্ঞাসা করে নিত; যে বিষয়ে ভালো জানত সবাইকে সাহায্য করত। সত্যিকার বন্ধুর যা কাজ। ওদের বাড়ি পাহাড়ের খানিকটা ওপরে, শহরতলি থেকে দেখা যেত না। বাড়িতে খালি ওরা আর ওদের দাদু লিম্বো সায়েব। মা-বাবা দেশে থাকতেন। দেশের অদ্ভুত একটা নামও বলত, বোধ হয় তিব্বত কি চায়নার কাছাকাছি হবে। ওরা

ভারতীয় জ্ঞান শিখতে এসেছিল। তাই বলত ওরা, 'ভারতীয় জ্ঞান বড় আশ্চর্য কিন্তু দাদু রোজ নটায় ওদের স্কুলে পৌঁছে দিতেন, আবার তিনটের সময় নিয়ে যেতেন। দেখতে দেখতে বড় স্যারের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। হাতে করে ওঁদের বাগানের ফলটল এনে দিতেন। হেড মাস্টার মশায়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করতেন। ইংরিজি বাংলা দুই-ই বলতেন। এত ভালো বলতেন যে মনে হত বই থেকে পড়ে বলছেন। কোথাও এতটুকু ভুল থাকত না। থাকে ঐ রকম লোক। ইংরাজীতে তাদের বলে পার্ফেক্শনিস্ট, অর্থাৎ নিখুঁৎ-জ্ঞানী। ভারী বিজ্ঞানের ভক্ত। বলতেন বিজ্ঞানে ভুলের এতটুকু জায়গা নেই, তাই সব জায়গায় বিজ্ঞানের জয়-জয়কার। বিজ্ঞান ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারো এক মিনিট চলে না। বিজ্ঞানই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রয়েছে।

বড় পণ্ডিতমশাই খুব ভালো পদ্য লিখতেন। তিনি বললেন, 'আর কাব্য?' লিম্বো সায়েব হাসলেন, 'কাব্য হল গিয়ে ভুলের স্বর্গ! তবে বড় চিত্তাকর্ষক জিনিস। এসে অবধি ভাবছি ঐ বিষয়ে কিঞ্চিৎ গবেষণা করব।' পণ্ডিতমশাই নিজেও কাব্যবিশারদ, উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন, 'আমাকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়, সায়েব আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।' লিম্বো সায়েব ব্যস্ত হলেন, 'না না, কাব্য নিয়ে নয়, ঐ স্কুলের ব্যাপারটা নিয়ে আমার গবেষণা করবার ইচ্ছা হয়েছে বড়ই চিত্তাকর্ষক বিষয়টা।'

বাকি সবাই অবাক হলেন। 'কি এমন চিত্তাকর্ষক তা বুঝলাম না। আমাদের মতো যদি রোজ হাজার হাজার ভুল ঘাঁটতে হত, মশাই, তাহলে ও-কথা মুখে আনতেন না। মাঝে মাঝে নিজেদেরই মাথা গুলিয়ে যায়। একই প্রশ্নের লক্ষ লক্ষ রকম ভুল উত্তর।'

মিঃ লিম্বোর চোখ চকচক করতে লাগল, 'সেই জন্যেই তো এত চিত্তাকর্ষক! ঠিক উত্তর একটাই। ভুলের গোণাগুণতি নেই! এই নিয়ে গবেষণা করব না তো কি নিয়ে করব বলুন? চাই কি ভুলের একটা ইতিহাসই লিখে ফেলতে পারি।' খুব হাসতে লাগলেন সায়েব। মুখটা ঝলমল করে উঠল। ঠিক সেই সময়ে ঢং ঢং করে তিনটের ঘণ্টা পড়ল। সবাই ওঠে পড়লেন।

লিম্বো জিব কেটে বললেন, 'এই যা! আসল কথাই বলা হল না। আমাদের একটা কাজের লোক না হলে চলবে না বুঝলেন। তা সে বোকাসোকা আনাড়ি হলেও চলবে।'

২

ঠিক সেই সময় স্কুলের বড় দারোয়ান বাহাদুর পেটা ঘণ্টার হাতুড়িটা রাখতে এসেছিলেন—ওটি বন্ধ করে না রাখলে অদৃশ্য হয়ে যেত। তা শেষের কথাগুলো তার কানে গেছিল। কিন্তু তখন কিছু বলেনি।

চার নাতি-নাতনীকে সংগ্রহ করে লিম্বো সাহেব পাহাড়ের পথ ধরবার দশ মিনিট পরেই, পেছন থেকে স্কুলের কেরানীবাবু ফটিকচন্দ্রের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে এসে বাহাদুর তাঁদের ধরে ফেলে বলল, সাহেব আমার ভাগ্‌নে নরবুকে রাখুন।

'সাহেব, আমার ভাগ্নে নরবুকে রাখুন'

খেতে পরতে দেবেন আর সামান্য কিছু হাত-খরচ, যাতে শুক্কুরবার শুক্কুরবার সিনেমা দেখতে পারে। তাহলেই ও খুশি হয়ে থাকবে, আপনার কাজও হবে আর আমিও বাঁচব। নইলে কবে আমার বৌ ওকে মেরে তাড়িয়ে দেবে।

লিম্বো সাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'আশা করি খুব ভালো কাজকর্ম জানে না? ভুলভাল না করলে আমি তো রাখতে পারব না।' ফটিকবাবু বললেন, 'সব কথা খুলে বলাই ভালো, বাহাদুর। উনি নিজগুণে ক্ষমা করবেন।'

একটু আশ্চর্য হলেও বাহাদুর মাথা চুলকে বলল, 'সত্যি কথা বলতে স্যার, ভুল ছাড়া আর কিছু করে না। মানুষটাও বড় ভালো নয়, চুরি-টুরি করবে। কুঁড়েও আছে। আর ঐ কাজকম্ম কিছু পারে-টারে না! বাসন ভাঙে, চিঠি

ডাকে না দিয়ে হারিয়ে ফেলে, কিচ্ছু মনে থাকে না, যা রাঁধতে বলবেন তার উল্টোটা রাঁধবে—ও কি স্যার? লিম্বো সাহেব সব কথা টুকে নিচ্ছিলেন। 'না, না, ও কিছু নয়। ঐ রকম ছেলেই আমি খুঁজছি। আজই পাঠিয়ে দিও। খাওয়া-পরা আর ধর গোড়ায় কুড়ি টাকা মাইনে আর সিনেমার টিকিট। কেমন?'

ফটিকবাবু এতটা ভাবতেই পারেন নি—'স্যার, আমাদের কথা ঠিক বুঝলেন তো? ভারি নচ্ছার ঐ নরবু। কিন্তু বড় দুঃখী। মা-বাবা নেই। বাহাদুরের বৌ ওকে দেখতে পারে না। পেট ভরে খেতেও দেয় না।'

লিম্বো সাহেব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'বাঃ! বাঃ! এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? তোমার কোনোও ভয় নেই। আমাদের বাড়িতে চুরি করার মতো কিচ্ছু নেই। সন্ধ্যা নামার আগে নরবুকে খুঁজে দিয়ে যাবে বলে কথা দিল বাহাদুর। সাহেবের আর তর সয় না, 'ও বাহাদুর, আমাদের বাড়ীতে পথ চিনে যেতে পারবে তো? ঐ যে পাহাড়ের গায়ে ইউকালিপ্টাস বন, ওরি ভেতর আমাদের বাড়ি। ইউকালিপ্টাসের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে বড্ড ভালো। ওদিকে আর বাড়িটাড়ি নেই, গেলেই চিনতে পারবে।' ফটিকবাবু অবাক হলেন, ওভাবে একা থাকাটা কি ঠিক সাহেব, ছেলেপুলে নিয়ে? বর্ডারের ওপার থেকে মাঝে মাঝে হানাদাররা এসে গোরু-ছাগল ধরে নিয়ে যায়।

তাই শুনে লিম্বো সাহেব খানিকটা হো হো করে হেসে নিয়ে বললেন, 'ওভাবে থাকাই ঠিক, বাবু, ভুল আমরা করি না। এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। কিন্তু চোর-ডাকাত এলে বড়ই ভুল করবে। দেখতে দেখতে একেবারে নেই হয়ে যাবে।'

বাহাদুরের চোখ গোল, 'পাহাড়ি কুত্তা আছে বুঝি স্যার? নরবুকে কামড়াবে না তো? মা-মরা ছেলে, হাড়পাজি হলেও একেবারে কুকুরের মুখে তো আর ঠুসে দিতে পারি না—'

সায়েব ওর পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন, 'না, না, তোমাদের কোন ভয় নেই। নরবু আমার এই নাতি-নাতনীদের মতোই নিরাপদে থাকবে। আর কুকুর যদি কামড়ায়-টামড়ায়-ও, তবু কিছু হবে না, এই আমি কথা দিলাম।'

ফটিকবাবু একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'আর দেখুন স্যার, দোকান বাজার ও ভালোই করবে, কিন্তু ওর হাতে টাকা-কড়ি না দেওয়াই ভালো, গুণের তো আর অন্ত নেই। বরং ফর্দ করে দেবেন, শনিবার গিয়ে শোধ করে দেবেন।'

লিম্বো সাহেব ওঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'কোনো চিন্তা করবেন না। আমাদের অন্য ব্যবস্থা আছে। জিনিসপত্র এখান থেকে কেনা-কাটা করি না।'

ফটিক বাবু এমনি অবাক হয়ে গেলেন যে কিছুই বলতেই পারলেন না। কোন মতে বিদায় নিয়ে, দুজনে, ফেরার পথ ধরল। 'কি রে বাহাদুর, কি ভাবছিস?' 'ভাবছি বাবু, ওখানে চিড়িয়া ধরতে মাঝে মাঝে যাই, বাড়িঘর তো দেখিনি।' 'নতুন তৈরি করেছে সায়েব নিশ্চয়।' কাঠ পাথর ছুতোর রাজমিস্ত্রি, গাঁ থেকে কাউকে ডেকেছে বলেও শুনিনি, বাবু।' 'তুই একটা গাধা। মনে হয় ওঁদের বাড়ি বর্ডারের ওপারে। সেখান থেকে কারিগর আনিয়েছিলেন হয়তো। শেষ করে গেছিলে ঐ বনে?'

'তা বাবু, এই সালে আর যাওয়া হয় নি। চিড়িয়া ধরার সময় আসেনি। তবে লড়াইয়ের সময়, তৈরি করা দেয়াল দরজা ছাদ দিয়ে সাত দিনে মিলিটারিদের ঘর বানাতে দেখেছিলাম। দু-তিন হাত উঁচু ফুলের ফলের গাছ এনে ওষুধের সার দিয়ে, চার পাশে লাগিয়ে দিত। মনে হত কত দিনের বাড়ি। এ-ও হয়তো তাই করেছে।' 'তা না হয় হল। কিন্তু খায় কি? বাজার করে না, এ আবার কেমন কথা? নরবুকে বলে দিস্, চোখ কান খাড়া রাখতে। কেমন সন্দেহ হচ্ছে—'

বাহাদুর কাষ্ঠ হেসে বলল, 'তা আর ওকে বলতে হবে না। চোখ কান হাত চালিয়েই তো পাহাড়তলির প্রত্যেক বাড়ির চাকরি খুইয়েছে। বাজার করে না, সে আর এমন কি? মিলিটারি সায়েবরাও এখানকার জিনিস খেত না। টিনে করে, শিশিতে করে, দেশ থেকে আনাত। বলত এখানকার জিনিসে বিষ আছে, খেলেই লোকে মরে যায়।'

এই কথা ভেবে দুজনে খুব খানিকটা হেসে নিল। ততক্ষণে নিচে পৌঁছে গেছিল। ফটিকবাবু বিকেলে ধরা মাছ কিনে বাড়ি গেলেন। বাহাদুরের তাজা মাছ সহ্য হত না, সে নরবুর খোঁজে বেরুল।

৩

নরবুকে খোঁজা এক কথা, তাকে পাওয়া আরেক কথা। যে কথাটি লজ্জার কারণে বাহাদুর ফাঁস করেনি, সেটি হচ্ছে এর দু-তিন দিন আগে চ্যালা-কাঠের বাড়ি মেরে নরবুর মামী তাকে বাড়ি ছাড়া করেছিল। তার দেখাদেখি বাহাদুরও নাকি দিন কে দিন নিষ্কর্মা হয়ে উঠছিল। মুখে কিছু বলবার সাহস না থাকলেও, দিদির অনাথ ছেলেটার ওপর বাহাদুরের যথেষ্ট মায়া ছিল। কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে কে জানে। অন্য সময়ে ফেরারি হলে, দু-দিন বাদে স্কুলে এসে মামার কাছে

পয়সা-কড়ি চেয়ে নেয়। এবার তার টিকির দেখা নেই। পনেরো বছরের ছেলে যাবেই বা কোথায়?

মনে বড়ই দুশ্চিন্তা নিয়ে বাহাদুর শহরতলির বদ ছেলেদের আড্ডায় গিয়ে বলে এল, লিম্বো সায়ের নরবুকে একবার ডেকেছেন, এ-কথা যেন তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। আড্ডার পাণ্ডা গংগু কাঠের রেলিং থেকে ঠ্যাং না নামিয়ে, মুখ থেকে বিড়ি না ফেলে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল, 'নরবু-টরবু নেই এখানে। তাকে আমরা চিনি না। কেন, তাকে দিয়ে কি দরকার? পিঠে চ্যালা-কাঠ ভেঙেও মন ওঠেনি?'

এইখানে বাহাদুর হাউহাউ করে কেঁদে ফেলাতে, গংগু ঠ্যাং নামিয়ে, বিড়ি ফেলে, নরম গলায় বলল, 'আহা, কাঁদবার কি আছে, মামু? নরবু যাবে সায়েবের কাছে।' বাহাদুর তো অবাক! তবু যে যাবে, তাতেই নিশ্চিন্ত। তাই বললও গংগু। 'তুমি নিশ্চিন্তে ঘরে যাও, মামু। আমাদের পান খাবার জন্য এক টাকা দিয়ে যাও।'

এর ক-দিন পরে নতুন কোট গায়ে দিয়ে নাতি-নাতনীদের পৌঁছে দিয়ে গেল নরবু। মামাকে বলে গেল সে খুব মনের খুশিতে আছে। সায়ের বড় ভালো। রান্না করতে হয় না। রান্নার নরবু জানে কি? খালি খেতেই জানে; তাও এতকাল জোটে নি। সায়েবের বাড়িতে মেশিনে রান্না হয়। টিনে, বাক্সে বিদেশী খাবার থাকে। ঝরণার জল ফুটিয়ে বড়ি গুলে চা, কফি, দুধ, সরবৎ তৈরি হয়। সে কি ভালো খেতে! ঘরদোর সাফসুপ রাখতে হয়। দুটো কালো বাঁদর পুষেছেন, তাদের যত্ন করতে হয়। এত সুখে কখনো থাকেনি নরবু। শুনে বাহাদুরের চোখে জল এল, আহা, দেবতাদের কত দয়া।

নরবু আরো বলল, সায়েব দিন রাত খুদে রেডিওতে কি সব বলে। নরবুকে আর বাঁদরদের নাকি একসঙ্গে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। এই প্রচেষ্টাটিতে বাহাদুরের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। তবু একবার নরবুকে বলেছিল, 'সে তো খুব ভালো কথা, বাঁদরদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখতে তুই পারবি, কিন্তু ওদের আবার বাঁদরামি শেখাবার চেষ্টা করিস্ না যেন।'

বিকেলে রেজিস্টার খাতাগুলো গুছিয়ে তোলার সময় এই কথা বড় স্যারকে বলেছিল নরবু। সেকণ্ড মাস্টার কানাইবাবু আর সেলাই টিচার অনুদিও ছিলেন। সবাই শুনে অবাক। তার মানে সায়েব কোনো ক্ষমতাশালী অগ্রসরবান দেশ থেকে এসেছেন। অনুদির কি ভয়, 'স্পাইটাই নয় তো, বড়দা? বর্ডারের এত কাছে থাকি।' কানাইবাবু রাজনীতিতে বিশারদ। কাষ্ঠ হেসে বললেন,

'স্পাইয়ের খরচা করবে কেন, দিদি? ৫০ পয়সা দিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনলে, বা বিনি পয়সায় কারো রেডিও শুনলেই তো সমস্ত গূহ্য গোপনতম খবর যে-কেউ জানতে পারবে। আপনিও যেমন! ও-সব নয়।' 'তবে?'

বড় স্যার বললেন, 'আমার মতে জ্ঞান-পিপাসা ছাড়া কিছু নয়। কি বিদ্যাবুদ্ধি লক্ষ্য করেছ? বিজ্ঞানে জগদীশ বসুর চেয়ে কম নয়। কখনো কোনো ভুল করেন না। ছেলেমেয়েগুলোও না। যা একবার শিখল তো শিখল। আর ভোলা-ভুলি নেই। কিন্তু মৌলিক রচনা লিখতে পারে না,। যাতে কল্পনা দরকার তার কিছুই পারে না। খালি বিজ্ঞান!

কানাইবাবু সব জানতেন, তিনি বললেন, 'বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রচুর কাল্পনিকতার দরকার হয়, বড়দা। যত রকম গন্তব্য পথ সব ভেবে নিয়ে, একে একে পরখ করে, যেটি নির্ভুল সেটি বেছে নিতে হয়। নির্ভুলের মতো আছে কি?

বড় স্যার ইংরিজি আর সংস্কৃতে ডবল এম.-এ। বললেন, 'তা হতে পারে। কিন্তু মনে রেখো লিম্বো-সায়েব ভুল না করতে পারেন, কিন্তু ভুল সম্বন্ধে তাঁর বেজায় উৎসাহ। সে দিন যেই বললাম মেশিনে একটা ঢিলে স্ক্রু কি ঐ রকম কিছু ভুল থাকতে সাধারণ তোয়ালের বদলে ঢিলে সুতোর চমৎকার সব টার্কিশ তোয়ালে বোনা হয়েছিল। উনি একেবারে মুগ্ধ! নোট-বইতে টুকে নিলেন। তখন আমি ইংল্যাণ্ডের যুবরাজের খাস-চাকর। ভুল ভাবে ভাঁজ করে তাঁর পেণ্টেলুন ইস্ত্রি করার ফলে দু-পাশে খাঁজ না পড়ে, পড়েছিল মধ্যিখানে। যুবরাজ সেই ভুল দেখে মহাখুশি! অমনি পেণ্টেলুনটি পরা হল এবং সেই ইস্তক সামনে খাঁজ-ই চলে আসছে। লিম্বো সায়েবের উৎসাহ দেখে কে! বললেন, "বাঃ, বাঃ! আমার ইতিহাসের গোড়াতেই এই সব দেব। ঐ অধ্যায়ের নাম দেব ভুলের ফসল! কি আশ্চর্য! ভুল যে সব এত চিত্তাকর্ষক এ আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমাদের দেশে ভুল করলে জরিমানা দিতে হয়।" শুনলে কথা! আমাদের ইস্কুলে ভুল করলে জরিমানা দিতে হলে, একেকটা পরীক্ষার সময় এত টাকা উঠত যে আমাদের টিউবওয়েল্ আর লেবরেটরির জন্য ভাবতে হত না।— হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমাদের অংক স্যার তো ৬ মাসের ফেলোশিপ নিয়ে দিল্লী যাচ্ছেন, হাফ্-ইয়ারলির প্রশ্নও তৈরি করে দিয়েছেন, কিন্তু খাতা দেখবে কে?'

কানাইবাবু আর অন্নদি হেসে উঠলেন, 'কেন, লিম্বোসায়েব থাকতে ভাবনা কিসের! ওঁর তো অংকে ডক্টরেট আছে। তবে এ দেশের নয়।'

বড় স্যার গম্ভীর হলেন, 'তা বটে। অংক কিন্তু সব দেশেই এক। ওর আর

অদল-বদল নেই। মুনিঋষিদের সময়-ও যা, এখনো তাই। পৃথিবীর সব দেশেও তাই। এমন কি যদি ধ্রুবতারায় গিয়ে কেউ অংক কষতে বসে, ঐনিয়মেই কষতে হবে বোধ হয়। বাইরের দক্ষ পরীক্ষক রাখা বে-আইনীও নয়। দেখি বলে।'

বাহাদুর ততক্ষণ হাঁ করে সব কথা গিলছিল, এবার না বলে পারল না। 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, উনি নিশ্চয় রাজি হবেন। ভুল দেখলে বড্ড খুশি হন। নরবু বলছিল যেদিন ওরা সব ভুল করে, সায়েব মহা খুশি হয়ে মেশিনের দরজা খুলে মণ্ড-মেঠাই দেন।'

কানাইবাবু বিরক্ত হলেন, 'বাঁদররা কিছু ঠিক করে নাকি?' ক'রে স্যার। নরবু বলছিল সায়েব ওদের মাথায় লিক্‌টিসের তার লাগিয়ে দেন আর ওদের পড়াশুনো এগোতে থাকে। ও নাকি ১০০ অবধি গুণতে পারে। ঘরে সবাই চুপ। তারপর বড় স্যার বললেন, সাহেবকে চিঠি দিব, নিয়ে যেয়ো।'

৪

কানাইবাবুর বয়স কম, কৌতূহল বেশি। আগ্রহ চাপতে না পেরে উপযাচক হয়ে নিজেই চিঠি নিয়ে গেলেন। বাহাদুর সঙ্গে গেল। তারো কম কৌতূহল ছিল না। ইউকালিপ্টাস বনের মধ্যিখানে ছিমছাম খুদে বাড়ি। যা ভেবেছিলেন কানাইবাবু। টাইম ম্যাগাজিনে যেমন পড়েছিলেন, মনে হল সেই রকম দরজা-

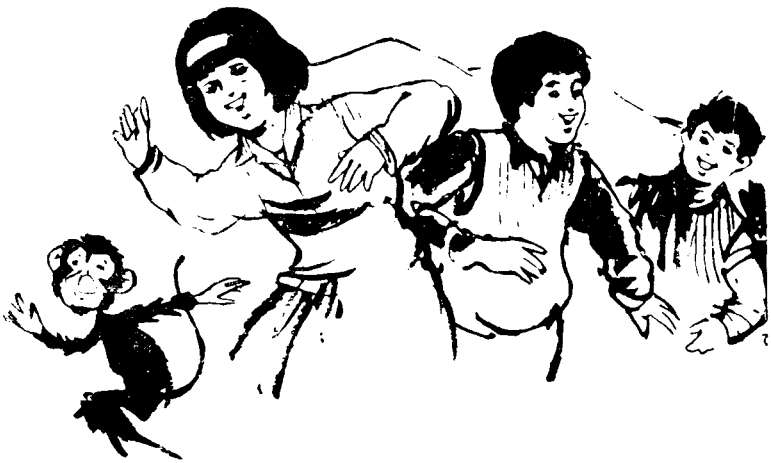

'ছেলেমেয়ে নরবু আর বাঁদরেরা আনন্দে নাচতে গাইতে লাগল'

জানলাসুদ্ধ গোটা গোটা দেয়াল, তৈরি ছাদ, সিঁড়ি, ভিৎ, সব এখানে তুলে এনে

একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এমন কি ছাদে একটা ফুলন্ত লতাগাছ পর্যন্ত উঠেছে। এত অল্প সময় লতার অত বাড়-বাড়ান্ত হয় না।

ওঁদের সাড়া পেয়ে দরজা খুলে সবাই বেরিয়ে এল। সায়েব, তাঁর নাতি-নাতনীরা, নরবু আর দুটো ছোট ছোট কালো বাঁদর। ও-রকম বাঁদর বড় একটা দেখা যায় না। নিমেষের মধ্যে বাইরে ন্যাসপাতি গাছের তলায় এলুমিনিয়ম আর প্ল্যাস্টিকের তৈরি পালকের মতো হাল্কা চেয়ার টেবিল পাতা হয়ে গেল। প্ল্যাস্টিকের গেলাসে অমৃতের মতো সরবৎ আর স্বর্গীয় সব বিস্কুট এল। ছেলেমেয়ে নরবু আর বাঁদররা আনন্দে নাচতে-গাইতে লাগল। সায়েব পকেট থেকে মুঠো-মুঠো সুগন্ধলাগা গোলাপী ফুল বের করে, ওঁদের গায়ে-মাথায় ছড়াতে লাগলেন। বাহাদুরকে জোর করে নিজের পাশে বসালেন।

বললেন, 'আমাদের দেশে এমনি করে অতিথির আদর করা হয়।' বাহাদুরকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'সব কাজের সমান দাম সেখানে, বাহাদুর, ছোট বড় সবার। সব ভালো সেখানে। খালি ঐ ভুলের জায়গা নেই।' বলে ফোঁশ করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন।

কানাইবাবু এমন সুযোগ ছাড়বেন কেন? বললেন, 'মনে হচ্ছে সেখানে ভুল নেই বলে আক্ষেপ হচ্ছে? তার কোনো দরকার নেই, মিঃ লিম্বো, আমি ভুলের মরশুমের খবর এনেছি। এই ধরুন, পড়ে দেখুন।'

চিঠি পড়ে সায়েব আহ্লাদে আটখানা। 'বাঃ বাঃ এই তো চাই। অংক কি করে ভুল হয়ে যায়। এটা আমার আরো ভাল করে জানা দরকার। আমি খুব রাজি। বললেন বড় স্যারকে।

কানাইবাবু গেলাস খালি করে বললেন, 'বড়দা আরো বলছিলেন, আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে বছরের শেষ পর্যন্ত ওপরের ক্লাসের অংকটার ভার যদি আপনি নেন। গোকুলদা তো জানুয়ারীর আগে ফিরবেন না।'

সায়েব যেন একটু ভাবিত হয়ে পড়লেন, 'তা—তা—ভেবে দেখতে পারি। আমার আসল কাজ হল ভুলের গবেষণা। তার ক্ষতি করলে চলবে না। দেশ থেকে কর্তৃপক্ষের মতটাও তো নিতে হবে। অবশ্যি তাঁদের কোন আপত্তির কারণ দেখছি না—আচ্ছা, কাল উত্তর দিলে হবে তো? খাতাপত্র দেখে দেব, সে-কথা এখনি দিলাম। আরেক গেলাস শরবৎ হক।'

কানাইবাবু উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'কেন আপত্তি করবেন তাঁরা? এই ছ-মাসে আপনার ভুলের ইতিহাসের জন্য এত তথ্য পেয়ে যাবেন যে অর্ধেক বই লেখা

হয়ে যাবে।' বিদায় দেবার সময় সায়েব বললেন, 'মনটা বেশ খুশি আছে। আপনাদের রামায়ণ-মহাভারতের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো-ও যে রকম সব সাংঘাতিক এবং—কিছু মনে করবেন না, ভাই, সত্যি কথাই হল ঠিক কথা, তাই আমার বলা অভ্যাস—এমন ইস্টুপিটের মতো ভুল করেছেন পদে পদে, যা আমাদের দেশের সবচেয়ে মুখ্যুরা করলে তাদের পাহাড় পাহাড় জরিমানা দিতে হত!'

শুনে কানাইবাবুর ভারি মজা লাগল, 'কেন, যদি ঐ সব ভুল না করতেন, তাহলে কি সীতা হরণ—হত না, নাকি কুরুক্ষেত্রের লড়াই-ই হত না?'

সায়েব বলেন, 'হবে কি করে? প্রধান চরিত্ররা তো জন্মাতেন-ই না কেউ!' কানাইবাবু হেসে বাঁচেন না। ফেরবার পথে কিন্তু দুজনার কোনো কথা নেই। নিচে পৌঁছে নদীর ওপরকার কাঠের পুল পেরুবার সময় বাহাদুর বলল, 'কামরা সব ভোঁ ভাঁ দেখলাম। একটা বর্তন, কিংবা পালং, কিংবা কুরশি নেই।' কানাইবাবু বিরক্ত হলেন, 'নেই তো অত চেয়ার টেবিল বেরুল কোত্থেকে?' দেখলাম তো আলমারি থেকে বের করল। আবার আমরা উঠে পড়লেই নরবুরা সব কিছু ঐ মেশিনের আলমারিতেই ভরে দিল। আলমারিটা দেয়াল চ্যাপ্টা হয়ে লেপ্টে রইল।

শুনে একটু বিস্মিত হলেও, কানাইবাবু বললেন, 'তবে আবার কি? খাট-পালং-ও ওরি মধ্যে থাকে।'

তখুনি বাড়ি গেলেন না কানাইবাবু। বড় স্যারের কাছে গিয়ে সায়েবের সম্মতির কথা বললেন। বড়দা বললেন, 'তবে অত গম্ভীর মুখ কেন?' 'কি জানি বড়দা, সত্যি সত্যি গুপ্তচর নয় তো? মনে হয় দারুণ বৈজ্ঞানিক। চীন কি রুশ থেকে আসে নি তো? পাহাড়ের ওপরেই তো দুটো দেশ। ভয় হয়।'

বড় স্যার বললেন, 'হতে পারে গুপ্তচর। তাতেই বা ক্ষতি কি? রুশ আমাদের বন্ধুর মতো কাজ করে সর্বদা। ওদের দেশে হয়তো কেই ভুল করলে জরিমানা দেয়। তাই এত সময় অল্প সময়ে এত অগ্রগতি করেছে। চীন অতটা পেরে উঠবে মনে হয় না। তা হক না। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের দরকার? আর যদি গুপ্তচরই চাও, তাহলে ঐ সব পাহাড়ী বসতির বিদেশী মালের ব্যবসাদারদের ধর না কেন গিয়ে! সে যাক গে। আমাদের সমস্যার সমাধান হল। ও মানুষটা কারো অনিষ্ট করতে পারে বিশ্বাস হয় না। সত্যি সত্যি বাঁদরদের লেখা-পড়া শেখাচ্ছে নাকি?'

কানাইবাবু অতটা লক্ষ্য করেননি। বললেন, 'কি জানি। অন্যদের সঙ্গে

নাচছিল গাইছিল তা তো দেখলাম। অংকে নিশ্চয় ভুল করে. তাই সায়েব এত প্রসন্ন। কি স্বর্গীয় বিস্কুট কি বলব বড়দা ?'

৫

এখন বড় স্যারকে কিছু বলাও যা, শিশিতে ভরে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়াই তাই। কাকপক্ষী জানতে পারে না। কিন্তু কানাইবাবু সেরকম ছিলেন না। লিম্বো সায়েবের বাড়ি যাবার পর থেকে মাস্টারমশাইদের টিপিন খাবার খুদে ঘরে ঐ ছাড়া আর কথাই নেই। মাঝ থেকে বাহাদুরও অনেক পেয়ালা গুড়ের চা আর ভুট্টা পোড়া নজরানা পেয়ে গেল। তবে তাকে সাবধান করে দেওয়া হল যেন কোনো বাইরের লোকের কাছে ঘুণাক্ষরেও কিছু ফাঁশ না করে, তাহলে কৌতূহলী জনতা সায়েবকে তিষ্ঠতে দেবে না। তিনিও বিরক্ত হয়ে পাততাড়ি গুটোবেন আর নরবুর, এমন সুখের চাকরিটে যাবে! তাছাড়া বড় স্যারের কানে বাহাদুরের প্রগল্‌ভতার কথা একেবার উঠলেই হয়ে গেল! এমনিতেই একজন মিনি মাগনা দক্ষ বদলি অংকের মাস্টার হাতছাড়া হয়ে গেল বলে তার মন-মেজাজ বিগড়ে থাকবে। তার ওপর এই সমস্ত শিক্ষা বিভাগের কাজে পৌঁছতেই বা কতক্ষণ? তখন শাস্তি, অশান্তি, বিক্ষোভ, বরখাস্ত! ফলে বাহাদুর প্রায় বোবা বনে গেল।

তবু কিছু কানাঘুষো হয়ে থাকবে। কারণ পাহাড়-তলির নিষ্কর্মা গোপ্পে লোক সায়েবের আশ্চর্য বাড়ি দেখতে গিয়ে, ফিরে এসে যে-সমস্ত গাঁজাখুরি গল্প প্রচার করতে লাগল, সেগুলো আসল ব্যাপারের চেয়েও শতগুণে বিস্ময়কর। কারণ তারা একবাক্যে বলল সবই ইস্কুলের নিষ্কর্মা চাকরদের বানানো কথা। ইউকালিপ্‌টাস বন আগেও যেমন ছিল, এখনো তেমনি। অর্থাৎ বাড়িটাড়ি কিছু নেই। খালি দুচারজন দূর থেকে কালো ভালুক দেখে পালিয়ে এসেছিল। ক্রমে কৌতূহলের ঢেউটাও পড়ে গেল।

নেপথ্যে এই সব যখন হচ্ছে, তখনো নরবুর সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলো নিয়মিত স্কুলে এসেছে। সায়েব তাঁর গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। একদিন এসে বলে গেলেন ইউক্লিডের জ্যামিতিতে গোটা চারেক একবারে ভুল না হলেও, ভুল বোঝা-বুঝি ধরা পড়েছে। কিন্তু সেসব মাস্টার মশাইদের বিদ্যার বাইরে বলে এ নিয়ে কোনো আলোচনা হয় নি। ইতিমধ্যে ওঁর দেশ থেকে ৬ মাস অংকের মাস্টারি করার অনুমতি এসে গেছিল। তবে ওঁদের কোনো টাকা-কড়ি নেবার নিয়ম নেই।

এসে বলে গেছিলেন, 'যে ভুলের ফসল ঘরে তুলব, তার দামই লাখটাকার বেশি।'

ক্রমে হাফ-ইয়ার্লি এসে গেল। গোকুলবাবুর তৈরি ওপরের চারটে ক্লাসের প্রশ্নপত্র দেখে সায়েব হেসেই লুটোপাটি! 'আরে এতেও যে অজস্র ভুল দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু যাই বলুন বড়দাদা, ভুলের একটা ভারি আকর্ষণীয় দিকও আছে।' বড় স্যার সংক্ষেপে বললেন, ঐ ভুলগুলো শুধরে নেবেন, মিঃ লিম্বো। ছেলেরা যেন জানতে না পারে। জানতে পারলে গোকুলবাবু ফিরে এসে ওদের আর কন্ট্রোল করতে পারবেন না। তাই বলে বেশি কঠিন প্রশ্ন দেবেন না যেন।'

সায়েব মুচকি হেসে বললেন, 'কঠিন প্রশ্ন দেওয়াটাই তো প্রথম ভুল হয়েছে। গোকুলবাবু বোধ হয় দেখতে চান ছাত্ররা কি জানে না আর আমি দেখতে চাই ওরা কি জানে সে বিষয়ে কত রকম ভুল করে। ভয় নেই, সহজ প্রশ্ন দেব।'

দিয়েওছিলেন তাই। ছেলেমেয়েরা খুশিও হয়েছিল। তাই বলে যে অজস্র ভুল করেনি তা অবিশ্যি নয়। বাহাদুর পরীক্ষার খাতা পৌঁছে দিয়ে, ফিরে এসে বলল, 'দেখে এলাম নরবু আর বাঁদররা মাথায়, লিক্টিসের তার লাগিয়ে সেবেনের অংক কষছে।' বড় স্যার চোখ পাকিয়ে কড়া গলায় বললেন, আর একটা গাঁজাখুরি কথা বলেছ তো তোমাকে কলকাতায় ট্রান্সফার করিয়ে দোব। তখন টেরটা পাবে।'

তখন বাহাদুর ওঁর পায়ে পড়ে—কাঁদাকাটি করতে লাগল, 'দোহাই স্যার, আর যাই করুন ঐটে করবেন না। ওখানে শুনেছি পথেঘাটে বড় বড় গর্ত আর রাতে যখন তখন আলো নিবে যায়। তাছাড়া ওখানে আমার শাশুড়ি আয়ার কাজ করে! আমাকে কাছে পেলে জ্যান্ত ছিঁড়ে ফেলবে, স্যার! কিন্তু আপনার কাছে বলতে কি দোষ স্যার? যত দেখি তাজ্জব বনে যাই! বাঁদর অংক ভুল করেছিল বলে সায়েব ওর ল্যাজের লোম জরিমানা করেছেন ত। দেখলাম ন্যাড়া ল্যাজ!'

বড় স্যার দু-কান হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বললেন, 'আর বলিস্‌নে বাপ! শেষটা কৌতূহল রাখতে না পেরে কোন দিন গিয়ে হাজির হব আর সায়েব রেগে-মেগে চলে যাবে। হ্যাঁরে সত্যি ভালুক আছে?

বাহাদুর কখনো ভালুক দেখেনি। সায়েবের কাছে ভালো ব্যবহারই পেয়েছে। তবু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলনা যে সায়েব নিজের থেকে কাউকে তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন নি। তাই বড় স্যার সবাইকে বারণ করে দিয়েছিলেন।

তিন দিনে সব খাতা ফেরত দিলেন। বললেন, 'পারলে সবাইকে পাস্ করিয়ে দিতাম, কিন্তু সেটা করো সাধ্যি নয়। ওরা আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে

তার সামান্য স্বীকৃতিস্বরূপ নরবুর মাথায় চাপিয়ে স্কুলের সকলের জন্যে কিছু মিষ্টি এনেছি, বড়দাদা, নিয়ে সুখী করবেন।

বলা বাহুল্য সবাই মহা আনন্দে মিষ্টি খেল। সে মিষ্টি কেউ কখনো চোখেও দেখেনি। অসম্ভব ভালো। পর দিন থেকে গরমের ছুটি শুরু। সায়েব বললেন, 'আমরা দেশে যাচ্ছি ছুটি কাটাতে। স্কুল খুলবার আগের দিন ফিরব। নরবুও যাচ্ছে, আর বাঁদররা। বাড়িটার চারদিকে দেয়াল করিয়েছি। এ দিককার লোকের বড় বেশি কৌতূহল। যদি করো কোনো অনিষ্ট হয়।'

ছুটি হয়ে গেল। যে যার যাবার জায়গায় গেলেন। কৌতূহলী দু-একজন বনে গিয়ে দেখল বাড়ির চারদিকে তিন মানুষ উঁচু স্টিলের দেওয়াল। ভেতর থেকে হিংস্র কুকুরের ডাক কানে এল।

৬

সহকর্মীদের কাছে হেডমাস্টারমশাই যতই ঔদাসীন্য দেখান না কেন, মনে মনে দুশ্চিন্তা ক্রমে দানা বাঁধতে লাগল। জ্ঞানী মানুষ, পৃথিবীর নানাক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা তাঁর অজানা ছিল না। নিজেকে বারবার বোঝালেন পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ আমেরিকা আর রুশ। তাদের দেশে অসম্ভব অকল্পনীয় প্রচেষ্টা হামেসাই সফল হচ্ছে। তার ওপর দুজনার মধ্যে তিক্ত রেষারেষি, দুজনেই নিজের সাফল্যের মান অপরের কাছে প্রকাশ করতে নারাজ। আমরা বাইরের লোক, সেরকম গুপ্তচর আমাদের নেইও। কাজেই প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রে কি হচ্ছে না হচ্ছে আমাদের জানবার কথা নয়। নিশ্চই কোনো অজ্ঞাত-উপায়ে হিমালয় ডিঙিয়ে ২-১ ঘণ্টার মধ্যে ওরা বাড়ি বানানোর তৈরি সামগ্রী এবং দক্ষ কারিগর এ-দেশে নিঃশব্দে এবং সবার অগোচরে এনে ফেলতে পেরেছে। বড় স্যার হলপ্ করে বলতে পারতেন যে ঐ তিন মানুষ উঁচু স্টিলের দেয়াল একদিনে তৈরি হয়েছিল। এবং তার পেছনে যখন হৌ-হৌ করে হিংস্র বিদেশী কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে, তখন পাহারাদার-ও নিশ্চয় আছে

সত্যিই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবার জন্য কাউকে না বলে, এক দিন ভোরে উঠে ইউকালিপ্টাস বনে তিনি গেছিলেন। মনে বড়ই উদ্বেগ নিয়ে ফিরেও এসেছিলেন। তবে সায়েব যে অতিশয় সৎ লোক, এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। সৎ লোকেরা ভুল করতে পারে, কিন্তু অন্যায় অসৎ কাজ করে না। তাছাড়া মিঃ লিম্বো কখনো ভুল-ও করেন না। গোপনে স্বীকার করেও গেছেন যে,

ভুলের ইতিহাস লিখছেন, অথচ ভুলের অভিজ্ঞতা নেই, এটাও একটা মহাভুল। এবং অন্য সব ভুলের মতো এ ভুল-ও শুধরোতে হবে, নইলে জরিমানা।

এত সব চিন্তা করে অনেকখানি মানসিক শান্তি নিয়েই সামান্য কিছু লগেজ্ আর গিন্নিকে নিয়ে এক মাসের জন্য কাশী গেলেন। সেখানে তাঁর বুড়ো মা-বাবা থাকতেন, না গেলে তাঁরা বড় দুঃখ পাবেন। তাছাড়া গিন্নি বেজায় গোপ্পে এবং সব জিনিসে নাক গলাবার চেষ্টা। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে মাস খানেকের জন্য এখান থেকে সরানো দরকার। আরেক দুশ্চিন্তা ছিল বাহাদুর। সুখের বিষয় ঠিক এই সময়ে দারজিলিংএর কোন গাঁয়ে তার দাদামশায়ের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যাওয়াতে, সে নিজের থেকেই দিয়ে চলে গেল।

চা-বাগানের লাগোয়া দাদামশায়ের চা-বিস্কুটের দোকান খুব জমজমা। গিন্নিকে সেখানে বসিয়ে দিয়ে, তার ফিরে আসার ইচ্ছা। আপাততঃ তিন মাসের ছুটি চায়। ছুটি মঞ্জুর হল। বাহাদুর তার গুদামে তালা দিয়ে রওনা হয়ে গেল। বড় স্যার হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বাহাদুর-ও বড় গোপ্পে আর নরবুর খবর নেবার অছিলায় ঘন ঘন সায়েবের বাড়ি যাবার চেষ্টা করে। সায়েবকে চটাবার বড়দার একটুও ইচ্ছা নেই।

আসলে অত ভাববার কিছু ছিল না। গরমের ছুটিটা নির্বিঘ্নে কেটে গেছিল। ঘটনার মধ্যে বাংলার টিচার বিজয়াদির সঙ্গে মুগা ফ্যাক্টরির নবীন তরফদারের বিয়ে ঠিক হল। পাহাড়তলিতে দুজনের বিয়ে মানে সকলের বিয়ে। সকলের সমান উৎসাহ। যেদিন স্কুল খুলল, বিজয়াদি একটা নতুন শাড়ি পরে গলায় একটা সরু হার পরে স্কুলে এলেন। এসেই বড় স্যারকে বললেন, 'আমি কিন্তু চাকরি ছাড়ব না, বড়দা।'

মনের খুশিতে বড় স্যার সব মাস্টারমশাই আর—দিদিমণিদের ক্যান্টিন থেকে চা জিলিপি শিঙাড়া খাইয়ে দিলেন। টিপিনের ছুটিতে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, তারি মধ্যে মস্ত এক জোড়া অপূর্ব বিস্কুট নিয়ে মিঃ লিম্বো ঘরে ঢুকে বললেন, 'আশা করি আমিও যোগ দিতে পারি? আমিও তো এখন আপনাদের একজন।' তাঁর সমস্ত শরীর থেকে এমন একটা প্রসন্ন গাম্ভীর্য ঝরে পড়তে লাগল যে সকলে মহা-খুশি হল! বিজয়াদির বিয়ের কথা শুনে সায়েব গলে গেলেন! 'বাঃ, কি ভালো! আমার ভুলের গবেষণার কত মালমশলা পাব!' বিজয়াদি তো' থ!

বিকেলের দিকে বাহাদুর এসে তার গুদোম খুলল। ছুটি তার ভালো লাগছে না। গিন্নি বড় টিকটিক করে। সায়েব হাসিমুখে বললেন, 'বিকেলে আমার বাড়ি

যেও তোমার জন্যে কি সব এসেছে। নাতিনাতনীরা কাল থেকে স্কুল করবে, বড়-দাদা, আপনার কোনো আপত্তি নেই তো।'

বড়-স্যার বললেন, 'আপত্তি হবে কেন? আজ তো পড়াই হচ্ছে না। নতুন রুটিনটা গুছিয়ে নেওয়া যাক। সায়েব বাহাদুরের ওপর বিরক্ত নয় দেখে বড়-স্যার নিশ্চিন্ত। লিম্বো সায়েব বলেছিলেন, 'পাঁচিলটা কাটিয়ে দিলাম বড়দাদা। পাঁচিল থাকলে লোকে ভাবতে পারে, আমি চাইনা কেউ আমাদের বাড়িতে যায়। বড়-স্যার বলেছিলেন, 'সব ঠিক ছিল তো? 'বাঃ, তা থাকবে না! চারদিকে তিন মানুষ দেয়াল।' ভয়ানক কৌতূহল হলেও বড়-স্যার নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। সেদিন মনে হয়েছিল, চারদিকে দেয়াল, তাতে গেট-ফটক নেই। অথচ ভেতরে কুকুর!

সদা সর্বদার মতো গোড়ায় ছেলেমেয়েদের পড়ায় তেমন মন বসছিল না। ছুটির মেজাজটা ঝেড়ে ফেলতে দিন দশেক লাগে। তারপর সব স্বাভাবিক হয়ে এলে মাস্টার মশাইরা একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন। একা দোকা তেকা চোকা যেন একটু বদলেছে। পড়ায় যে ভুল করছে তা নয়। ওরা বোধ হয় পড়ায় ভুল করতেই জানে না। কিন্তু একটু যেন অমনোযোগী, কুঁড়ে, আড্ডা দেবার ইচ্ছেটা একটু বেশি। রোজ ঘণ্টা পড়লে সায়েব যখন ক্লাস সেবেনের দরজায় এসে দাঁড়ান, ওঁকে দেখেই ওদের মুখ হাঁড়ি হয়।

কানাইবাবু ওদের ক্লাস-টিচার। ব্যাপারটা আঁচ করে তিনি বললেন, 'ওদের নিশ্চয় খেলার মাঠে যেতে ইচ্ছে করে, স্যার। তা যাক না। আমার সঙ্গে যাবে আর আমার সঙ্গে আসবে। ক্ষতি কি?' সায়েব যেন একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কানাইবাবু বললেন, 'আপনিও ঐ ইতিহাস লিখবার সময় পাবেন। ভালো কথা স্যার, ছেলেরা বলছিল ওদের পকেটে নাকি খুদে খুদে রেডিওর মতো খেলনা থাকে, কি ব্যাপার বলুন তো?'

সায়েব হেসে ওদের ডাকলেন, 'কই, দেখাও না কানাইদাদাকে ওগুলো।' ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। সায়েবের মুখে এই প্রথম রাগ দেখা গেল। 'কি করেছ? হারিয়ে ফেলনি তো?' 'না, না দাদু, বন্ধুরা দেখতে নিয়েছে এক্ষুনি দিয়ে দেবে।' কানাইবাবু ডাক দিতেই দিয়েও গেল ছেলেরা। ততক্ষণে সায়েবের মুখে আবার হাসি দেখা দিয়েছে। 'আচ্ছা, ওগুলো বুক পকেটে রেখে বোতাম এঁটে খেলতে যাও। দেরি কর না।' সায়েব বড় বড় পা ফেলে রওনা দিলেন।

৭

তখনকার মতো ব্যাপারটা মিটে গেলেও, খেলার পর বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় পাহাড়ের পথে পা দিয়েই, কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ওগুলো?' ওরা, এ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘুঁটি। ওগুলো দিয়ে ভালো লেখাপড়া হয়। আমাদের দেশে সবাইকে রাখতে হয়। কাউকে দেওয়া বারণ।' আর কিছু বললেন না কানাইবাবু। বলবার সাহস হল না। পরে বড় স্যারকে বললেন।

'মেমরি-এডের কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র কি না কে জানে।' বড় স্যার বললেন, 'তোমাদের মগজে ইলেক্‌ট্রনিক ঢুকেছে! কিছু না, স্রেফ ওদের আইডেন্টিটি ডিস্ক। সব নাগরিককেই রাখতে হয়। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কর না। ওদের মেলা শত্রু। নানারকম সতর্কতার ব্যবস্থা করতে হয়। কতদূর এগিয়েছে, এই থেকেই বুঝতে পারছ যে মাথায় তার লাগিয়ে পড়াশুনা করছে নরবু আর বাঁদররা।'

কানাইবাবু কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'আমরা তো গজাল দিয়েও কিছু ঢোকাতে পারিনি!'

কিন্তু নাতিনাতনীরা ক্রমে আরো বদলাল। আগে ছিল বোবা, এখন মুখোমুখি জবাব দেওয়া ধরল। পড়শুনোয় ভুল না করলেও, বেশ দুষ্টু হয়ে উঠতে লাগল। মণিকা সর্বদা সেলাইতে প্রথম হয়। পুজোর ছুটির আগে ছেলেমেয়েদের হাতের কাজের প্রদর্শনী হয়। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। তা প্রদর্শনী খোলার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখা গেল মণিকার কাটিহারি কাজের খুঞ্চিপোষটাই নেই। নেই তো নেই—সে আর পাওয়াই গেল না। মণিকা কেঁদেকেটে একাকার করল। সেলাই দিদিমণি সে বছর পুরস্কার বন্ধ বলে ঘোষণা করলেন। মুখচোখ লাল করে সভার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে মিঃ লিম্বো বলে বসলেন, সারা বছর ভালো কাজ করার জন্য মণিকাকে উনি ব্যক্তিগতভাবে একটি পদক দিতে চান। অন্য লোকের অন্যায় কাজের জন্য যোগ্য প্রাপককে পুরস্কার না দেওয়া ভুল। মুন্‌সেফ সায়েব সভাপতিত্ব করছিলেন। তিনি আনন্দে হাততালি দিলেন। পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য সুন্দর একটা রূপোলী পদক বের করেও দিলেন মিঃ লিম্বো। ঐ সভায় সেইটি মণিকাকে দেওয়া হল। পরে সায়েব ওর নাম তারিখ ইত্যাদি খোদাই করিয়ে দিলেন। পদকের অন্য দিকে বাজ পাখির মতো এক পাখির নক্‌সা, তার চোখ দুটি লাল মণির। সভাসুদ্ধ সবাই হাঁ!

পাঁপড় জ্যাম জেলি আচার মোরব্বা আমসত্ত্ব করেছিল রান্নার ক্লাসের মেয়েরা। তার মধ্যে থেকে দু-শিশি ঝাল তেলের আচার উধাও। যে কারণেই হক, সবাই

এ-সবের জন্য সায়েবের নাতি-নাতনীদের সন্দেহ করতে লাগল। সায়েব সেটা আঁচ করতে পেরে ভারি দুঃখিত। সন্ধ্যায় নাটক ছিল, তাতে ওদের পার্টি ছিল। নইলে হয়তো ওদের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিতেন। ওঁর জন্যে সকলের সহানুভূতি। ছেলেমানুষরা যদি নিয়েই থাকে মুখরোচক জিনিস, তার বিশগুণ দামের মিষ্টি খাইয়েছিলেন সায়েব স্কুলের সব ছেলেমেয়ে ও মাস্টারদের।

সেদিন সায়েবকে বড়ই বিমর্ষ মনে হয়েছিল। সে বছর পূজোর ছুটি দেরিতে পড়েছিল। স্কুল খুলবার অল্প দিন পরেই বার্ষিক পরীক্ষা। পূজোয় ওদের কুড়ি দিন বন্ধ থাকত। চমৎকার সময়। বর্ষা থেমে গেছে। শীত জানান দিচ্ছে। বড় বড় পেয়ারা ন্যাসপাতি পাকে। দরকার না থাকলে এ ছুটিতে কেউ কোথাও যায় না। বরং চেঞ্জাররা আসে। মিঃ লিম্বোও কোথাও যাবেন না; গবেষণার বইটা আশানুরূপ এগোচ্ছে না। রাশি রাশি তথ্য জমে গেছে। সেগুলো গুছিয়ে লিখে ফেলতে হবে। দেশ থেকে জনাদুই বন্ধুও আসার কথা। পণ্ডিত মানুষ তাঁরা, গবেষণা সম্বন্ধে তাঁদেরও ভারী উৎসাহ। তাছাড়া একটা সমস্যাও উঠেছে। বড় স্যারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়।

বড় স্যারও শুনতে উদ্‌গ্রীব। সায়েব বললেন, ওঁদের দেশে সবাই নিরামিষাশী। ডিমটাকে অবিশ্যি ওঁরা নিরামিষ-ই বলেন। কিন্তু এখানে এসে অবধি ছেলে-মেয়েগুলো মাছ-মাংস খাবার জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। খায়-ও সম্ভবতঃ। হয় তো বাঁদরদের আর নরবুর সাহায্য নেয়। শুনে বড় স্যারের মুখটা শক্ত হয়ে উঠল, 'বিদায় করে দিন ওকে! ভারি নিমক হারাম দেখলেন!'

সায়েব বললেন, 'না, না, ও কথা বলবেন না। ও আমার ভুলের গিনিপিগ! পৃথিবীর তিন-চারটে দেশ ঘুরে যত তথ্য পেয়েছি, একা ওর কাছে তার ডবল পাই! ও যদি ভুল না করত, ওর মধ্যে আমার কোনো ইন্টারেস্ট-ই থাকত না। কি করি বলুন এবার। নরবুকে বাদ দিন। বড় স্যারের ক্ষুরের মতো বুদ্ধি। তিনি বললেন, 'যাঁরা সম্যক্ উপলব্ধি করেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবেন। অর্থাৎ বন্ধুরা আসছেন, তাঁদের বুদ্ধিটা নেবেন। আমার মা বাবা-ও নিরামিষ খান ও বাড়িতে আমিষ ঢুকতে দেন না। আমি তাঁদের বাড়িতে দু-দিনের বেশি টিকতে পারি না। লুকিয়ে বারাণসী হিন্দু হোটেলে গিয়ে ভালোমন্দ খেয়ে আসি। এ-ক্ষেত্রে আমি আবার কি পরামর্শ দেব। তাছাড়া আপনিই না বলেছিলেন নাতি-নাতনীদের নিয়েও কি গবেষণা করছেন? এ তো তারি একটা প্রতিপাদ্য বিষয়।'

যে যাই হোক সাহেবের সঙ্গে বড়দাদার ভারী একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছিল। ওঁর পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বড়দা বললেন, 'তেমন কি অন্যায় করেছে ব্রাদার, মাছ-মাংস কি মন্দ জিনিস? পুষ্টিকর। না খেয়ে ফেললে মাছের ভিড়ে নদীতে নৌকো চলত না, হরিণের দল সব ফসল খেয়ে নিত। বরং নিজেই একটু ভুলের এক্সপেরিমেন্ট করে একটু খেয়ে দেখতে পারেন।'

বলে খুব হেসেছিলেন বড় দাদা। কিন্তু ফল হল উল্টো। দু-কানে হাত চেপে লাফিয়ে উঠে লিম্বো বললেন, সেইটেই তো সবচেয়ে বড় ভয়, বড়দাদা ভুলের গবেষণায় নিজে পরীক্ষক না হয়ে গিনিপিগ না হয়ে পড়ি। বন্ধুরা এলে কিছু জোর পাব।' এই বলে সায়েব ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

এর মধ্যে ছুটি শুরু হয়ে গেল। নরবুর পাড়া বেড়ানো সায়েব বড়দার পরামর্শে বন্ধ করেছিলেন। বাহাদুর প্রতি শনিবার খবর নিয়ে আসত। সায়েব তাকে খুবই ভালোবাসতেন। ছুটির প্রথম শনিবার বাহাদুর ফিরে এসে বড়দাদার বিকেলের বাসে আসা বড় মাগুর মাছ পৌঁছে দিয়ে বলে যে, লিম্বো সায়েবের দুই বন্ধু এসেছেন। ওঁর-ই মতো দেখতে, ঐ রকমই কালো গলাবন্ধ কোট পরা, ঐ রকম-ই নরম-শরম ব্যবহার, ঐ রকমই ভালো বাংলা বলেন। তবে নিজেদের মধ্যে বিদেশী ভাষায় কথা বলছিলেন। বাহাদুরকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে এখানকার লোকদের খাওয়া-দাওয়া আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

৮

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে বড়দাদা ভারি আশ্চর্য হলেন। একদিন কানাইবাবু বলেছিলেন স্থানীয় চাষীদের, দোকানদারদের, কারিগরদের সঙ্গে সায়েবের ভারি খাতির। উনি নাকি তাদের কাজকর্ম বিষয়ে যে পরামর্শ দিতেন তার অব্যর্থ ভালো ফল হত। তারা ওঁকে গুরুঠাকুরের মতো ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিল। তাতে সায়েব খুশি হতেন না। বলতেন—'আরে পাশে বস! আমরা সবাই সমান!' রুশ তো। ওদের ঐরকম উদার মতামত থাকাই স্বাভাবিক। অদ্ভুত কারিগর নাকি সায়েব। চমৎকার সব নক্সা করে দিয়েছেন। কবে কোন ফসল কি ভাবে লাগাতে হবে, তাতে কোনো ভুল হয় না।

পূজোর ক-দিন শহরে মহা উৎসব লাগে। লিম্বো সায়েব নরবুর সঙ্গে বন্ধুদের আর নাতি-নাতনী নিয়ে পূজো দেখে গেলেন। প্রসাদ নিয়ে গেলেন। নরবু

বলাতে কপালে প্রসাদ ঠেকিয়ে হাসতে হাসতে খেতে খেতে পাহাড়ে চড়লেন ওঁরা। বাহাদুরকে বড়দাদা বললেন, 'দুটো তো ঘর বললে, তাহলে গণ্যমান্য অতিথিরা শোবে, কোথায়?' বাহাদুর বলল, 'ও নতুন প্যাটাঙের বাড়ি স্যার, পাশ দিয়ে টানলে আরেকটা ঘর বেরোয়।' বড় স্যার হেসে বললেন, 'আর আলমারি খুললেই খাট-পালং কুরশি-কেদারা?' বাহাদুর বলল, 'ঠিক তাই।'

তারপর গম্ভীর মুখে চৌকাঠের ওপর বসে পড়ল, 'বড়দিনের ছুটিতে ওঁরা সবাই চলে যাবেন' ওঁদের এক বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। বন্ধুরা এখুনি চলে যাবেন। তখন আবার আসবেন। ওঁরা নরবুকে নিয়ে যেতে চান।

'ভালোই তো। রেখে গেলে ঐ নরবুকে নিয়ে তোমার কষ্ট পেতে হবে। ঘড়ি চুরির কথা মনে আছে? পুলিশের খাতায় ওর নাম লেখা আছে। সায়েব ওকে বোঝেন, লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, নিয়ে গেলে ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে। ও যেতে চায় না? খুব চায়!'

বাহাদুর তবু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল, তার গাঁয়ের লোকরা বলবে মা-বাপ-মরা ছেলেটার জন্য পাছে টাকা খরচ করতে হয়, পাছে সে তার দাদামশায়ের অর্থাৎ বাহাদুরের বাপের সম্পত্তি পায়, এই কারণে মামা তাকে বিদেশে পাচার করে দিল।

বড় স্যার বিরক্ত হলেন, 'কবে কি করেছে তার জন্যে গাঁয়ের লোকেরা শুনি? আর তোমার বাবা কি বিশাল সম্পত্তি রেখে গেছে? বাহাদুর মাথা চুলকোতে লাগল, 'ইয়ে মানে-কিছুই রেখে যায়নি বাবা, কতকগুলো ধারধোর ছাড়া। শেষ বয়সটা তো আমার কাছেই কেটেছিল। সে এক দিন গেছে, স্যার। কিন্তু সম্পত্তি থাকলে তো ঐ রকম বলত। তাহলে যেতে দিই কি করে? যেমন করে হয় চলে যাবে।'

বড় স্যার বিরক্ত হয়ে ওকে বিদায় দিলেন। আসলে সায়েব চলে যাবে শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেছিল আর মেজাজ খিচড়ে ছিল। সায়েব একবার গেলে আর যে দেখা হবে না সেটা বড়দাদা ভালো করেই জানতেন। সারা জীবনে এমন আরেকটা মানুষ দেখেননি। কি বিদ্যেবুদ্ধি! বাঙালীর মতো বাংলা বলেন! রামায়ণ মহাভারত নখাগ্রে। সংস্কৃতও জানেন। ওদিকে কি সাংঘাতিক অংকের মাথা! কি স্মৃতিশক্তি! একবার যা শোনেন বা পড়েন, কখনো ভোলেন না! এর ওপর এমন নিরহংকার অমায়িক উদার মানুষ আমাদের দেশে তো নেই-ই, আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

ছুটির মধ্যে সায়েবের সঙ্গে দেখা হল না। দেখতে দেখতে ছুটিও ফুরিয়ে এল।

নরবু একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত। সায়েবের বন্ধুরা চলে যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে এখানকার ছোট ছোট মিষ্টি কমলালেবু দেওয়া হবে। সবে কমলা লেবু উঠছে, নরবু গাঁয়ের কোন হাট থেকে যোগাড় করে নিয়ে গেল। একবার বড় স্যারের সঙ্গে দেখাও করে গেল। নরবুর চটপট কথাবার্তা আর পরিষ্কার হাসিখুশি চেহারা দেখে বড়দাদা অবাক্! এ যেন সে নরবুই নয়। মাথায় তার লাগান আর যাই করুন, সায়েবের লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলে মানুষ করার নিয়মটি বড় ভালো।

স্কুল খুললেই বার্ষিক পরীক্ষার তাড়া পড়ে যায়। মিঃ লিম্বো ছুটির মধ্যে চমৎকার সব প্রশ্নপত্র তৈরি করে রেখেছিলেন। বড় স্যার দেখে বড় খুশি হলেন। যেন পরীক্ষার প্রশ্ন নয়, পূজা বার্ষিকীর জন্য খাসা সব বুদ্ধির ধাঁধা। টিফিনের সময় স্যারের ঘরে এসে সায়েব অনেক গল্প করলেন। ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার পরেই তাদের মা-বাবার কাছে ফিরে যাবে। এখানকার নিয়মে লেখাপড়া শেখার এক্স-পেরিমেণ্টটা সফল হয়েছে। তবে বন্ধুরা বলেছেন এদিকে আর বেশি দিন থাকলে দেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। শেষটা দুষ্কৃতকারী বলে দুর্নাম হয়ে যাবে। ওঁদের দেশে দুষ্কৃতকারী হলে চলে না। শুনে বড় স্যার অবাক হলেন। ইয়োরোপে না গিয়ে থাকতে পারেন এবং রুশ সত্যিই অভাবনীয় অগ্রগতি করে থাকতে পারে, কিন্তু মানবচরিত্র সব জায়গায় এক। ওদের দেশে দুষ্কৃতকারী নেই, এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। তবে বন্ধুর মুখের ওপর কিছু বললেন না। দেশপ্রেম বড় ভালো জিনিস। আমাদের আরেকটু থাকলে ভালো হত।

একটু ঠাট্টা করে বললেন, 'ভুলের খাতা শেষ করতে তো ঢের বাকি। রাজ-নীতির ক্ষেত্র তো আরম্ভও করেননি, আর আমাদের এই খুদে শহরে কতটুকুই বা মাল-মশলা পেতে পারেন। আরো গবেষণা দরকার। ভুলের ইতিহাসে ভুল থাকলে চলবে কেন?'

সায়েব চমকে উঠে একটু বিষণ্ণভাবে বললেন, 'কিছুই দেখা হল না; কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও হল না; ভুলকারীর মনের প্রতিক্রিয়া জানা গেল না; খালি বাইরে থেকে তার বিকাশ দেখলাম। ভুল যে এত মোহময় তাও ভাবিনি! উঠি।' এই বলে যেন উঠে পালিয়ে গেলেন, পাছে বেশি কিছু বলে ফেলেন। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়মমতো চলতে লাগল। এই একটা সময় ছেলেমেয়েরা মন দিয়ে পড়ে। কানাইবাবু বলে গেলেন, 'সবাই পড়ে, বাদে একা দোকা তেকা চোকা! ওরা কেমন বেপরোয়া হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে ক্লাস পালানো ধরেছে।

জ্ঞানবাবুদের বাড়িতে গিয়ে ন্যাসপাতি চুরি করে খেয়েছে। পালাবার সময় কাঁচকলা দেখিয়েছে!'

বড় স্যার শিউরে উঠে বললেন, 'থাক, এ-কথা সায়েবকে জানিয়ে কাজ নেই। পরীক্ষার পরেই ওরা দেশে ফিরে যাচ্ছে, পাশ না করলেও ক্ষতি নেই।' কানাইবাবু বললেন, 'পাশ ঠিকই করবে। তবে একেবারে গোল্লায় না যায়।' বড় স্যার বললেন, 'তার সময় পাবে না। ওদের দেশে ও-সব সুযোগের ক্ষেত্রই নেই।' উত্তর শুনে কানাইবাবু অবাক্!—

৯

পরীক্ষা যতই কাছে আসতে লাগল, বড় স্যারের মন ততই ভারী হতে লাগল আর মিঃ লিম্বোর ফূর্তি ততই বাড়তে লাগল। বড়দাদার মনে হচ্ছিল হয়তো এক বছর বাদে দেশে ফিরবার আনন্দে। কিন্তু যে দিন সায়েব পরীক্ষার খাতা নিতে ওঁর ঘরে এলেন, সায়েব ওঁর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'চিয়ার আপ! বড়-দাদা, এমন কোনো সমস্যা বা হতাশা নেই, যার থেকে বেরোবারো পথ নেই! এই খাতাগুলোর প্রত্যেকটা ভুল অংকের একটা করে ঠিক উত্তর আছে। চলে যাবার কথা ভেবে আমারও মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এখন মন ঠিক করে ফেলেছি, আর দুঃখ নেই।'

বড় স্যার বললেন, 'তা বটে। মন ঠিক করে ফেলা ছাড়া আর উপায় কি? নরবুও যাচ্ছে নাকি? ওর মামার তো বেজায় আপত্তি।' সায়েব বললেন, 'ভুল মস্ত ভুল করছে। ঐখানেই তো আপনাদের দেশের মাধুর্য। নানারকম ভুলে ভরা। একটা চেষ্টা তো দেওয়া যাবে। আমাদের ওখানে চেষ্টা দেওয়া মানেই সফল হওয়া। কিন্তু এখানে দুই দুই যোগ করে সব সময় চার হয় না।' হাসতে হাসতে চলে গেলেন সায়েব।

দেখতে দেখতে পরীক্ষার ফলও বেরুল। অন্যান্য বছরের মতো দু-একজন ছাড়া ক্লাসসুদ্ধ, ওপরের ক্লাসে উঠল। সেই দু-একজনের মাথায় হাত বুলিয়ে মিঃ লিম্বো হাতে টফির প্যাকেট গুঁজে দিলেন। কানাইবাবুকে বললেন, 'ঐ দু-একজনের অংকের খাতা মহাকাব্যের মতো। কাল্পনিকতার শেষ নেই!'

বড়দিনের ছুটির আগের দিন পুরস্কার বিতরণ হল। দুঃখের বিষয় সেদিন বড় স্যারের সর্দি আর ১০৩° জ্বর। তাঁকে বাদ দিয়েই সব হল। এখানে এ-সব ব্যাপার দুপুরে হত। যাতে দূর থেকে যারা আসত, তাদের ফিরতে দেরি না হয়।

তিনটের সময় স্কুল থেকে সবাইকে লুচি আলুর দম, রসগোল্লা, কমলালেবু খাওয়ানো হল। তারপর ঘরদোরে তালা পড়ল, পনেরো দিনের ছুটি শুরু হল।

পরের দিন, আরেকটু সন্ধ্যা হলেই গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। পাহাড়তলির ব্যবসাদার আর চাষীরা এতক্ষণে মিঃ লিম্বোর চলে যাবার খবর পেল। পুরস্কার বিতরণ সভায় তাঁকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানানো হয়েছিল আর তিনি কেঁদেটেঁদে একাকার করেছিলেন। তাঁর বন্ধুরা দুদিন আগে আবার এসেছিলেন। তাঁরা খুব বিরক্ত। বোধ হয় প্রকাশ্যে মনের দুর্বলতা দেখানো ভুল বলেই হবে। নাতিনাতনীগুলো কিন্তু মহাখুশি! মিছিমিছি দুঃখ পাবার মতো ভুল তারা করত না।

স্কুল-বন্ধের দিনটি সবাই কেমন স্বার্থপর হয়ে পড়ে। বড়দিনের বন্ধে অনেকে পাহাড়তলি ছেড়ে দিন আট-দশের জন্য কি কলকাতায় কি সমুদ্রের ধার থেকে ঘুরে আসে। খুদে শহর ভারী নিরিবিলি হয়ে পড়ে। অন্যান্য বছর এ সময়টা বড়দাদা ভারী উপভোগ করেন। ছেলে-বৌ কলকাতায় থাকে, তাদের মা কোনো সঙ্গী পাকড়ে সেইখানে যান। চিড়িয়াখানা, সিনেমা, সার্কাস, জাদুঘর, কালিঘাট করে ফিরে আসেন। এ বছর-ও তাই গেছেন দু-দিন আগেই। জ্বর-গায়ে বড় স্যার একা শুয়ে, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। কেবলি মনে হচ্ছে দূরে কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ও-সব মনের দুর্বলতা ভেবে, খাটের পাশে টেবিলে রাখা পেতলের ঘন্টি বাজিয়ে বামুন-ঠাকুরকে ডেকে হর্লিক্স ফরমায়েস করলেন। সেটি খেয়ে মনের অহেতুক দুশ্চিন্তা খানিকটা দূরও করলেন, ফলে একটু ঘুমিয়েও পড়লেন।

ইউকালিপ্টাস বনে ঠিক সেই সময়ে কি হচ্ছিল যদি জানতে পারতেন, তাহলে বড়দা আর অত আরামে ঘুমিয়ে পড়তে পারতেন না। হর্লিক্সের গেলাস নিয়ে যাবার সময় বামুন ঠাকুর লক্ষ্য করেছিল বাবু চোখ বুজে শুয়ে আছেন। তবু সে একবার বলেছিল বটে, 'পাড়া খালি করে সব সায়েবের বাড়ি গেছে। ওঁকে নাকি ওরা যেতে দেবে না। বাহাদুরও ওদের মধ্যে গেছে নরবুকে ধরে আনতে। ব্যবসায়ীরা, চাষীরা লাঠি সোঁটা নিয়ে গেছে জোর ফলাবার যদি দরকার হয়।'

এত কথা বড়দাদার কানে গেলে উনি নিশ্চয় লাফিয়ে উঠতেন, কিন্তু রাজ্যের ক্লান্তি ওঁকে পেয়ে বসেছিল। বামুন-ঠাকুরের একটা কথাও কানে যায়নি। বামুন-ঠাকুরও কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে, শেষটা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে, তার বুড়ি পিসীকে

বলেছিল, 'তুমি একটু দরজার দিকে খেয়াল রাখ, আমি এই এলাম বলে।' এই বলে গায়ে আলোয়ানটা জড়িয়ে সে-ও ইউকালিপ্টাস বনের দিকে ছুটল। ভাবল দূর থেকে একবার দেখে আসবে, গণ্ডগোল তার ধাতে সয় না।

ভাগ্যিস্ গেছিল, তাই এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সুযোগ পেল। ততক্ষণে রাত হয়ে এসেছে। মশাল হাতে পাহাড়তলির মানুষরা সায়েবকে অনেক অনুনয়-বিনয় পেড়াপিড়ি করে, তখন গরম হয়ে উঠেছে। বাহাদুরকে দেখেই তার ভাগ্নে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। জনতা বাড়িটাকে ঘেরাও করবার আগেই সায়েব ও তাঁর বন্ধুরাও ঘরে ঢুকে দোর দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে করতে সবার আগে যারা ছিল তারা দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু দরজাটা বেমালুম দেওয়ালের সঙ্গে মিলিয়ে গেছিল। বাহাদুর চ্যাঁচাতে লাগল, 'পেছনেও দরজা আছে, সেদিকে চল।' গিয়ে দেখল সে দরজাও নেই। তখন ভিড়ের লোক রেগে গিয়ে হাতের মশাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাড়ির গায়ে ফেলতে লাগল! এক মুহূর্তের জন্য সব জানালা খুলে গেল। একা দোকা তেকা চোকা নরবু আর বাঁদর দুটোকে দেখা গেল। তারা হাসতে হাসতে ছোট ছোট গোলাপী ফুল ছুঁড়ে দিতে লাগল। তার পরের মুহূর্তেই সমস্ত বাড়িটা একবার কেঁপে উঠল। চারদিক চাঁদের আলোর মতো আলো হয়ে গেল। চোখ রগড়ে সবাই চেয়ে দেখল কোথায় বাড়ি! কোথায় কি? সব ভোঁ ভাঁ। ওরা ইউকালিপটাস বনের গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে নিবন্ত মশাল থেকে ধোঁয়া উঠছে!

মেয়েরা আর ছোটরা কেঁদে উঠল-'ফিরে এসো, ফিসে এসো, দয়া করে এসো! আর জোরজার করব না। আমাদের অসুখে কে ওষুধ দেবে, ব্যবসায়ে কে বুদ্ধি দেবে! কি বাজে বকছে সব, কোথাও কিছু নেই।

কারো মুখে কোনো কথাও নেই! এমন যে হতে পারে তা কে ভেবেছিল! খালি বাহাদুর চোখ মুছে বলল, 'এই ভালো। নরবুকে কি আর মানুষ করার সাধ্য ছিল আমার! পড়াশুনোয় বাঁদর দুটোর চেয়ে ভালো ছিলো গো!' তারপর সবাই দলে দলে নিচে নেমে এল। কি আশ্চর্য বাড়িটা এতটুকু দাগ-ও রেখে যায় নি।

কানাইবাবু, বাহাদুর, আরো কয়েকজন বড়-স্যারের বাড়ি এসে এই অলৌকিক ব্যাপারের নিখুঁৎ বর্ণনা দিয়ে গেল। তাঁর জ্বর ছেড়ে গেছিল, আলোয়ান জড়িয়ে জানলার ধারে বসে ছিলেন। সব শুনে একবার বললেন, 'অলৌকিক হবে কেন? বিজ্ঞানের অগ্রগতির কি শেষ আছে? দিল্লীর মাঠের খেলা যদি এইখানে বসে স্বচক্ষে

দেখা যায় ; ফেরিওলার হাঁক শোনা যায়, তাহলে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসরবান দেশের লোকেরা এটুকু পারবে না ?'

ওরা চলে গেলেও, বড়দাদা ঐখানেই বসে রইলেন।

১০

আরো অনেক রাতে জানালার বাইরের দিকে চাঁদের আলোয় একজন এসে দাঁড়াল। বড় স্যার বললেন, 'দরজা খোলাই আছে, ভিতরে এসে আমার কাছে বস, লিম্বো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

লিম্বো ঘরে এসে তাঁর হাত ধরে বললেন, 'বড়দা, আপনি কি টের পেয়েছিলেন রুশ থেকে আমরা আসিনি ? আমাদের দেশ ধ্রুবতারার ওপারে। দূরকে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা জয় করেছে, কিন্তু সুখী হতে পারিনি আমরা। যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি সব-ই হয়, চমক লাগার জায়গা নেই। এখানে এসে তবে আমি অবাক্ হতে শিখলাম। আপনার কৌটো থেকে একটা পান খাব, বড়দা ? এ সব জিনিস আমাদের নেই। দাঁতের ক্ষতি হয়।'

বড় স্যার তাকে আদর করে পাশে বসিয়ে বললেন, 'তুমি গেলে না যে ?' 'আমার কাজ যে শেষ হয়নি। এদিকে বাঁদরগুলো যত মানুষ হচ্ছিল, ছেলে-মেয়েগুলো ততই বাঁদর হচ্ছিল। ওরা সত্যিকার ছেলেমেয়ে, বড়দা, আমার সত্যিকার নাতি-নাতনী। গবেষণার সাহায্য হবে বলে এনেছিলাম, কিন্তু বড্ড দুষ্টু হয়ে যাচ্ছিল। শেষটা ওখানকার জীবনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারবে না। বন্ধুরাও তাই বললেন।'—

'আর নরবু ?'

—সায়েব হাসলেন, 'কি করব, বড়দা, ও মেশিনের মধ্যে ঢুকে বসে রইল। ওখানে সুখে থাকবে। এখানে কতটুকু সুখ পেয়েছিল বলুন ?' বড় স্যার, সায়েবের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'আর তুমি ?' সায়েব খুশি হয়ে বললেন, ওপরওয়ালাদের মত নিয়েছি, বড়দাদা। কয়েকটা বড় বড় ভুল নিজে করে, তার ফল ভোগ করে, তবে ফিরব। দেখতে হবে ভুল এমন উপভোগ্য, ভুলের এমন বিচিত্র সম্ভাবনা, তবু আপনারা সুখী নন কেন ?'

বড়দা বললেন, 'আমি সুখী। তুমিও সুখী হয়ো লিম্বো। অন্যায় কাজ করবে না জানি, কয়েকটা বড় বড় ভুল দিয়ে গবেষণা শেষ করে দেশে ফিরে যেও। চিঠি লিখবে ? আর ঐ খুদে খুদে রেডিওর মতো ঘুঁটিগুলো কি ? নাতি-নাতনীরা যা পকেটে রাখত।'

'এক রকম রেডিও-ই বলতে পারেন। মা-বাবার সঙ্গে ঐ দিয়ে যোগ থাকত। আপনাদের মহাকাশযানগুলোকে যে ভাবে পৃথিবী থেকে পরিচালনা করা হয়। তবে আরো সূক্ষ্ম ব্যাপার। তবু বলব ওতে আমরা সুখী হই নি, বড়দা। আমাদের চেহারা আপনাদেরি মতো লক্ষ্য করে থাকবেন। বুদ্ধি একটু বেশি। কিন্তু তেমনি অসহায় ভাবে সুখ সুখ করে হাতড়ে মরি। সব পেলেও কেউ সুখী হই না। চিঠি লিখব। এক বছর পরে আমিও দেশে ফিরে যাব।'

এই বলে সেকেলে কায়দায় টিপ করে একটি প্রণাম করে লিম্বো চলে গেলেন। বড় স্যার এ-সব কথা কাউকে বলেন নি। বছর খানেক পরে লিম্বোর কাছ থেকে প্রথম ও শেষ চিঠি পেয়েছিলেন। 'বড়দাদা, এবার দেশে ফিরতেই হল, এত বড় বড় এতগুলো ভুল করেছি যে গবেষণা শেষ করতে হয়েছে। শূন্য যোগে সমস্ত পাণ্ডুলিপি দেশে পাঠিয়েছি। খুব উপভোগ-ও করেছি ব্যাপারটা, তবে এখন না পালিয়ে উপায় নেই। একটা নতুন সত্য আবিষ্কার করেছি যে ভুলের পথ আর অন্যায়ের পথ মাঝেমাঝে একসঙ্গে মিলে যায়। তখন আর তাদের আলাদা করে চেনা যায় না। ফলও এক রকমই হয়। সে যাই হোক, আপনার বন্ধুত্ব পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি। কাল সকালে জেলখানার রক্ষক যখন আমার ঘর খুলে দেখবে ঘরে কেউ নেই, তার মুখখানা কেমন হবে ভাবুন! চিঠিটা অন্য উপায়ে ডাকে দেওয়া হবে—সে বলে আপনাকে ভাবিয়ে কাজ নেই। ইতি! আপনার স্নেহ-ধন্য—লিম্বো।

———

শিশুবর্ষ গৃহীত পরিকল্পনার

৭৮তম

গ্রন্থ

Galpochhabi.blogspot.com